তিন কাহিনী

চাঁপাডাঙ্গার বৌ
সপ্তপদী
ডাকহরকরা

(তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট/কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম (সংকলন) মুদ্রণ—মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

দাম : পনেরো টাকা

চাঁপা ডাঙার বৌ

(উপন্যাস)

দেবগ্রামের পথে পাশের বড় গ্রাম হইতে গাজনের সঙ আসিয়া হাজির হইয়াছে। একজন ঢাকী বড় একখানা ঢাক নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতেছে। তাহার সঙ্গে কাঁসি ও শিঙা। দলটাকে অনেক দূরে দেখা যাইতেছে। দেবগ্রামে গাজন নাই। নবগ্রামের গাজনও এ গ্রামে আসে না। এবার ব্যাপারটা নতুন।

দক্ষিণ পাড়ার মণ্ডলবাড়ি হইতে বাহির দরজায় বধূ দুটি ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

গ্রামের সবচেয়ে সমৃদ্ধ মণ্ডলবাড়ি। মাটির ঘর টিনের চাল, পাকা মেঝে। বারান্দায় সুন্দর-গড়নের কাঠের খুঁটি। সেতাব ও মহাতাপ মণ্ডলের বাড়ী। বধূ দুইটি দুই ভায়ের স্ত্রী—কাদম্বিনী ও মানদা। কাদম্বিনী ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী এবং শ্যামবর্ণে চমৎকার লাবণ্যময়ী মেয়ে। মানদা মাথায় খাটো, একটু স্থূলাঙ্গী কাদম্বিনী নিঃসন্তান. বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, মানদার বয়স সতেরো-আঠোরো— একটি সন্তানের জননী মানদা।

ওদিকে গাজনের সঙের দল অন্য একটা রাস্তায় ভাঙিয়া ঢুকিয়া যাইতে শুরু করিল। ঢাকের বাজনার শব্দ বাঁকের আড়ালে পড়িয়া কম হইয়া আসিল।

মানদা বলিল, মরণ! ও-রাস্তায় ঢুকে গেল যে মড়ার দল।

কাদম্বিনী গবেষণা করিয়া বলিল, বোধ হয় ও-পাড়ায় মোটা মোড়লের বাড়ি গেল।

—মোটা মোড়লের বাড়ি? কেন? আমাদের বাড়ির চেয়ে মোটা মোড়লের খাতির বেশি না কি?

—তা বয়সের খাতির তো আছে। তা ছাড়া দিতে-থুতে মোটা মোড়ালের নাম যে খুব।

ঠোঁটে পিচ কাটিয়া মানদা বলিল, নাম! বলে যে সেই—ভেতর ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন, তাই। এদিকে তো দেনায় শুনি একগলা জল। বাইরে দেওয়া-থোয়ার নাম।

কাদম্বিনী একটু শাসনের সুরেই বলিল, ছি এমন করে কথা বলে না। হাজার হলেও মান্যের লোক। এখন চল্, হাতের কাজ সেরে নিই। গাঁয়ে যখন এসেছে তখন এদিকেও আসবে।

তাহারা বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

প্রথমেই গো-শালা। গরুগুলি চালায় বাঁধা। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রর মধ্যে শুইয়া আছে, রোমন্থন করিতেছে, একটা রাখাল গরুর গায়ে তাকিয়ার মত হেলান দিয়া ঘুমাইতেছে।

তাহার পর খামারবাড়ি।

খামারবাড়িতে ঢুকিতেই এক কলি গান ও দুপ-দুপ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। গমের উপর বাঁশ পিটিয়া গম ঝরাইতে ঝরাইতে কৃষাণটা গান করিতেছে—

"চাষকে চেয়ে গোরাচাঁদের মান্দেরী ভাল।"

পাশে পায়রা জমিয়া গম খাইতেছে।

ক করিয়া হাসিয়া বলিল, কেন রে নোটন, এত আক্ষেপ কেন?

জিভ ...টিয়া নোটন বলিল, আজ্ঞে মুনিব্যান?

—চাষের চেয়ে মান্দেরি ভাল বলছিস?

আজ্ঞে মুনিব্যান, মান্দেরি হলে কি আজ আর গম ঝরাতাম গো। চলে যেতাম গাজনের ধুম দেখতে।

মানদা বলিল, এবার গাজনের ধুম যে দেখি খুব নোটন। দুখানা গেরাম পার হয়ে আমাদের গাঁয়ে এল।

—সে তো আমাদের ছোট মোড়লের কাণ্ড গো। বুঝিই তো ভালয় জানবে ছোট মুনিব্যান।

কাদম্বিনী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল কার? মহাতাপের?

—হাঁ গো। আজ ক-দিন সে হোথাকেই রয়েছে।

সেকি? সে যে গেল শশুরকে দেখতে! মানুর বাপের অসুখ—

মানদা তাহার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বলিল, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না বড়দি। শুধু শুধু আর মিছে কথাগুলো বোলো না তুমি!

—মানু! কি বলছিস তুই?

—ঠিক বলছি গো, বড় মোল্যান। সে যে যায় নাই, তা তুমি জানো।

—আমি জানি?

জান না? যদি না জান তবে আমার যাওয়া তুমি বন্ধ করলে ক্যানে?

—এই গরমে ছ ক্রোশ পথ খোকাকে নিয়ে যাবি, খোকার অসুখ-বিসুখ করবে, তাই বারণ করলাম। বললাম—ঠাকুরপো দেখে আসুথ।

—মিছে কথা। আমি জানি, আমি বুঝি। বুঝেছ, আমি সব বুঝি। আমার বাপের বাড়ি যাবে? তার চেয়ে চারদিন গাজনে নেশাভাঙ করুক, ভূতের নাচন নাচুক, সেও ভাল। আমি সব বুঝি।

মানদা হন-হন করিয়া চলিয়া গেল—খামারবাড়ি পার হইয়া বাড়ির ভিতর

দিকে। খামারবাড়ির ও-দিকে পাঁচিলের গায়ে একটা দরজা। সেই দরজাটাকে সবলে ঠেলিয়া দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কাদম্বিনী দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকটা ভাবিয়া দেখিয়া বলিল, তুই ঠিক জানিস নোটন, ছোট মোড়ল আজ কদিন নবগ্যারামের গাজনে মেতে সেইখানেই রয়েছে?

—এই দেখ! আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি গো। রোজ দেখা হচ্ছে।

—বলিস নাই ক্যানে?

—তার আর বলব কি বল? আর কি বলে, ছোট [illegible]

নোটন, বলিস না বাড়িতে, তা হলে দেব কিল ধমাধম। ছে[illegible] কল বড় কড়া, তেমুনি ভারী, আষিঢ়ে তাল।

—হুঁ। কাদম্বিনী বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

নোটন পিছন হইতে বলিল, বড় মোল্যান!

—কি?

—ছোট মোড়ল কিন্তু চাঁপাডাঙা গিয়েছিল।

—গিয়েছিল? গিয়েছিল তো নবগ্রামে থাকল কি করে?

—ওই দেখ! ছ কোশ বারো কোশ রাস্তা ছোট মোড়লের কাছে কতক্ষণ! যেদিন সকালে গিয়েছে, তার ফোরা দিন ফিরেছে। এসে নবগ্যেরামেই জমে যেয়েচে। ভাঙ খেয়েছে. বোম্-বোম্ করছে; আর পড়ে আছে। শোনলাম, দশ টাকা চাঁদা দিয়েছে।

—দশ টাকা?

—হ্যাঁ।

—দশ টাকা?

হ্যাঁ গো। ছোট মোল্যান তিরিশ টাকা দিতে দিয়েছি বাপের বাড়িতে। তা থেকে দশ টাকা ছোট মোড়ল খয়রাত করে দিয়েছে।

—তোকে কে বললে?

—কে আবার! খোদ ছোট মোড়ল নিজে। সে সেই প্রথম দিনের কথা। যে দিনে যায় সেই দিনের। নবগ্যেরামে চাঁদা দিয়ে-টিয়ে ভাবছে—কি করি! আমার সাথে দেখা। বলে—দশ টাকা তু ধার এনে দে নোটন। বলে দোব, বড় বউ তোকে দেবে। তা কি করব? এনে দিলাম।

বড় বউ কাদম্বিনীর মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। হাসিয়াই সে বলিল, আর কাউকে এ কথা বলিস না নোটন, তোর টাকা আমি দোব।

বলিয়া সে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল।

বাড়ির উঠানে ছোলা কলাই মেলিয়া দেওয়া রহিয়াছে। পাশে দুইটা ঝুড়িতে

কতক তোলা হইয়াছে। বধূ দুইটি ছোলা তুলিতে তুলিতেই উঠিয়া গিয়াছিল, দেখিয়াছিল বোঝা যায়।

একটা ছাগল সেগুলো নির্বিবাদে খাইতেছে। দুইটি ছানা পিছনে দাঁড়াইয়া আছে, লাফাইতেছে।

ছোট বউ মানদা একটা দাওয়ায় দেওয়ালে ঠেস দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

বড় বউ ঘরে ঢুকিয়াই ছাগলটাকে তাড়াইল—মর্ মর্ সর্বনাশী রাক্ষসী, বেরো, দূর হ।

ছাগলটা পালাইল।

বড় বউ ঝুড়ি টানিয়া লইয়া বলিল, তুই বসে বসে দেখলি মানু? তাড়ালি না?

—আমার ইচ্ছে। আমার খুশি।

—তোর খুশি?

—হ্যাঁ। খুশি। বলি, কেন তাড়াব? কি গরজ? এ সংসারে আমার কি আছে? কি হবে?

বড় বউ তুলিতে তুলিতে বলিল, এত রাগ করে না। দিনে দুপুরে কাঁদে না, কাঁদতে নাই। আর তার কারণও নাই। নোটনকে তুই জিজ্ঞাসা করে আয়, ঠাকুরপো চাঁপাডাঙা গিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, একদিনের বেশি থাকে নাই। সেখান থেকে এসে নবগোরামে ডেরা নিয়েছে। আয়, ছোলা কটা তুলে নে।

—পারব না আমি।

—পারতে হবে। আয়।

—তুমি মহারানী হতে পার, আমি তোমার দাসী নই। সংসার চুলোয় যাক, আমার কি?

একটা ঝুড়ি ইতিমধ্যে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেটাকে কাঁখে তুলিয়া ঘরে লইয়া যাইবার পথে মানদার কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু স্বরে বলিল, টাকা তিরিশটা চাঁপাডাঙায় তালুয়ের হাতে পৌঁচেছে মানু। ঠাকুরপো দিয়ে এসেছে। সংসার চুলোয় গেলে, সে আর কখনও পাঠানো চলবে না। যা কলাইগুলো তুলে নে। কেলেঙ্কারি বাড়াস নে!

সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

মানদা চমকিয়া উঠিল। ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, কি বললে? তুমি কি বললে?

ঘরের ভিতর হইতেই কাদু জবাব দিল, কিছু বলি নাই। বলছি, ছোলাগুলো তুলে ফেল্।

মানদা ঘরের দিকে আগাইয়া গেল—না, টাকা বলে কি বললে তুমি বল ?

কাদম্বিনী বাহির হইয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল, বলছি টাকা নয় রে—তারিখ, তারিখ—আজ মাসের ক তারিখ বলতে পারিস ? বলিয়াই সে মুখে আঙুল দিয়া চুপ করিবার ইঙ্গিত দিয়া আঙুল দিয়াই দেখাইয়া দিল। নিজে জানালা দিয়া উঁকি দিল।

ঘরের মধ্যে সেতাব খাতাপত্র লইয়া হিসাব করিতেছিল। বয়স বছর বত্রিশেক। শুকনা শরীর, বিরক্তি-ভরা মুখ। এক জোড়া গোঁফ আছে। সে ঘাড় উঁচু করিয়া কান পাতিয়া কথা শুনিতেছে। কথা বন্ধ হওয়ায় সে সন্তর্পণে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পা টিপিয়া আসিয়া জানালার পাশে আড়ি পাতিল। ওদিকে পাশের দরজা ঠেলিয়া বড় বউ ঢুকিয়া দাঁড়াড়াইল এবং বলিল, ওকি হচ্ছে কি ?

সেতাব চমকিয়া উঠিল এবং উত্তরে প্রশ্ন করিল, কি ?

—তাই তো জিজ্ঞাসা করছি। ওখানে অমন করে আড়ি পাতার মত দাঁড়িয়ে কেন ?

—আড়ি পাতব কেন ?

—তবে করছ কি ?

—কিছু না। সে ফিরিয়া আসিয়া তক্তাপোশে বসিল। তারপর বলিল, ভত্তি দুপহরে তোমর দুই জায়ে ঝগড়া লাগিয়েছ কেন বল তো ? পয়লা বোশেখ···শুভদিন, বলি তোমরা ভেবেছ কি ? বলি ভেবেছ কি ?

কথা বলিতে বলিতেই তাহার কথার তাপ বাড়িতে লাগিল।

ওদিকের ঢাকের বাজনা ক্রমশ স্পষ্ট লইয়া উঠিতে লাগিল

বড় বউ কাদম্বিনী বলিল, ঝগড়া ? কে ঝগড়া করছে ? কার সঙ্গে ? কোথায় দেখলে তুমি ঝগড়া ? আমাদের দুই জায়ে একটু জোরে কথা বলছি। তার নাম ঝগড়া। অমনি তুমি আড়ি পেতে শুনতে গিয়েছ ?

—শুনব না ? ছোট বউমা বললে না—টাকা বলে কি বললে বল ? তুমি ঢাকলে—না, টাকা নয়, তারিখ তারিখ বলে ? আমি তোমার স্বামী, বল তো পায়ে হাত দিয়ে ?

—হায় হায় হায় ! খুট করে কোন শব্দ উঠলে বেড়াল ভাবে ইঁদুর। চোর ভাবে পাহারাওয়ালা। আর টাকার কথা শুনলে তোমার টনক নড়ে। ওই শুনেই তুমি আড়ি পাততে গিয়েছ !

—যাব না ? টাকা কত কষ্টে হয়, কত দুঃখের ধন, জান ? কই, সাত হাত মাটি খুঁড়ে টাকা তো টাকা—একয়া পয়সা আনা দেখি ! আমি বহু কষ্টে

গড়েছি সংসার। বাবার দেনা শোধ করেছি, দশ টাকা নাড়াচাড়া করছি। মা-লক্ষ্মীকে পেসন্ন করেছি। সেই টাকা আমার তছনছ করে দেবে তোমরা? তার চেয়ে—তার চেয়ে—

—তার চেয়ে টাকার মাপে তোমার চামড়া কেটে দিতে কম দুঃখ পাও তুমি, তা আমি জানি। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাক, তোমার টাকা কেউ অপব্যয় করে নি।

—না, করেনি। আমি জানি না, বুঝি না কিছু? বেশ তো, টাকা টাকা করে কি বলছিলে, বল না শুনি?

—বলছিলাম মাম্নুর বাপের অসুখ, ঠাকুরপো চাঁপাডাঙা দেখতে গেল— পাঁচটা টাকও তো দিতে হত পথ্যির খরচ বলে। তাই মাম্নুকে বললাম, ভাসুর না দেক সোয়ামী না দেক—তুই তো নিজে নাক-ছাবি বেচেও দিতে পারতিস্? তোরই তো বাপ। তাই ঝেঁকে উঠল মাম্নু।

—উহু। গড়ে বললে কথা। মিথ্যে বললে। বল আমার পায়ে হাত দিয়ে।

—তুমি অতি অবিশ্বাসী, অতি কুটিল। ছি-ছি-ছি—

—আমি অবিশ্বাসী কুটিল?

—আমি অবিশ্বাসী কুটিল?

—হ্যাঁ শুধু তাই না। তুমি কৃপণ, তুমি অভদ্র।

—কাহ্।

—ছোট বউয়ের বাপের অসুখে দশ টাকা তত্ত্ব বলে দেওয়া উচিত ছিল না তোমার? ভিখিরীকে ভিক্ষে দিতে তোমার টনটন করে। ছি তোমার টাকা-পয়সাকে।

ঢাকের আওয়াজ খুব জোর হইয়া উঠিল।

বড় বউ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেতাব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই মরেছে। ঢাক আবার আমার। বাড়িতে কেন রে বাবা? এই মরেছে।

সে দরজা খুলিয়া উঁকি মারিল।

দেখিল, দাওয়ায় বড় বউ ও ছোট বউ দাঁড়াইয়া আছে।

ওদিকে দরজা দিয়ে উঠানে গাজনে সঘ প্রবেশ করিতেছে।

শিব সাজিয়া মহাতাপ নাচিতেছে। লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ শরীর।

শিব তাহাকে খুব ভাল মানাইয়াছে। দাড়ি-গোঁফ-জটয়ে তাহয়েক চেনা না।

সঙের দল গান গাহিতে গাহিতেই প্রবেশ করিল। তাহারা গাহিতেছে—
গা হিতেছে পার্বতীর সখী, জয়া বিজয়া।

শিবো হে, শিবো হে, অ শিবো শঙ্কর হে।
হাড়মালা খুলে ফুলোমালা পরো হে,
অ শিব শঙ্কর হে।
হায়—হায়—হায়—হায়—
ফুল যে শুকিয়ে যায়—
গলায় বিষের জ্বালায় শিবো জরজর হে!
অ শিবো শঙ্কর হে।—

শিব :— তা থৈ থৈ তা থৈ থৈ—বম্ বম্
হর হর—সব হর হে।— (নাচন)

জয়া বিজয়া :—

হায় রে হায় রে—
মদন পুড়ে ছাই রে—
লাজে কাঁদে পার্বতী
ঝর ঝর হে—।
গাজনে নাচন শিবো সম্বর হে।
শি শঙ্কর হে।

গান শেষ হইবামাত্র শিব-ছেনী মহাতপ ভিক্ষার থালাটা পাতিয়া ধরিল। ঘরের ভিতর হইতে সেতাব বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, কি? বলি এসব আবার কি?

বড় বউ বলিল, থাম তুমি। দাঁড়াও এনে দিই আমি।

—না, যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড! আমাদের গাঁয়ে গাজন নাই, তা তিনি গাঁ থেকে গাজনের সঙ! দিন দিন নতুন ফ্যাচ্যাং।

বড় বউ ফিরিয়া আসিয়া শিবের হাতের থালাটা টানিয়া লইয়া তাহাতে দুই টা টাকা দিয়া অন্যদের দিকে বাড়াইয়া ধরিল।

সেতাব বলিল, ও কি? দু টাকা কি ছেলেখেলা নাকি?

—থাম বলছি। ও টাকা তোমার নয়। নাও গো, নিয়ে যাও তোমরা। বলিয়া শিব ছাড়া অন্য একজনের হাতে দিল। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই শিবের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না। আর তোমার যাওয়া হবে না। ঢের নাচন হয়েছে। অনেক ভাঙ খাওয়া হয়েছে। চাঁপাডাঙা যাই বলে পাঁচ দিন নিরুদ্দেশ। ছাই মেখে, ভস্ম মেখে, নেচে বেড়াচ্ছ! ছি-ছি-ছি! যাও তোমরা

যাও বলছি। ঢের সঙ হয়েছে। যাও। এই নাও তোমার জটা-দাড়-গোফ—নাও।

দাড়ি-জটা-গোঁফ টানিয়া খুলিয়া দিল।

মহাতপ বার দুই চাপিয়া ধরিয়া অবশেষে কাতরভাবে অনুরোধ করিল, বড় বউ! বউদিদি। পায়ে পড়ি তোমার, পায়ে পড়ছি আমি।

মানদা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। মহাতাপের স্বরূপ প্রকাশ হইতেই ঘোমটা টানিয়া বলিল, মরণ। বলিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

—তাতে আমার পাপ হবে না। কিন্তু এমনি করে সঙ সেজে বেড়াতে তোমাকে আমি দেব না।

তারপর দলের লোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, যাও না তোমরা। কথা বললে শোন না কেন? সঙ দেখাতে এসে সঙ দেখতে লাগলে যে। সংসারে সঙের অভাব? কারও বাড়ীতে তো এমন সঙ হয় না? সকলের বাড়ীতেই হয়—আমরা যাই দেখতে সে সঙ?

মহাতাপও এবার চেঁচাইয়া উঠিল, যাও যাও, সব বাহার যাও। নেহি যায়েগা; হাম নেহি যায়েগা। ভাগো। ভাগো।

সেতাব ওদিকে বারান্দায় আপন মনেই পায়চারি করিতেছিল এবং বলিতেছিল, হুঁ! হুঁ! যত সব কেলেঙ্কারি! হুঁ! মান-সম্মান আর রইল না। হুঁ!

ধমক খাইয়া সঙের দল বাহিরে চলিয়া গেল।

রাস্তার উপর আসিয়া দলের মধ্যে বচসা শুরু হইয়া গেল। নন্দী নিজের জটা খুলিয়া ফেলিয়া ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, তখুনি বলেছিলাম—পাগলাকে দলে নিও না! তখন সব বললে—দশ টাকা চাঁদা দেবে। বেহারা ভাল, গানের গলা ভাল। এখন হল তো?

বিজয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, অঃ বোঁচার এবার শিব সাজতে না পেয়ে রাগ খুব।

—খবরদার বলছি চ্যাংড়া ছোঁড়া। একটি চড়ে তোমার বদনখানি বেঁকিয়ে দেব।

—চুপ চুপ, ঝগড়া কোরো না! চল, বাড়ি চল সব। রাস্তাতে বোঁচাকে শিব সাজিয়ে নেব চল। উ যে এমন করবে তা কে জানে।—কথাটা বলিল—জামা-কাপড়ে আধুনিক ম্যাট্রিক-ফেল চাষীর ছেলে ঘোঁতন ঘোষ।

—তা—কে জানে—! কেন, মহাতাপের মাথা খারাপ সেই ছেলেবেলা থেকে, কেউ জান না কি?

বিজয়া সাজিয়াছিল যে ছেলেটা, সেটা দেখিতে কুৎসিত, খুব ঢ্যাঙা, রঙ

কালো। সে আবার আসিয়া বলিল, বোঁচা শিব সাজলে আমি দুগ্‌গা হব। রমনা হবে বিজয়া। মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।

হঠাৎ উচ্চ ক্যাঁ—চ শব্দ করিয়া মণ্ডল-বাড়ির বাহিরের দরজা খুলিয়া গেল। গলা ঝাড়িয়া সেতাব বাহির হইয়া আসিল।

জনতা স্তব্ধ হইয়া গেল। এ উহার মুখের দিকে চাহিল। দলপতি ঘোঁতনই ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল, চল চল চল। বলিয়া সে সর্বাগ্রে হন-হন করিয়া চলিতে শুরু করিল।

তাহার পিছনে পিছনে সকলে।

সেতাব ডাকিল, এই ঘোঁতনা, এই! এই! এই!

দলের একজন বলিল, ঘোঁতনদা ডাকছে যে বড় মোড়ল!

—ডাকুক। মরুক চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে। বেটা আমার কাছে ধান পাবে। চলে আয়।

সে হন-হন করিয়া চলিতে লাগিল।

সেতাব রাস্তায় নামিল।

ঘোঁতনা তাহার কথা শুনিল না দেখিয়া রাগিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, নালিশ করব আমি।

ঘোঁতন এবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কর। মহাতাপ পাওনা ধান ছেড়ে দেবে আমাকে কড়ার করায় তবে ওকে আমি শিবের পার্ট দিয়েছি। লোকে সাক্ষী দেবে। বোঁচা বস্ না রে!

সেতাব চমকিয়া উঠিল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া হন্-হন্ করিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল—উঠানে একটা জল-চৌকির উপর মহাতপ বসিয়া আছে এবং কৃষাণ নোটন উঠানের কোণের পাতকুয়া হইতে জল উঠাইতেছে, রাখালটা মাথায় ঢালিতেছে। মহাতাপ খুব আরাম করিয়া স্নান করিতেছে; মধ্যে মধ্যে মুখে জল লইয়া ফু-ফু করিয়া উপরে আশেপাশে ছুঁড়িতেছে। বড় বউ দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে গামছা। পাশে দড়ির আলনায় কাপড়। বড় বউয়ের কোলে মহাতাপের পাঁচ বছরের হৃষ্টপুষ্ট ছেলে—মানিক!

বাপের জল-কুলকুচার রকম দেখিয়া সে খুব হাসিতেছে।

সে বলিল, বাবা কি করছে? ব-মা?

কাদু বলিল, নোটন ও রাখালকে, ওই হয়েছে, ঢের হয়েছে। আর থাক!

মহাতাপ বলিল, উঁহু। হয় নাই, এখনও হয় নাই। ঢাল্, নোট্‌না ঢাল।

বলিয়াই জল ছু ড়িল—ফুঁ !

মানিক বলিল, বাবা কি করছ ?

—গঙ্গা ঝরতা হ্যায় রে বেটা। শিবকে শিব 'পর গঙ্গা ঝরতা হ্যায়। গান ধরিয়া দিল—

ঝর ঝর ঝর ঝর গঙ্গা ঝরে
শিরোপরে গঙ্গাধরের রে !
ঝর ঝর ঝর ঝর—ফুঃ
আমি শিব রে বেটা, হম শিব হ্যায়।

—শিব হ্যায় ?

—হ্যাঁ, তু বেটা গণেশ। মাথায় হাতির মুণ্ডু বসিয়ে দেব।

সেতাব দাঁড়াইয়া খানিকটা দেখিল, তারপর, হুঁ। ছি-ছি-ছি। ছি-ছি! বলিয়া উঠান পার হইয়া চলিয়া গেল এবং দাওয়ায় গিয়া উঠিল। ঘরে ঢুকিবার সময় দাঁড়াইয়া বলিল, ঘরের লক্ষ্মীর চুলের মুঠো ধরে বনবাসে দেওয়ার পথ ধরেছিস তুই মহাতাপ ছিঃ !

এবার মহাতাপ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইল।—কেয়া ?

বড় বউ কাদম্বিনী শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকিল, মহাতাপ।

মহাতাপ আগাইয়া আসিয়া বলিল, নেহি নেহি নেহি। চামদড়ি কিপটে কেয়া বোলতা হ্যায়—জানতে চাই আমি। ঝুট বাত হাম নেহি শুনেগা।

বড় বউ এবার মহাতাপের ছেলেকে নামাইয়া দিয়া আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল—ছি, বড় ভাই গুরুজন, তাকে এমনি কথা বলে ! কতদিন বারণ করেছি না ?

মহাতাপ বলিল, ও মিছে কথা কেন বলবে ? আমি তোমার চুলের মুঠো ধরে বনবাসে দোব—আমি।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

সেতাব বলিল, তোর মাথা খারাপ, বুদ্ধি কম—শেষে তুই কলাও হলি নাকি ? বলছি ঘরের লক্ষ্মীর কথা। বড় বউ এর কথা কখন বললাম ?

বড় বউ হাসিয়া ফেলিল—মরণ আমার। নাও, খুব হয়েছে। চল, এখন মাথা মুছে কাপড় ছেড়ে খাবে চল। এস।

—যাবে, তার আগে একটু দাঁড়াও। মহাতাপ টাকা পেলে কোথায় ? দশ টাকা চাঁদা দিয়েছে গাজনের দলে সঙ সাজবার জন্যে—তুমি দিয়েছ ?

—নেহি। ছোট বউ, ছোট বউ দিয়েছে।

বড় বউ মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি ছোট বউকে দিয়েছিলাম তালুইয়ের অসুখে তত্ত্ব করবার জন্যে। মহাপুরুষ তাই দাতব্য করেছেন গাজনের দলে। হ্যাঁ, সে টাকা আমি দিয়েছি। তোমার সংসারের একটা দানা কি এক টুকরো তামা আমার কাছে বিষের মত; তোমার সংসারে দরকার ছাড়া যে আমি কিছুই ছুঁই না, সে তুমি জান। আমার মায়ের গহনা পেয়েছি, সেই বিক্রির টাকা থেকে দিয়েছি আমি। ও নিয়ে তুমি এমন করে ফোঁস-ফোঁস কোরো না গোখরো সাপের মত। এস ঠাকুরপো।

মহাতাপের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া সে ঘরে ঢুকিল। ঢুকিবার সময়ে শুকনা কাপড়টা তাহার কাঁধে ফেলিয়া দিল।

ঘরের মধ্যে কান-উঁচু থালায় প্রচুর পরিমাণে ভাত, একটা বড় বাটিতে জলের রঙের 'আমানি' অর্থাৎ পান্তাভাত-ভিজানো জল, একটা বাটিতে ডাল, পোস্ত-বাটা অনেকটা, গেলাসে জল। মোটা ভারী বেশ বড়সড় একখানা কাঠের পিঁড়ি পাতা। পাশে মানদা শিল-নোড়া লইয়া কুড়তি কলাই বাটিতে বসিয়াছে। ঘস-ঘস শব্দে দুলিয়া দুলিয়া বাটিয়া চলিয়াছে।

মহাতাপকে আনিয়া বড় বউ পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া দিল। নাও, বস। মহাতাপ বসিয়া দেখিতে লাগিল, কি কি আছে?

বড় বউ বলিল, যা ভালবাস তাই আছে। খাও। পান্তা ভাত, আমানি, পোস্ত-বাটা, কলাইয়ের দাল, অম্বল—সব আছে। আর ওই কুড়তি কলাই তোমার সরস্বতী-ঠাকরুন বাটছে।

—কি? সরস্বতী ঠাকরুন কুড়ৎ কলাই বাটছে? ওই বাঁটকুল—সরস্বতী ঠাকরুন?

—আমি লক্ষ্মী হলে, মানু সরস্বতী বইকি? আমার ছোট বোন তো!

—আচ্ছা! ঘাড় নাড়িতে লাগিল মহাতাপ সমঝদারের মত।

—ঘাড় নাড়তে হবে না। খাও।

খাওয়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল মহাতাপ।

ওদিকে সেতাব দাওয়ার উপর এক হাতে হুঁকা ও অন্য হাতে কল্কে ধরিয়া ফুঁ দিতেছিল। সে উঠানের দিকে পেছন ফিরিয়া ঘরের দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল। মধ্যে মধ্যে বিরক্তিভরে বলিতেছিল, হুঁ। লক্ষ্মী। সাক্ষাৎ অলক্ষ্মী। ঘরের লক্ষ্মী তাড়িয়ে দেবে। হুঁ। দশ টাকা। দশ টাকা সামান্য কথা। হুঁ।—বলিয়া হুঁকায় কল্কে বসাইয়া টানিতে টানিতে উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। এবার সে দেখিতে পাইল, উঠানে বাপের চৌকিতে বসিয়া মানিক গায়ে মুখে কাদা মাখিয়াছে এবং মুখে জল লইয়া ফু যু করিতেছে।

সেতাব হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—এই, এই কি বিপদ। ও কি হচ্ছে, অ্যাঁ। সে উঠানে নামিয়া মানিকের দিকে অগ্রসর হইল।

মানিক বলিল, ছিব হব, ছিব। ফুঁ। বলিয়া জল ছিটাইয়া দিল।

—ছি-ছি-ছি। অ বড় বউ। শুনছ। মান্‌কে কি করছে দেখ।

ছোট বউ বাহির হইয়া আসিল এবং মানিকের অবস্থা দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আধ-ঘোমটায় চাপাগলায় ক্রোধভরেই বলিল, দুষ্টু ছেলে কোথাকার!

—ছিব, ছিব—আমি ছিব।

—ছিব? তা হবে বইকি? তা না হলে আমার কপালের চিতের আগুন নিভে যাবে যে। শিব হবি? শিব হবি? ছেলের পিঠে সে চাপড় বসাইয়া দিল। মানিক কাঁদিয়া উঠিল।

সেতাব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ছোট বউমা! মেরো না বলছি।

মানদা আরও একটা কিল বসাইয়া দিল।—হারামজাদা বজ্জাত—

সেতাব আবার বলিল, ছোট বউমা! তুমি গর্ভে ধরেছ বলে মানিক তোমার একলার নয়। বড় বউ, বলি অ বড় বউ!

বড় বউ বাহির হইয়া আসিল।—মানু!

মানু উষ্মাভরেই বলিল, কি?

—ভাসুর বারণ করছে, তবু তুই মারছিস।

—মারব না? দেখ না কি করেছে? আমার কাপড়টা কি হল দেখ?

—কাপড় তো ছাড়লেই হবে! দে, আমায় দে।

—না। আলুনো আদর দিয়ে একজনের মাথা খেয়েছ। আর না।—বলিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

—কি? কি বললি ছুটকী?

সেতাব পায়চারি করিতে করিতে হুঁকা টানিতেছিল। উল্টা মুখ হইতে ঘুরিয়া এবার সে বলিল, ছোট বউমা মিছে কথা বলে নাই বড় বউ। মহাতাপের মাথা তুমিই খেয়েছ। ছোট বউমা ঠিক বলেছে।

বড় বউ জবাব দিবার আগেই মহাতাপ ডালভাত-মাখা এঁটো-হাত চাটিতে চাটিতে বাহিরে আসিয়া বলিল, সরস্বতী! ওই বাঁটকুল, কুঁদুলে সরস্বতী—ও দুষ্টু সরস্বতী হ্যায়।

বড় বউ বলিল, সব খেয়েছ? না, না খেয়ে ঝগড়া করতে উঠে এলে কুঁদুলে ঠাকুর।

—চাট্‌ পোট্‌! চাট্‌ পোট্‌ করকে খা লিয়া।

—তা হলে হাত ধোও, ধুয়ে শুয়ে পড় গে। দেখি আমি। মাহু—অ মাহু! বলিয়া আবার ঘরে ঢুকিল। মহাতাপ জলের ঘটি তুলিয়া লইয়া হাত ধুইতে লাগিল।

সেতাব বলিল, সাজনে দশ টাকা চাঁদাই শুধু দিস নি, ঘেঁাতনা ঘোষকে ধান পাওনা ছেড়ে দিয়েছিস?

মহাতাপ তাহার মুখের দিকে চাহিল—হাঁ হাঁ। কাগজে লিখে দিয়েছি। ধান সব ছাড়িয়া দিলাম—শ্রীমহাতাপ মণ্ডল। দিয়েছি। ঘেঁাতনার বাড়ি গেলাম, ওর মা কাঁদতে লাগল। বললে—বাবা, ঘেঁাতনা তো জামা-জুতো পরে ঘুরে বেড়ায়, যাত্রা করে, চাষ করে না। ভাগিদার চাষ করে যা দেয় তাতে খেতে কুলোয় না। দেনা শোধ কি করে দেব? ঘেঁাতনার বাচ্চাগুলোর টিকটিকির মত দশা। তাই ছোড়্ দিয়া। হ্যাঁ ছোড় দিয়া। লিখ দিয়া হ্যায়। একদম কাগজমে ঘস-ঘস করকে লিখ দিয়া হ্যায়!

—লিখে দিয়েছিস?

—হ্যাঁ। একদম লিখ দিয়া হ্যায়।

—তারপর? নিজেদের কি হবে?

মানিককে কোলে মানদা বাহির হইয়া আসিল। সে বলিল, ওই ঘেঁাতনার ছেলের মত টিকটিকির দশা হবে। বলিয়া বড় বউ যে ঘরে ঢুকিয়াছিল সেই ঘরে ঢুকিয়া গেল।

মহাতাপ জ্বলিয়া উঠিল।—দেব তোর পিঠে কিল ধমাধম লাগিয়ে। আরে! আমার ছেলে টিকটিকির মত হবে? মহাতাপ নিজে হতে চাষ করে। ভীম হ্যায়। মহাতাপ ভীম হ্যায়। ঘেঁতোনাকে যে ধান ছেড়ে দিয়েছি, সে ধান আমি এবার বাড়তি ফিরিয়ে দেব। দম্ভভরে সে নিজের বুকে কয়েকটা চাপড় মারিল।

আবার বড় বউ বাহির হইয়া আসিল। তাই হবে, তাই ফলাবে। যাও এখন শোও গে। চার রাত্তির বোধ হয় ঘুম হয় নাই। যাও। যাও। ঠাকুরপো! যাও বলছি।

—যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি।

মহাতাপ ঘরের মধ্যে ঢুকিতে উদ্যত হইল।

সেতাব বলিল, লক্ষ্মী আর এ বাড়িতে থাকবে না। মোড়লবাড়ির লক্ষ্মীকে ঘাড় ধরে বের করলে সবাই মিলে। সেকালের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলি সবাই? হায়রে হায়! হায়রে হায়!

হুঁকা ও কল্কে নামাইয়া রাখিয়া সেতাব চলিয়া গেল। বলিতে বলিতেই গেল—হায়রে হায়। হায়রে হায়!

মহাতাপ হুঁকা-কল্কেটা তুলিয়া লইয়া দাদাকে ভ্যাঙচাইয়া দিল—হায়রে হায়! হায়রে হায়! ওই এক আচ্ছা বুলি শিখেছ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাতাপ কথাটা মিথ্যা বলে নাই; ওই 'হায় রে হায়' কথাটা সেতাবের মুখে লাগিয়াই আছে। উঠিতে বসিতে সে বলে—সেদিনের কথা এর মধ্যে ভুলে গেলি সব। হায় রে হায়। হায় রে হায়। অর্থাৎ কথাটা সকলেই ভুলিয়াছে কেবল সেতাব ভুলিয়া যায় নাই। কথাটার মধ্যে সেতাবের জীবনের পরম অহঙ্কার নিহিত আছে। বেশী দিনের কথা নয়, সেতাবের বাপ প্রতাপ মণ্ডল হঠাৎ মারা গেল, সেতাবের বয়স তখন বারো, মহাতাপের বয়স ছয়। মাঝের একটি ভাই তাহাদের নাই। প্রতাপের মৃত্যুর মাস কয়েক না যাইতেই মহাজন পরপর তিনটা নালিশ করিয়া প্রতাপের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া বসিল।

প্রতাপ মণ্ডল হাঁকডাকের মানুষ ছিল। নামেও প্রতাপ কাজেও প্রতাপ ছিল। গ্রামের মাতব্বর, জমিদারের মণ্ডল, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার অনেক কিছু ছিল। গ্রামের কাছেই আধা শহর লক্ষ্মীপুরের ব্যবসায়ী মহাজন বাবু-লোকদের কাছেও খাতির ছিল। মনটা ছিল উদার, মানুষটা ছিল দুর্দান্ত। বাড়িতে চাষের ধুম ছিল। লক্ষ্মীপুরেব বাবুরাও অনটনেব বর্ষায় তাহাব কাছে ধান 'বাড়ি' অর্থাৎ ধার লইত। হঠাৎ প্রতাপ মণ্ডল ব্যবসায়ে নামিয়া বসিল। নামিল এমন ব্যবসারে নামিল যাহার সঙ্গে তাহার কোন পরিচয় নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারি জগাই পাঠকের শুন্য বখরাদাব করিয়া ঠিকাদারির কাজে নামিয়া পড়িল।

সালটা তখন ১৯২৬-২৭ সাল। সবে দেশে ইউনিয়ন বোর্ড হইয়াছে। প্রতাপ মণ্ডলের বোর্ডে হঠাৎ বছরের শেষাশেষি খবর আসিল—সরকার পানীয় জল সরবরাহের জন্য ইন্দারা করিতে টাকা দিবেন; শর্ত ইউনিয়ন বোর্ডকে এক-চতুর্থাংশ টাকা দিতে হইবে। এক একটা ইন্দারায় প্রায় পাঁচশো করিয়া টাকা খরচ, অর্থাৎ ইউনিয়ান বোর্ডকে একশো পঁচিশ আন্দাজ দিতে হইবে। প্রতাপ নিজের গ্রামে ইন্দারার জন্য চাঁদা তুলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পায়ে অনেক ধুলা মাখিয়া হাঁটাহাঁটি করিয়া পঁচিশ টাকা কয়েক আনার বেশী চাঁদা তুলিতে পারিল না। এই সময় জগাই পাটক তাহাকে পরামর্শ দিল—মোড়ল এক কাজ কর। ইন্দারাটা তুমি ঠিকে নিয়ে নাও। ঠিকাদারির একটা লাভ আছে তো, সেই লাভে ও টাকা উঠে যাবে! আমি দেখে-শুনে সব ঠিক করে দোব।

ভয়ে ভয়েই প্রতাপ কাজে নামিল। কিন্তু ইন্দারাটা শেষ হতেই ভয়ে কাটিয়া উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। ঠিকা অর্থাৎ কন্‌ট্রাক্ট হইতে যাহা লাভ হইয়াছে তাহা দেয় সিকি টাকায় বেশ কিছু উপরে উঠিয়া গিয়াছে। লোকাল কন্ট্রিবিউশান অর্থাৎ স্থানীয় চাঁদার দাবি ছিল সিকি অর্থাৎ শতকরা পঁচিশ, সেই স্থানে লাভ দাঁড়াইল শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা। বিল আদায় করিয়া নগদ পঞ্চাশ টাকা প্রতাপের হাতে তুলিয়া দিয়া সেক্রেটারি পাঠক বলিল—দশ টাকা পূজো দিয়ো মোড়ল, পনেরো টাকা আমার, পঁচিশ টাকা তোমার।

প্রতাপের চোখ দুটো জ্বলিয়া উঠিল।

পাঠক বলিল ইন্দারার কাজে তবু লাভ কম। রাস্তার ঠিকে কি সাঁকোর ঠিকে যদি হত না—তবে দেখতে অর্ধেক খরচ আর অর্ধেক লাভ। টাকায় টাকা। করবে ঠিকের কাজ? ইউনিয়ান বোর্ডের নয়, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ঠিকে নেবে?

প্রতাপ কথা বলিতে পারিল না, সেক্রেটারি পাঠকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পাঠক চতুর লোক, তাহার উপমা দিয়া লোকে বলে—মৃগেল মাছ। পাঁক কাটিয়া চলে আবার সমানে ভাসিয়া সাঁতারও কাটে। প্রতাপের দৃষ্টির অর্থ তাহার বুঝিতে দেরি হইল না। পুকুরের জলের মধ্যে ভাসমান টোপের সম্মুখে মাছ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাসিয়া পাঠক বলিল—রাস্তার কাজ পাথর কুড়িয়ে জমা করা আর কাঁকর কেটে তোলা, তারপর গরুর গাড়িতে বয়ে ফেলা। আলমপুরের বাবুদের জমিদারিটাই রাস্তার কাজের পয়সায়। কাঁচা পয়সা হে! তারপর দশ টাকা ওভারসিয়ারের পকেটে গুঁজে দিলে মাপ বাড়িয়ে বিশ টাকা পাইয়ে দেবে তোমাকে। লেগে যাও। আমি বরং সব দেখে-শুনে নেব তোমার। আমাকে দিয়ো কিছু। শূন্য বখরাদার করে নিয়ো।

কথাগুলার একটাও মিথ্যা বলে নাই পাঠক। আলমপুরের বিখ্যাত জমিদারবাড়ির অভ্যুদয় এই রাস্তার কাজে কণ্ট্রাক্টারি হইতেই। প্রায় একশো বছর আগে দুইটা জেলায় বড় বড় রাস্তাগুলো তৈয়ারী ও মেরামতের কাজ ছিল তাঁহাদের একচেটিয়া। এই ঠিকাদারির লাভ হইতেই আলমপুরের চৌধুরীরা তিরিশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারি কিনিয়া পেশা চাষের পরিবর্তে দলিল-দস্তাবেজে পেশা জমিদারি লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। আর ওভারসিয়ারের পকেটে খামে পুরিয়া টাকা দেওয়ার গল্প না জানে কে? বাইসিক্ল চড়িয়া 'হেটকোট' পরিয়া সে ওভারসিয়ার বাবুদের সে দেখিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে। সুতরাং—।

সুতরাং সে নামিয়া পড়িল। এবং নামিয়াই সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে শুরু.

করিল! প্রথম বছরে লাভ হইল এক হাজার টাকার কিছু বেশী। প্রতাপ মূলধন লইয়াছিল তিন হাজারের কিছু কম। তিন হাজারে এক হাজার লাভ। দ্বিতীয় বৎসরে মূলধন বাড়াইয়া সে আট হাজারে তুলিল; একটা ঘোড়া কিনিল, খান তিনেক সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বাইসিক্ল কিনিল এবং পাঠকের এক শালা ও এক ভাইপোকে কাজ দেখিবার জন্য মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে কর্মচারী নিযুক্ত করিল। চার পাঁচজন সাঁওতাল সর্দার অর্থাৎ গ্যাঙ সর্দার, তিনজন গরুর গাড়ির সর্দার, একজন রাজমজুরদের সর্দার নিযুক্ত করিয়া শোরগোল করিয়া কাজ জুড়িয়া দিল। নিজে ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিতে লাগিল। পাঠক ঘুরিত একখানা নতুন বাইসিক্লে। প্রথম বছর তিনেক নিজের বাড়িতেই ছিল সকল কাজের কর্মকেন্দ্র, বাইরের চাষের ঘরটাতেই চুন, সিমেণ্ট, গাইতি, কোদাল, খাতাপত্র থাকিত; চতুর্থ বৎসরে নবগ্রামে ঘর ভাড়া করিয়া আপিস বসাইয়া দিল। খাতায় পত্রে বারিরের কাজ চলিতে লাগিল। পাঠক সদর সহরে ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড আপিসে বিল হিসাব ইত্যাদি লইয়া মাসে পনেরো দিনের বেশী থাকিতে হয় বলিয়া সেখানে একটা ঘর ভাড়া লইল।

প্রতাপ মোড়ল 'মাড়ল' উপাধি ছাড়িয়া ঘোষ উপাধি কায়েম করিল। গ্রামের জাতি-কুটুম্বদের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়াও পর লইয়া দাঁড়াইল। পোশাকে পরিচ্ছদে কথায়-বার্তায় সে হইয়া গেল আর এক মানুষ। দলিল-দস্তাবেজে সে 'পেশা চাষের' বদলে 'পেশা ব্যবসায়' লিখিতে আরম্ভ করিল। বাড়িতে প্রতাপের স্ত্রী শঙ্কিত হইল। প্রতাপ তাহাকে প্রায়ই বলিত একটু সভ্য হও। চাষীর পরিবার যখন ছিলে তখন যা করেছ যা পরেছ যা বলেছ সেজেছে। এখন ভদ্রলোকের চালচলন শিখতে হবে। ও গোবর দেওয়া, কাপড় সেদ্ধ করা এসব ছাড। মধ্যে মধ্যে বলিত, এখানকার ঘরবাড়ি যা আছে থাক, নবগ্রামে গিয়ে নতুন বাড়ি করব।' অন্যদিকে ইউনিয়ান বোর্ডের সভ্যপদের উপর বক্রব্যঙ্গদৃষ্টি হানিয়া ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্য হইবার আয়োজন করিল। এমন সময় হঠাৎ একদা সে কোথা হইবে টাইফয়েড ধরাইয়া আনিয়া বিছানায় শুইল। এবং চব্বিশ দিনের দিন মারা গেল। প্রতাপের স্ত্রী জগাই পাঠককে ডাকিয়া বলিল—পাঠক মশাই কি হবে?

পাঠক বলিল—তাই তো। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে গিয়েছি। বাপু। হাজার দুয়েক টাকা না হলে তো সব অচল।

প্রতাপের স্ত্রী চমকিয়া উঠিল।

পাঠক যাহা বলিল তাহা এই। একটা বড় সাঁকোর ঠিকা ছিল, সাঁকোও হইয়াছে কিন্তু সেটা ফাটিয়া গিয়াছে। রাস্তার ঠিকার কাঁকর পাথর যাহা

মজুত করা হইয়াছে নতুন ওভারসিয়ার তাহার মাপ ঠিক দেয় নাই। প্রায় ছয় আনা পরিমাণ কাটিয়া দিয়াছে। বিল সমস্ত আটক পড়িয়াছে। এদিকে গাড়োয়ান, কুলি, রাজমিস্ত্রীদের তিন সপ্তাহের মজুরি বাকি। তহবিল শূন্য। —"এখন অন্তত হাজার টাকা চাই। এ সময় বিপদের সময়। টাকার কথা মুখে আসে না। কিন্তু না বললেও নয়। গাড়োয়ান, কুলি, রাজমিস্ত্রীদের কথা শুনে আমার হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গিয়েছে। তারা বলাবলি করছে আমাকে ধরে মারবে আর— ।"

বার দুই ঢোক গিলিয়া বলিল—"আর বলছে দলবেঁধে এসে বাড়িতে তোমাদের চেপে বসবে। না খেয়ে তো তারা খাটতে পারবে না!"

প্রতাপ জ্ঞাতি-কুটুম্ব ছাড়িয়াছিল, গ্রামের লোকও সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রতাপের মৃত্যুর পর তাহারা প্রকাশ্যে শত্রুতা না করিলেও সাহায্য করিতে এক পা আগাইয়া আসিল না। নিজেদের বাড়ির দাওয়ায় বসিয়া অধিকাংশ লোকই বলিল—এ হবে তা তো জানা কথা।

*　　　*　　　*

সে-সব দিনের কথা সেতাবের মনে আছে। বাপ প্রতাপ মণ্ডলের ঠিকাদারির জমজমাট আমলে সেও বাপের মত নিজেকে এ গ্রামের সকল ছেলে হইতে পৃথক বলিয়া ভাবিতে শুরু করিয়াছিল! আর মহাতাপ একেবারে প্রায় আদুরে গোপাল বনিয়া গিয়াছিল। ছেলেবেলা হইতেই মহাতাপ সরল চঞ্চল। বাপের অবস্থার আকস্মিক উন্নতিতে সে আদর পাইয়া হইয়া উঠিয়াছিল দুর্দান্ত।

সবই মনে আছে সেতাবের।

ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারি পাঠক সেদিন যে বলিয়া গেল গাড়িওয়ালারা ও মজুরেরা দল বাঁধিয়া পাওনার জন্য আসিবে এবং গোলা ভাঙিয়া ধান বিক্রি করিয়া টাকা উশুল করিয়া লইবে সে কথা সে মিথ্যা বলে নাই। একদিন সত্যই তাহারা আসিল। সঙ্গে আসিল প্রতাপের জ্ঞাতি ভাই ধানের পাইকার গোপাল ঘোষ; ওই ঘোঁতন ঘোষের বাপ। সেতাব মহাতাপের মা তখন বউ মানুষ, বয়সও অল্প, তিরিশও হয় নাই; সেদিন সে ঘোমটা খুলিয়া গিয়া দাঁড়াইল মোটা মোড়লের বাড়িতে। মোটা মোড়ল ধর্মভীরু মানুষ এবং ভাল মানুষ। প্রতাপের সঙ্গে ইদানীং তাহার কথাবার্তা বড় একটা ছিল না। মোটা মোড়ল গ্রাম সম্পর্কে দাদা বলিয়া কয়েকবার প্রতাপকে সৎপরামর্শ দিতে চালিয়াছিল কিন্তু প্রতাপ সে কথার উত্তরে বলিয়াছিল—আমার উন্নতিতে বুক সবার টাটিয়ে গেল তা আমি জানি। পরামর্শ আমি কারুর চাই না। মোটা মোড়ল এ উত্তরে আঘাত পাইয়াছিল। সেদিন হরিকে স্মরণ করিয়া প্রতাপের নিকট

হইতে চলিয়া গিয়াছিল এবং সেই হইতে এদিক আর বড় মাড়ায় নাই। পথে প্রতাপের সঙ্গে দেখা হইলে পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইত। কিন্তু প্রতাপের বিধবা বধু সেদিন গিয়া দাঁড়াইবা মাত্র সে বলিল—সে কি। চল মা চল! দেখি।

সে আসিয়া খাতা দেখিয়া ধান বিক্রি করিয়া সকলের পাওনা শোধ করিয়া দিল। পাঠককে বলিল—হিসাবের খাতাটা যে একবার বার করতে হবে পাঠক মশাই।

পাঠক আকাশ হইতে পড়িল—খাতা তো মোড়লের বাড়িতে। খাতাপত্র তো আমি জানি না। মোটা মোড়ল অনেক চেষ্টা করিয়াও পাঠককে কায়দা করিতে পারিল না। গোটা গ্রামের লোক প্রতাপের ছেলেদের বিরুদ্ধেই একরকম দাঁড়াইয়াছিল। মোটা মোড়ল একা কোন রকমেই তাহাদের বুঝাইতে পারিল না। দোষী প্রতাপ মরিয়া গিয়াছে, তাহার ছেলেরা নির্দোষ নিরপরাধ একথা তাহারা কোন রকমেই বুঝিল না। ওদিকে হঠাৎ মহাজন নালিশ করিয়া বসিল—সে টাকা পাইবে। তিন হাজার টাকা।

তিন হাজার টাকা? প্রতাপ মোড়ল টাকা ধার করিয়াছে?

পাঠক বলিল—করিয়াছে। হ্যাণ্ডনোটের বয়ান সে লিখিয়াছে এবং প্রতাপ সই করিয়াছে। ব্যবসায়ের জন্য টাকার প্রয়োজন হইয়াছিল। সকল ব্যবসায়ীকেই ধার করিতে হয়। ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া মিথ্যা বলিতে পাঠক পারিবে না। আসল কথা কিন্তু অন্য। দরখাস্ত ইত্যাদির জন্য প্রতাপ কিছু সাদা কাগজে সই করিয়া পাঠককে দিয়াছিল। পাঠক মহাজনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া সেই কাগজে হ্যাণ্ডনোট বানাইয়াছে।

এদিকে ছোট ছেলে মহাতাপ পড়িল জ্বরে। জ্বর দাঁড়াইল টাইফয়েডে। প্রতাপের টাইফয়েডের বিষ তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল। যমে মানুষে টানাটানি করিয়া মহাতাপ বাঁচিল কিন্তু কেমন বোকা বুদ্ধিহীন হইয়া গেল। প্রথম প্রথম কথার জড়তা হইয়াছিল। কথা বলিলে বুঝিতে পারিত না, ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া মানুষের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত।

সেতাবের মনে পড়ে সেতাবও সারা পৃথিবীর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া থাকিত। সে নেহাত ছোট ছিল না। বুঝিবার বয়স তাহার হইয়াছিল। বাপ বাঁচিয়া থাকিতে শুনিত—পাঠক বলিত, আরও দু-চারজন বলিত, মোড়ল ছেলেকে তুমি ভাল করে পড়াও। ওকে ওভারসিয়ারি পড়াবে। ওভারসিয়ার হলে এ ব্যবসা একেবারে হৈ হৈ করে চলবে।

কথাটা কি করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া নবগ্রামের ইস্কুল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

সেখানে ঘোঁতন ছিল তাহার সহপাঠী। ঘোঁতন পড়াশুনাতে ভাল ছিল এবং নবগ্রামের আধাশহরে ফ্যাশান ও কথাবার্তাতেও পাকা ছিল। সে তাহাকে ঠাট্টা করিয়া ওপোর স্যার বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল। তাহাতে সেতাব লজ্জা অনুভব করিত বটে কিন্তু তাহার মধ্যেও গোপন অহঙ্কার অনুভব করিত। হঠাৎ বাপ মরিতেই ঘোঁতনের ওই ঠাট্টাটা মারাত্মক রূপে অসহনীয় হইয়া উঠিল। অন্যদিকে গ্রামে পথে ঘাটে লোকজন তাহাকে দেখিয়া বলিতে শুরু করিল—ছেলেটা তো বড় হয়েছে, আবার পড়া কেন বে বাপু? এই অবস্থায়! যা হোক কুলকর্মে লাগলে দুমুঠো খেতে পাবে তো। পড়েই বা করবে কি? হুঁ।

ওদিকে মহাজন নালিশ করিয়া ডিগ্রী করিল। প্রায় বিঘা দশেক জমি বিক্রি হইয়া গেল। বৎসরের শেষে কৃষাণ মজুরেরা অবশিষ্ট জমির ধান তুলিয়া ভাগ করিয়া যে ধান লইয়া মণ্ডলবাড়ির উঠানে মরাই বাঁধিল তাহাতে বাড়ির উঠানের একটা কোণও ভাল করিয়া ভরিল না। অথচ আগে উঠানটার অর্ধেকটা মরাইয়ে মরাইয়ে ভরিয়া থাকিত। সেতাব মহাতাপের লুকোচুরি খেলার আদর্শ ক্ষেত্র হইয়া উঠিত।

সেতাবের মা মরাইয়ের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল গড়াইয়া আসিল। আর বছর দুয়ের মধ্যে আরও দুঃসময় আসিল। সেদিনও সেতাবের মা কাঁদিতেছিল। সেতাব সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। পরীক্ষায় সেও একটা বিষয়ে ফেল করিয়াছে। প্রথম ডাকে প্রমোশন পায় নাই; দ্বিতীয় ডাকে পাইবে কি না তাহারও কোন স্থিরতা নাই। তাই চুপচাপ বসিয়া ছিল, কথাটা মাকেও বলে নাই। হঠাৎ মায়ের চোখে জল দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাব দুই পাক মারিয়া বলিল—আমি আর পড়ব না।

—পড়বি না? মা অবাক হইয়া ছেলের মুখের দিকে তাকাইল।

—না। এবার প্রমোশন পাই নাই।

বাধা দিয়া মা বলিল—না পেয়েছিস—এবার ভাল করে পড়। আসছে বার ভাল করে উঠবি?

—না। আর পড়ব না।

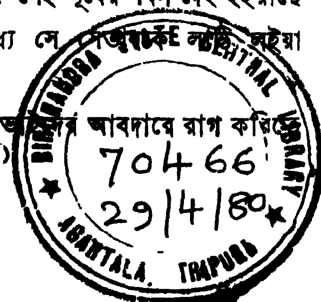
—করবি কি? আমার মুণ্ডু?

—না। চাষবাস করব। নইলে যা আছে তাও থাকবে না। ধার করে ধান খেতে হবে। তার দায়ে জমি বিকিয়ে যাবে।

সেতাব পড়া ছাড়িয়া সেই সংসারের হাল ধরিল। দেহ তাহার দুর্বল ছিল, নিজে হালের মুঠা ধরিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারিল না কিন্তু দিনরাত্রি

তদারকের ফলে চাষের উন্নতি হইল। অনাবৃষ্টির সময় গভীর রাত্রে সে মাঠে বাহির হইয়া লোকের জমির আল কাটিয়া নিজের জমি ভিজাইয়া লইত। চাষের আগে রাত্রে মাঠে গিয়া দশখানা জমি হইতে দশঝুড়ি সার উঠাইয়া নিজের জমিতে ছড়াইয়া দিয়া আসিত। পথ চলিতে চলিতে গোবর পাইলে গোবরটুকু উঠাইয়া লইয়া হয় জমিতে নয় নিজের সারগাড়িতে আনিয়া জমা করিত। বৎসর দুয়েক পর সে মাথা খাটাইয়া এক ব্যবসা বাহির করিল। তরির ব্যবসা ও তাহার সঙ্গে বীজের ব্যবসা। নদীর ধারে তাহাদের খানিকটা গোচর—অর্থাৎ গোচারণভূমি ছিল। সারা বর্ষাটা নদীর বানের জলে ডুবিয়া থাকিত। বান কমিয়া গেলে প্রচুর ঘাস হইত, বর্ষার তিন মাস ছাড়া বাকি নয় মাস গোরুগুলি সেখানে ঘাস খাইত। সেইখানে সে তরির চাষ শুরু করিল। এবং বাজারে প্রথম মরশুমে তরি তুলিয়া বিক্রয় করিত। তাহার আলু উঠিত কার্তিক মাসে। তখনকার দিনে আট আনা ছয় আনা সের বেচিত টমাটো, বেগুন মূলা তাহার প্রথম ঝোঁকে উঠিত। সেই ফসল লইয়া সে নিজে গিয়া হাটে বেচিয়া আসিত। আবার, একদফা এইসব ফসল লাগাইত একেবারে শেষ ঋতুতে। অর্থাৎ আলু তুলিত চৈত্র মাসে। সেই আলু পাকাইয়া বালির উপর বিছাইয়া রাখিত, বিক্রি করিত বর্ষার সময়, কতক বিক্রি করিত বীজ হিসাবে। মূলা-বেগুনও তাই। শেষ মরশুমে পাকাইয়া বীজ করিয়া ঘরে তুলিত এবং পরবর্তী ফসলের মরশুমে গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরিয়া সেই বীজ চাষীদের সরবরাহ করিয়া আসিত। টাকা আদায় করিত ফসল উঠিবার পর। বীজে ফসল না জন্মিলে তাহার দাম লইত না। ইহাতেই তাহার দশাটা সে কিছু ফিরাইয়া ফেলিল। শুধু ইহাতেই নয়, বাড়ির হালচালও সে বদলাইয়া ফেলিয়াছিল। প্রতাপ মণ্ডল ব্যবসা ফাঁদিয়া ঘরে চুনকাম করাইয়াছিল, সে সেই চুনকাম-করা দেওয়ালের চুন ঢাকিয়া মাটি দিয়া নিকাইয়া দিল। খানকয়েক চেয়ার কিনিয়াছিল প্রতাপ মণ্ডল। সেগুলা বিক্রি করিয়া দিল। খান দুই বেঞ্চ ছিল, সেগুলার উপরে বীজের হাঁড়ি বসাইল। বাড়ির খাওয়াদাওয়া পোশাক-আশাক সব বদলাইয়া দিল। তাহার মা তাহাতে আপত্তি করিল না। আপত্তি করিল মহাতাপ। খাওয়াদাওয়া ভাল না হইলে তাহার চলে না। সে আঁ-আঁ করিয়া চীৎকার করিত। দুই-তিন বৎসরে তাহার কথার জড়তা কাটিয়াছে, শরীরও সারিয়াছে, সেই পূর্বের সবল দেহ হইয়াছে কিন্তু মাথার গোলমালটা যায় নাই। মধ্যে মধ্যে সে [illegible] লইয়া তাড়াও করিত।

সেতাব হাসিত। ভাগ্য তাহার ফিরিয়াছে, [illegible] আবদারে রাগ করিতে মন উঠিত না।



ঠিক এই সময়েই একদিন দশ বছরের চাঁপাডাঙার বউ চেলির কাপড় পরিয়া, হাতে রুপার গাড়ু, গলায় মুড়কিমালা দোলাইয়া, দুই পায়ে চারগাছা রুপার মল বাজাইয়া মণ্ডলবাড়িতে আসিয়া ঢুকিত।

সেও এক বিচিত্র ঘটনা। লোকে বলিল, একেই বলে বিধির বিধান। যে যার হাঁড়িতে চাল দিয়াছে। নইলে ও মেয়ের বিয়ে হবার কথা কার সঙ্গে—হল কার সঙ্গে!

কথাটা মিথ্যা নয়। মেয়েটির বিবাহের সম্বন্ধ ছেলেবেলা হইতেই ঠিক ছিল গোপাল ঘোষের ছেলে ঘোঁতনের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ সব ওলোট-পালোট হইয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ কাদম্বিনীর বাপ উমেশ পাল চাঁপাডাঙার সম্ভ্রান্ত চাষী। সম্ভ্রান্ত মানে আধুনিক কালের শিক্ষায় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নয়, খাঁটি এদেশের চাষী; গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, কাঁধে চাদর, পায়ে চটি, তার পোশাক, বিনীত মিষ্ট কথা, অথচ অকপট মানুষ, দিনে চাষ করে, নিজে হাতে লাঙল বয়, গো-সেবা করে, সন্ধ্যায় মোটা গলায় হরিনাম করে; ইংরেজি জানা বাবুদের খাতির করে, ভয় করে, কিন্তু বিশ্বাস করে না, ঘৃণাও করে না। তবে তাহারা যখন তাহার বাড়িতে বর্ষার সময় ধানের অভাব পড়িলে ধার করিতে আসে তাহাদের মনে মনে অনুকম্পা করে। মুখে প্রকাশ করে না। ধান সে দেয়। এমনকি ক্ষেত্র-বিশেষে ধান পাইবে না জানিয়াও দেয়। মুখে তখন সে বার বার বলে, হরিবোল—হরিবোল!

এই উমেশ পালের স্ত্রী এবং গোপাল ঘোষের স্ত্রী অর্থাৎ ঘোঁতনের মা এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যসখী সই। গোপালের ছেলে ঘোঁতন ভূমিষ্ঠ হওয়ার ফলে উমেশের স্ত্রী বলিয়াছিল—আমার মেয়ে হলে তোমার ছেলেকে আমি জামাই করব। উমেশের প্রথম দুই সন্তান পুত্র, তৃতীয় সন্তান কন্যা কাদম্বিনী। কাদম্বিনী ভূমিষ্ঠ হইলে উমেশের স্ত্রী সইকে খবর পাঠাইয়াছিল যে মেয়ে হইয়াছে। কথা যেন পাকা থাকে।

উমেশ পাল খুঁতখুঁত করিয়াছিল। কারণ গোপাল ঘোষ পাইকার অর্থাৎ দালাল মানুষ। ধানের দালালি করে। চাষবাস আছে কিন্তু ধানের দালালিতে ঝোঁক বেশি। সেই সূত্রে আধাশহুরে মানুষ। সদ্‌গোপ হইয়াও চাষ করে না, করে ধানের পাইকারী—অর্থাৎ ধান-চালের দালালি। দালালিতে কাজের চেয়ে কথা বেশী। কাজের চেয়ে যেখানে কথা বেশী সেখানে কথার সবই ভুয়া অর্থাৎ মিথ্যা। তবুও স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করে নাই। বাক্‌ই যখন দিয়াছে মেয়ের মা, তখন না মানিলে উপায় কি? মেয়ের জন্মের পর কিছুদিন বেশ উৎসাহের

সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দুই বাড়িতে খবরাখবরের আদানপ্রদান চলিল। তত্ত্ব-তল্লাসও চলিল। তারপর ধীরে ধীরে সব কমিয়া আসিল। তারপর কাত্নুর বয়স হইল এগারো। ওদিকে বাজারে গুজব রটিল—নতুন আইন হইতেছে যে, মেয়ে যুবতী হওয়ার আগে বিবাহ দিলে জেল হইবে। বিবাহ নাকচ হইবে। কেহ বলিল চৌদ্দ বছর, কেহ বলিল ষোলো, কেহ বলিল আঠারো বছর বয়স না হলেই মেয়েদের বিবাহ চলিবে না। ভীষণ আইন, সারদা আইন না কি আইন।

ওদিকে গোপাল ঘোষের ছেলে ঘোঁতন না কি ম্যাট্রিক দিয়াছে। বিবাহের বাজারে ছেলের দর খুব। গোপাল ঘোষ নাই, মরিয়াছে; উমেশ লোক পাঠাইল ঘোঁতনের মায়ের কাছে, অর্থাৎ স্ত্রীর সইয়ের কাছে। বিবাহ এক মাসের মধ্যেই শেষ করিতে অনুরোধ জানাইল। উত্তর দিল ঘোঁতন। সে বলিয়া পাঠাইল—বিবাহ করিতে সে এখন আদৌ ইচ্ছুক নয় এবং পরবর্তীকালেও সে যখন বিবাহ করিবে তখন লেখাপড়া-জানা মেয়ে বিবাহ করিবে। এগারো বৎসর বয়সের মেয়েকেও সে বিবাহ করিবে না। ঘোঁতনের মা, লোকের সামনে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—আমার দশা দেখে যাও বাবা। সইকে বলো, সয়াকে বলো, আমি নিরুপায়। দিনরাত চোখের জল সার হয়েছে আমার। আমার কোন হাত নাই।

জবাব পাইয়া উমেশ পাল খানিকক্ষণ গুম হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ঘোষের বাড়িতে প্রবেশ করিল সেতাব। তাহার সঙ্গে একজন ভারী। তাহার কাঁধের ভারেই দুই দিকে বীজের বস্তা। উমেশ পালের মুখটা প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হ্যাঁ, পাত্র সে পাইয়াছে। ঠিক হইয়াছে। সেদিন গনৎকার কাত্নুর হাত দেখিয়া বলিয়াছিল—এ মেয়ের পাত্র পায়ে হেঁটে তোমার বাড়ি এসে উঠবে পাল। তুমি দেখে নিয়ো।

কথাটা শুনিয়া উমেশ পালও হাসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল—ভারী চতুর এই গনৎকার মশাই। ঘোঁতনের সঙ্গে কাত্নুর বিবাহের সম্বন্ধের কথা এখানে মোটামুটি সবাই জানে। সেই কথাটি সে তাকমাফিক চমৎকার ঝাড়িয়া দিয়াছে। আজ কিন্তু সে সেই কালো বামুনকে মনে মনে প্রণাম করিল। প্রতাপ মণ্ডল এ অঞ্চলের নামী মানুষ ছিল। তাহার ছেলে সেতাব। বংশ উচ্চ। ছেলের যোগ্যতা ছেলে নিজে প্রমাণ করিয়াছে। যে ছেলে ডুবন্ত নৌকাকে ভাসাইয়া তুলিতে পারে, সে নাই বা হইল ম্যাট্রিক পাশ। উমেশ পাল পরের দিনই সেতাবের বাড়ি আসিয়া তাহার মায়ের কাছে কথা পাড়িল। এবং এক মাসের মধ্যেই বিবাহ শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সেতাবের মা বউ দেখিয়া

খুশী হইল। মহাতাপ বউয়ের ঘোমটা খুলিয়া দিয়া বলিল—এঃ—এই আবার বউ হয়? এইটুকুন মেয়ে।

মা বলিয়াছিলেন—হয়। ওই বউ বড় হবে। তোমার বড় ভাজ—তোমার মায়ের তুল্য হবে। আমার ঘরের লক্ষ্মী।

সেতাব তাহার পর ধুলার মুঠা ধরিয়াছে, সোনার মুঠায় পরিণত হইয়াছে সে ধুলা। আবার সোনার মুঠা চোখের উপর ধুলায় পরিণত হইতে বসিয়াছে। সাধে সে হায় হয়ে করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিন কয়েক পরের কথা।

ভোরবেলা। সূর্য উঠি-উঠি করিতেছে। গোয়াল-বাড়িতে বলদ জোড়াটার কাঁধে হাল চাপাইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে মহাতাপ গান ধরিয়া দিয়াছিল।

মালসাট্ মারিয়া কাপড় পরিয়াছে। মাথায় রঙীন গামছা বাঁধিয়াছে। পাশে ওধারে লাঙল নামানো। একটা ধানের বীজের ঝুড়ি। দুইখানা কোদাল। হুঁকো-কল্কে। একটা ছোট চটের থলে।

কৃষাণ নোটন সাহায্য করিতেছে।

হাল জোতা হইলে মহাতাপ বার দুই সস্নেহে গোরু দুইটার গায়ে হাত বুলাইয়া দিল। তারপর একটা ছোট ছোট টুকরিতে কিছু খইল লইয়া একটার মুখের কাছে ধরিল। গান চলিয়াছে। একটার মুখের কাছে খইল ধরিতেই অপরটা গন্ধে চঞ্চল হইয়া উঠিল স্বাভাবিকভাবে। মহাতাপ সোমের মাথায় ধমক দিল তাহাকে—ধ্যাৎ তেরি!

ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতর হইতে বধূ দুইটি, দুইটি ঘড়া কাঁখে লইয়া কাঁধে গামছা ফেলিয়া স্নানে বাহির হইল।

বড়—চাঁপাডাঙার বউ যাইতে দাঁড়াইল। হাসিয়া বলিল, ঘরদোর চাষবাস বলে তা হলে মনে পড়ল ছোট মোড়লের এতদিনে? চারদিন গাজন-নাচন নেচে—পাঁচ দিন ঘুম।

মানদা বলিল, ক'ঘটি ভাঙে খেয়েছিল শুধাও।

মহাতাপ বলিল, ফের ব্যাড়ব্যাড় করে। এ কদিন কেবল ওই কথা, ব্যাড় ব্যাড়—ব্যাড়র ব্যাড়র—ক'ঘটি ভাঙ খেয়েছ? ভাঙ কেউ হিসেব করে খায় নাকি?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, তা খায় না, কিন্তু ছেলেবেলায় অসুখ করে যার মাথা দুর্বল, সে ভাঙ খায় কেন? কথাটা মনে থাকে না কেন?

মহাতাপ বলিল, এই কান মলছি। বুয়েচ কি না। সত্যই সে কান মলিয়া বসিল—ওই ঘোঁতনা শূয়ার, আর ওই বোঁচা শেয়াল, ওই ওরাই—ওরাই যত অনিষ্টের মূল।

কথার উপরে কথা কহিয়া মানদা বলিল, ওবাই যত অনিষ্টের মূল। কচি খোকা। ওরা ঝিনুকে করে খাইয়ে দিয়েছিল।

—দেখ বউদিদি, দেখ। তুমি দেখ। তুমি বল ওকে—এমন করে কেন? কেমন করে দেখ। দোব আঘিটে কিল পিটে বসিয়ে, হ্যাঁক লেগে যাবে।

বলিয়া আগাইয়া গিয়া লাঙলটা কাঁধে তুলিয়া লইল। চল, রে চল। নোটন?

নোটন ইতিমধ্যে তামাক সাজিতে গোয়ালের ভিতর ঢুকিয়াছিল। তাহাকে না পাইয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, নোটনা। বলি অ—বুড়ো হনু।

বড় বউ বলিল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, মানুর ওপর রাগ করে পালিয়ে গেলে হবে না। আমার একটা কথার জবাব দাও তো। ঘোঁতনাকে ধানটা ছেড়ে দিয়ে এলে, ঘোঁতনার মায়ের কথায় দয়া হল, তা বুঝলাম। কিন্তু একবার জিজ্ঞাসাও তো করে! দাদা রয়েছে। কি কথা বল না যে?

—কি বলব কি? বলতে গেলে, তোমাব স্বামীর নিন্দে করতে হবে।

—কার?

—তোমার ইযেব, বরের। আবাব কাব!

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ।

মহাতাপ ওদিকে নাকে ঘডাত শব্দ করিয়া গোরু দুটোর পিঠে হাত দিযা তাহাদের চালাইয়া দিল।

বাড়ির বাহিরের দাওয়ায়—রাস্তাব সামনে—সেতাব বসিয়া ঢেঁডা ঘুরাইয়া শনের দড়ি পাকাইতেছিল। তাহার সামনে রাস্তার উপব দিয়া মহাতাপ হালগোরু লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। দাওয়ার উপর মানিক একটা মাটির পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে। রাখালটা কল্কেতে তামাক সাজিয়া ফুঁ দিতেছে। একটা খুঁটিতে একটা ছাগল বাঁধা, পাতা খাইতেছে। বাচ্চা দুইটা পাশে ঘুরিতেছে। সেতাব বলিল, কতটা বীজ ফেলবি আজ?

—জোলের দু আডাতে ফেলাব।

—দু আড়া?

—হাঁ তো কি! তোমার মত মরা থেঁকুটে না কি আমি?

—তা না হয় তু ভীম ভৈরবই হলি। কিন্তু একদিনে এত ক্যানে?

—বাত চলে যাবে।

—রাত চলে যাবে সে জ্ঞানটা ভাঙ খাবার সময় থাকলে ভাল হত।

—ফ্যাচফ্যাচ কোরো না বেশী। এই বেটা গোরু, চল না ক্যানে। আবার নাকে ঘড়াত শব্দ করিয়া গরু দুইটার পিঠে পাঁচনের টিপ দিল এবং চলিয়া গেল।

সেতাব ডাকিল, মানকে।

—উঁ।

—বাবার মত খবরদার হাবারাম হবি নে বেটা। লোককে পাওনা ছেড়ে দিয়ে আসবি না।

—আমি ছিব্ হব।

—না। হবি না। খবরদার।

—কি হব?

—আমার মত হবি।

—না, তুমি ছাই। রোগা—

—ওরে বেটা, বুদ্ধিতে আমার মত হবি। অঙ্ক শিখ্‌বি। কাউকে এক পয়সা ছাড়বি না।

—পয়সা দাও।

—ওরে বেটা, অনেক পয়সা জমিয়েছি তোর জন্যে,। সব তোর জন্যে, বুঝলি?

—কাউকে দেব না।

—হ্যাঁ। কেউ আমাকে দেয় নি, কেউ ছাড়ে নি মানকে। বাবা দেনা করেছিল, কেউ ছাড়ে নি। বুঝলি? আর পরিবারের কাছে টাকা নিবি না। তোর বর-মা দেনার সময় গয়না দিয়েছিল দেনা শোধ করতে। তার পাপ আমাকে আজ ভুগতে হচ্ছে। খবরদার মানকে। হাঁ।

রাখালটা হুঁকা-কল্কে সেতাবের হাতে দিল।

সেতাব বলিল, শোন, তু একবার ঘোঁতন ঘোষের বাড়ি যাবি বুঝলি? বলবি পঞ্চায়েত মোড়লেরা একবার ডেকেছে। বুঝলি?

রাখালটা বলিল সে আসবে না গো। বড় ত্যাঁদড় নোক ঘোঁতন।

—তা হোক, তু যাবি। আমি বলছি—তু যাবি। আসে না-আসে আমি বুঝব। এই কাগজখানা দিবি।

রাখালটা বলিল, তাহলে এখুনি যাই। নইলে ঘোঁতন মুড়ি খেয়ে বিড়ি টানতে টানতে বেরিয়ে যাবে, আর সেই ভাত খাবার বেলা পর্যন্ত পাব না।

ঘোঁতনের বাড়ি গোপডাঙায়। ঠিক পাশের গ্রামে।

এই গ্রাম ও আধাশহর লক্ষ্মীপুরের মাঝখানে গোপডাঙা—ছোট একখানি

গ্রাম। লক্ষ্মীপুরেরই কাছাকাছি বেশী। লক্ষ্মীপুর অনেকদিনের সমৃদ্ধ গ্রাম। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-প্রধান সমাজ। গোপডাঙার টানটা চির কাল ঐ দিকেই বেশী। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকেবা গোপডাঙার চাষীদের এবং গোপদের উৎপন্নের পুরানো খরিদ্দার। গোপডাঙার তরি-তর-কারি এবং দুধ দই লক্ষ্মীপুরের অন্নকে পঞ্চাশ না-হোক বেশ কয়েক প্রকার ব্যঞ্জনে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এবং গুড ও দুধ সহযোগে পরমান্ন না হোক পায়সান্নে পরিণত করিয়াছে। শুধু তাই নয় এই গ্রামের চাষীরাই বরাবর ব্রাহ্মণ কায়স্থদের জমি-জেরাত ভাগে ঠিকায় করিয়া আসিয়াছে। এবং সেকালে এতে থেকেই তাদের দুচার জন বছরে নিজের খামারে একটা মরাই-ও বাঁধিয়াছে আবার আজন্মার বছরে ঠিকায় ধান শোধ না করিতে পারিয়া খতও লিখিয়াছে। খতের আসল, সুদে বাড়িয়া তাহাদেব পৈতৃক জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে। এ সব পুবানো কথা। তাহার পর মাঝে একটা সময আসিয়াছিল যখন লক্ষ্মীপুবেব ব্রাহ্মণ-কাযস্থ—বাঁড়ুজ্জে মশায়, মুখুজ্জে মশায়, বোস মশায়, ঘোষ মহাশযেব সকলেই ও সব উপাধি ছাড়িযা বাবু মশাই হইলেন, ঘবে ঘরে তক্তপোশ-ফরাসেব বদলে চেয়ার-টেবিল হইল, টোল পাঠশালা উঠিয়া গেল, ইংবিজি ইস্কুল হইল, বাবুরা শহরে চাকবি ধরিল। উকিল হইল মোক্তাব হইল, ডাক্তাব হইল। শরবত ছাড়িয়া চা ধবিল, হুকাব সঙ্গে সিগাবেট ঢুকিল তখন লক্ষ্মীপুবে খানসামার চাহিদাটা বাড়িয়া গেল। এই সময গোপডাঙার অনেকে চাষেব মত অভদ্র কাজ ছাড়িযা এই শৌখীন কাজে ঢুকিল। ছোট বড করিযা চল ইহাবাই প্রথম ছাঁটিল, চাদবেব বদলে কামিজ আমদানি করিল। কাছেই বক্রেশ্বর নদী—ইহাব পর বক্রেশ্বর নদী দিযা অনেক জল বহিযা গেল। শুধু বহিয়াই গেল না বন্যায চাবিপাশ ডুবাইয়া দিয়াও গেল। চাষেব জমিতে পলিও পড়িল, বালিও চাপিল। সেতাবদের গাম নয়নপুবের চাষীবা বালিপড়া জমিব বালি তুলিল, পলিপড়া জমিতে সোনা ফলাইল। কিন্তু গোপডাঙার চাষীরা চাষ একেবারে তুলিযা না দিলেও ওই জীবিকার উপব আস্থা হারাইল। তাহারা চাষেব সঙ্গে এটা ওটা ব্যবসাযে হাত দিল। কেহ নবগ্রামে দোকান করিল। মুদিব দোকান, বিড়ির দোকান ইত্যাদি এবং ছেলেদের ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। দুই চারটি ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করিল, একজন এম-এ পাশ করিল, একজন বি-এল হইল এবং গোপডাঙার বাস উঠাইয়া কর্মস্থল শহরে চলিয়া গেল। ঘোঁতনের বাবা গোপাল ঘোষ নিজে চাষবাসের সঙ্গে পাইকারি অর্থাৎ ধানের দালালিব কাজ ধরিয়েছিল।

লক্ষ্মীপুরে বণিকদের কাছে টাকা লইয়া গ্রামে গ্রামে ধান কিনিত এবং সেই ধান গাড়ি বোঝাই করিয়া বণিকদের গদিতে পৌঁছাইয়া দিত। কিছু লাভ থাকিত দরের মাথায়, আর কিছু থাকিত ওজনের মাথায়। খরিদ্দারের ঘরে হাতের টিপে যে ওজনটা সে লাভ করিত—সেইটার দাম মিলিত। ইহার উপর আছে কিছু ঢলতা—কিছু আছে ঈশ্বরের নামে বৃত্তির ভাগ। ঘোঁতনাকে ইস্কুলে দিয়াছিল। ঘোঁতন ও সেতাব কয়েক ক্লাস একসঙ্গে পড়েছিল। ঘোঁতন ছেলে মন্দ ছিল না, সেতাবের মত সে এম্‌'কে অ্যাম, এন্‌'কে অ্যান, এল্‌'কে অ্যাল বলিত না। চোস্ত উচ্চারণ ছিল তার। লক্ষ্মীপুরের বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলিত, স্কুলে ডিবেটিং ক্লাবে ডিবেট করিত। ভাল আবৃত্তি করিতে পারিত। লক্ষ্মীপুরের থিয়েটার ক্লাবের রিহারস্যালের দিন হইতে অভিনয়ের দিন পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে আড়ালে-আবডালে থাকিয়া শুনিত শিখিত। ক্লাবের লাইব্রেরি হইতে নাটক নভেল পড়িত। লোকে বলিত—ছেলেটির ভবিষ্যৎ আছে। মাস্টাররাও আশা করিতেন, ঘোঁতন অন্তত সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করিবে। মন দিয়া পড়িলে ফার্স্ট ডিভিশনেও যাইতে পারিবে।

হয়তো পারিত। কিন্তু গোপাল ঘোষ মরিয়া সব গোলমাল হইয়া গেল। ঘোঁতন বল্গাশূন্য অশ্বের মত ধাবমান হইল। ফার্স্ট-ক্লাসে উঠিয়া সে প্রেমে পড়িয়া গেল। মনে মনে সে বেশ কিছুদিন হইতেই প্রেমে পড়িয়াছিল। স্থানীয় মাইনর গার্লস স্কুলের মাইনর ক্লাসের ছাত্রীদের প্রত্যেকটিকেই কিছু দিনের জন্য প্রিয়তমা ভাবিতেছিল। কিন্তু জাতের বাধা বা অন্য বাধা স্মরণ করিয়া সে কথা প্রকাশ করিতে পারিত না। নিজের খাতায় তাহাদের নাম লিখিত এবং খুব যত্নের সঙ্গে কাটিত। হঠাৎ প্রকাশ্যে প্রেমে পড়িবার সুযোগ জুটিয়া গেল। স্থানীয় সবরেজেস্ট্রী আপিসেই তাহাদের স্বজাতি এক কেরানী আসিল—এবং তাহার বড় মেয়েটি মাইনর ক্লাসে ভর্তি হইল। লম্বা ধরনের শ্যামবর্ণ মেয়ে, বয়স বোধ হয় তের চৌদ্দ; কিন্তু ঘোঁতনের প্রেম পড়িবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। মাইনর ক্লাসে পড়ে; বেণী ঝুলাইয়া ফেরতা দিয়া কাপড় পরিয়া স্কুলে যায়—সুতরাং ইহার চেয়ে অধিক আয়োজন আর কী হইতে পারে লক্ষ্মীপুরে। ঘোঁতন প্রেমে পড়িল, মেয়েটির বাপের সহিত আলাপ করিল। তাহাদের বাড়িসুদ্ধ নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ি আনিয়া খাওয়াইল। এই সময়েই উমেশ মণ্ডল কাদম্বিনীর বিবাহের জন্য লোক পাঠাইল। ঘোঁতন তাহাকে সোজা "না" বলিয়া দিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল। সবরেজেস্ট্রী অফিসের কেরানী-বাবুটি ভীরু। কন্যাদায়গ্রস্ত লোক, সেও ঘোঁতনকে পছন্দ করিল। মাস্টাররা

বলেন—ছেলে মন্দ নয়। বাহিরে তো খুব চটপটে—স্মার্ট। বাড়ি ঘরদোরও খারাপ নয়। সুতরাং আকারে-ইঙ্গিতে সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করিল।

ঘোঁতন খুব উৎসাহিত হইয়া পরীক্ষা দিয়া আসিল। শহরে পরীক্ষা দিয়া ফিরিবার সময় সেলুনে চুল ছাঁটিয়া এক টিন গোল্ডেন বার্ডসাই নামক সিগারেট মিকশ্চার কিনিয়া বাড়ি ফিবিল এবং একদা শুভলগ্নে কেরাণীবাবুর মাইনর-পড়া চতুর্দশী কন্যা নীহারিকাকে বিবাহ কবিয়া ফেলিল। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে গেজেটে থার্ড ডিভিশন অবধি কোথাও ঘোঁতন-চন্দ্রেব নাম নাই।

ঘোঁতন বলিল—শালারা সব।

শ্বশুর বলিল—আবাব ভাল করে পড।

ঘোঁতন বলিল—না, ও গোলামী লেখাপড়া আমি আর করব না।

ঘোঁতন তখন লক্ষ্মীপুবেব থিয়েটাবে পার্ট পাইয়াছে। সামনে মাসখানেক পরেই অভিনয়। লক্ষ্মীপুরেব ক্লাবের নিয়মানুসাবে কোন স্কুলের ছাত্র পার্ট করিতে পায় না। স্কুলে আবাব ভর্তি হইতে হইলে পার্ট ছাড়িতে হইবে। সুতরাং ঘোঁতন কিছুতেই রাজি হইল না, উপবন্ত শ্বশুরেব সঙ্গে ঝগডা কবিয়া শ্বশুবেব বাসাব পথে হাঁটা বন্ধ কবিল এবং কিছু জমি বিক্রয় করিযা লক্ষ্মীপুরের গোলাম দর্জির সঙ্গে বখবায একটা কাটা কাপড়েব দোকান কবিল, এবং ইউনিয়ন কোর্টে পেটি মামলাব তদ্বিব আবম্ভ কবিল। কিছুদিনেব মধ্যে কাটা কাপডেব দোকানেব ভাল কাপডগুলাব জামা পবিযা দোকানটা গোলামকে বেচিযা দিল বটে কিন্তু মামলার তদ্বিবে তাহার কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। থিয়েটাবেও সে সুনাম অর্জন কবিল।

শ্বশুর মেয়েব বাপ, তাহাব ইচ্ছা যাই থাক, মনেব ইচ্ছা মনে চাপিয়া জামাইয়ের কাছে নতি তাহাকে স্বীকাব করিতে হইল,—সে জামাইকে বলিল—তুমি তাহলে আর একটা কাজ কব। মামলার তদ্বিবেব সঙ্গেই চলবে। সবরেজেস্ট্রী আপিসে আমি রয়েছি, তুমি সবরেজেস্ট্রী আপিসে টাউটের কাজ কর। সনাক্ত দেওয়া, দলিল লেখার কাজ কব। তাহলে মধ্যে মধ্যে যখন নকলের জন্যে একস্ট্রা হ্যাণ্ড দরকার হবে সে কাজও বলে-কয়ে করে দিতে পাবব।

এ প্রস্তাবে ঘোঁতন রাজী হইল। এবং এ ব্যাপারেও সে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল। কানে কলম গুঁজিয়া বডতলায় ঘুরিতে লাগিল। কিছুদিন পর লক্ষ্মীপুবের সাহাদের পঞ্চানন সাহার সঙ্গে জুটিয়া একটা যাত্রার দলও খুলিয়া বসিল। পঞ্চানন সাহা লক্ষ্মীপুরের থিয়েটারে দূত-প্রহরী ছাড়া পার্ট পায় না, অথচ তাহার ধারণা ভাল পার্ট পাইলে নিশ্চয়ই নাম করিতে পারে। মধ্যে

মধ্যে এ লইয়া ক্লাবে ঝগড়া ঝাঁটিও করিত পঞ্চানন। হঠাৎ এই ঝগড়া এক-দিন চরমে উঠিয়া গেল এবং পঞ্চানন ক্লাব ছাড়িয়া দিল। কয়েকদিন পর শোনা গেল, পঞ্চানন সাহা যাত্রার দল খুলিতেছে। পঞ্চাননের পয়সা আছে, যথেষ্ট পয়সা, সে হাজার দুয়েক খরচ করিয়া পোশাক, চুল, বাদ্যযন্ত্রপাতি কিনিয়া ঘোঁতনকে ডাকিয়া বলিল—বামুন-কায়েতদের সঙ্গ ছাড়। ও বেটারা আমাদিগকে দূত-প্রহরী সাজিয়ে নিজেরা রাজা-উজীর সাজে। আমার দলে আয়, রাজা-উজীর সব আমরাই সাজব এখানে। ঘোঁতন সানন্দে জুটিয়া গেল।

পঞ্চাননের দল প্রথমেই পালা ধরিল "নাগযজ্ঞ" এবং নায়ক তক্ষক নাগের পার্ট দিল ঘোঁতনকে। ঘোঁতন তক্ষক নাগের পার্টে এমন ফোঁস-ফোঁস করিয়া ফোঁসাইল যে লোকে বাহবা দিল। ঘোঁতন নিজেও খুশী হইল, সত্য বলিতে পালাও জমিল।

বছর খানেক পর পঞ্চাননের শখ মিটিল, হাজার খানেক টাকা লোকসান দিয়া দল তুলিয়া দিল। তুলিয়া দিবার সময় ঘোঁতন বলিল—পঞ্চানন-দাদা! দল তুলে দেবে? কিন্তু—

কিন্তু কি? আমার শখ মিটেছে।

তা হলে আমাকে দিয়ে দাও ওগুলো। আমাদের শখ এখনও আছে।

কিন্তু টাকা যে অনেক লেগেছে ঘোঁতন!

তা লেগেছে। কিন্তু পঞ্চানন অপেরায় তোমার নামটা তো থাকবে। আমি টাকা কিছু দোব। আড়াই শো।

শেষ পর্যন্ত চারশো টাকায় রফা করিয়া পঞ্চানন সাহাকেই বিঘা দুয়েক জমি সাতশো টাকায় বেচিয়া ঘোঁতন দলের সরঞ্জাম কিনিল এবং বাড়িতে সামনের চাষের সরঞ্জামের ঘরখানার মেঝে বাঁধাইয়া—দেওয়ালে কলি ফিরাইয়া—বাহিরে পঞ্চানন অপেরার সাইনবোর্ড খাটাইয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল—O K. ঠিক হয়েছে।

প্রথম বছর দুই-তিন জমজমাট আসর চলিয়াছিল ঘোঁতনের। তখন যুদ্ধ মিটিয়াছে কিন্তু বাজারে তখন অঢেল কাগুজে টাকা। তাহার পর মন্দা পড়িয়াছে। ঘোঁতনের যাত্রার দলে লোকসান যাইতে শুরু করিল। ওদিকে রেজেস্ট্রী অফিসে মন্দা পড়িল। ঘোঁতনের স্ত্রীর চার-পাঁচ বছরে তিনটি সন্তান প্রসব করিয়া সংসার বৃদ্ধি করিল, নিজে রোগে পড়িল। বোন পুঁটি বড় হইয়া পনেরো পার হইয়া পড়িল ষোলো বছরে। মা মেয়ের বিবাহের জন্য তাগিদ দিলেও ঘোঁতন চঞ্চল হইল না। স্পষ্ট বলিয়া দিল—আমার টাকা নাই ইহার মধ্যে আরও বিঘা তিনেক জমি নিলাম হইয়া গেছে। ঘোঁতন আপীল

করিয়াছে। তাহার উপর পর পর দুবছর অনাবৃষ্টিতে ফসল নাই। ঘোঁতন করিবেই বা কি? গতবছর সেতাবের কাছে ধান লইয়াছিল। ভরসা করিয়াছিল ওই পাগল মহাতাপের। পাগলটাকে যাত্রার দলে ঢুকাইতে পারিলে পার্টের লোভ দেখাইয়া অন্তত বছরের খোরাকির ধানটার সংস্থান হয়। কিন্তু যাত্রাটাত্রা মহাতাপ বুঝে না। তার চেয়ে সে সঙ ভালবাসে, সংকীর্তন ভালবাসে। বাঁয়া তবলার চেয়ে খোল বাজাইতে তাহার উৎসাহ বেশী। এবার সেইজন্য মহাতাপকে গাজনের সঙে শিব সাজাইয়াছিল। দশ টাকা চাঁদাও লইয়াছে। আবার ধান ছাড়িয়া দিলাম বলিয়া লিখিয়া লইয়াছে।

* * *

রাখালটা যখন সেখানে গিয়া পৌঁছিল, তখন ঘোতনের মা ঘরের দাওয়াটা মাটি দিয়া নিকাইতেছে। ঘোঁতন চায়ের একটা বাটি লইয়া তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছে। এক হাতে একটা জ্বলন্ত বিড়ি। রুখু চুলগুলো উড়িতেছে। চোখে উদাস দৃষ্টি। সে ভাবিতেছিল পার্টের কথা।

রাখালটা আসিয়া বলিল, ঘোষবাবু মশায়!

—কে? তাহার দিকে ঘোঁতন তাকাইল।—সেতাব মোড়লের রাখাল না তুই?

—হ্যাঁ গো। এই কাগজটা দিলে মুনিব। তোমাকে যেতে বলেছে একবার।

কাগজটা দেখিয়া ঘোঁতন দাঁতে দাঁত টিপিয়া ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গিসহকারে বলিল, এক কিলে বেটার দাঁত কটা ভেঙে দোব। নোটিশ এনেছে, পঞ্চায়েতের নোটিশ! ভাগ, ভাগ বলছি! ভাগ!

রাখাল বলিল, তা আমি কি করব? ওই। আমাকে পাঠালে—। ওই—

বলিতে বলিতেই সে পিছাইতে শুরু করিল।

ঘোঁতন চায়ের বাটি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল বেটা ছুঁচোর গোলাম চামচিকে—

ঘোঁতনের মা ত্রস্ত হইয়া বলিল, ও ঘোঁতন, ওরে। কি হল রে?

—কিপটে কঞ্জুস পেকো সেতাবের রাখাল বেটা নোটিশ নিয়ে এসেছে। পঞ্চায়েতের নোটিশ। I don't care—ওরে বেটা বলে দিবি, ঘোঁতন ঘোষ don't care—I mean does not care.

মা আবার বলিল, ঘোঁতন।

ঘোঁতন বলিল, আমি মাছে পোকা পড়িয়ে দেব। হুঁ-হুঁ—আমি ঘোঁতন ঘোষ। আমি হোৎ-তা-তা লাঙাল ঠেলি না। অকাট্য মুখ্য নই আমি।

সেতাব মোড়লের বাড়ীর কীর্তি ফাঁস করে দোব, গুপ্ত বিন্দাবনের পালা লিখে ছড়িয়ে দেব।

মা এবার কঠিনস্বরে বলিল, ঘোতন, তোর মুখ খসে যাবে, ও কথা বলিস নে। ঘোঁতন কি বলিতে চাহিতেছে মুখ খুলিবামাত্র সে তাহা বুঝিয়াছে।

ঘোঁতন ভেঙাইয়া বলিল, আ মলো যা। তোর দরদ উথলে উঠল যে?

তুই যা বলছিস, তা আমি বুঝেছি। চাঁপাডাঙার বউ সতীলক্ষ্মী। মহাতাপ বোকা হোক, মুখ্যু হোক, তোর মত ফেশানদুরস্ত ভদ্দনোক না সাজুক, বড় ভাল ছেলে। আমি চোখের জল ফেলে নিজের দুঃখের কথা বললাম তো এক কথায় পাওনা ধান ছেড়ে দিলে—

—দিলে? এই তো সেতাব মোড়ল পঞ্চায়েতের নোটিশ দিয়েছে।

—দিক। সে যখন বলেছে তখন সেতাব কখনও কথা ফেরাবে না। তার উপর কাদু আছে। সে আমার সইয়ের মেয়ে।

—না। ফেরাবে না। একটা আধপাগলা মুখ্যু, একটা উল্লুক, একটা পাঁঠাতে আর মহাতাপে কোন তফাৎ নাই। ঘরে খাবার আছে, সম্পত্তি আছে, তারই জোরে আমাদের চেয়ে তার খাতির। সব কলঙ্ক ঢাকা পড়ছে।

মা এবার মাটি-গোলার হাঁড়িটা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, দেখ্‌ ঘোতন, অন্যায় কথা বলিস না! তোর যেমন পাপ মন তেমনি কূটবুদ্ধি। তত তোর মনে হিংসে। অমৃতকে তুই বিষ বলছিস। ছি। ছি।

—যাও, যাও. মেলা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না বলছি। বিড়ি টানিয়া ঘোঁতন খানিকটা ধোঁয়া উড়াইয়া দিল।—আমি হাঁড়ি ব্রেক করে দোব বাবা। হুঁ। হুঁ।

বলিয়া সে হাঁটু দোলাইতে লাগিল।

মায়ের দাওয়া নিকানো শেষ হইয়াছিল। মাটি-গোলা হাঁড়িটা হাতে লইয়া সে দাওয়া হইতে নামিয়া পাঁচিলের গায়ে সদর দরজা দিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেছিল, ঘোঁতনের কথা শেষ হইতেই সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তোমার হাঁড়ি যে ভেঙে আটকুচি হয়ে গেছে বাবা। চাঁপাডাঙার মেয়ে কাদুর সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ছেলে বয়েস পেকে; তুমি বাবা যাচালক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিয়ে—বিয়ে করলে নিজে পছন্দ করে। বউমা ভাল নিন্দে করব না বাবা, কিন্তু সবেরই তো পয় আছে—ভাগ্যি আছে; তোমার বউয়ের ভাগ্যি বলতে কিছু নাই। তা ছাড়া ধন্যি বাপের মেয়ে, বাপ সেই যে—আলতাসুটি-শাঁকেরকুটি দিয়ে বিয়ে দিয়ে চলে গেল এখান থেকে আর খোঁজ করলে না। আর কাদুর বাপ মরবার সময় মেয়েকে দিয়ে

গেল এতগুলি গহনা। আজ কাদুকে দেখে দশখানা গাঁয়ের লোকের চোখ জুড়োয়। বলে মরি মরি—কি লালিত্যি! এ রাগের কথা—লোকে না জানুক, আমি জানি। এতে তোমার অকল্যাণ হবে বাবা। আমার সইয়ের মেয়ে সে আমার মেয়ের তুল্য। বিয়ে যখন হয় নাই—তখন তাকে বোন ভাবা উচিত তোমার। কিন্তু—তুমি—। প্রৌঢ়া আক্ষেপের সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ঘোঁতন এবার হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া হাতের চায়ের বাটিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং দাওয়া হইতে রাস্তায় নামিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া বলিল, চিরকালের ঘরজ্বালানি পরচলানী যে তুমি। কাদু তোমার সইয়ের মেয়ে—সে তোমার পেটের ছেলের চেয়ে আপন! তাব জন্যে আমার উপর রাগ! ফু-ফু! ফু!

রাস্তার নামিয়া খানিকটা আসিয়াই সে দেখিল, সেতাবের রাখাল ছোঁড়াটা একটা আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া গাছে ঢেলা মারিয়া আম পাড়িতেছিল। ঘোঁতন তাহাকে দেখিয়া ডাকিল, এই ছোঁড়া, শোন্ তো। এই! তাহার মাথার মধ্যে একটা মতলব খেলিয়া গেল।

ছোঁড়াটা ছুটিতে উদ্যত হইতেই ঘোঁতন একটা ঢেলা তুলিয়া বলিল, পালাবি তো ঢেলা মেরে ঠ্যাঙ খোঁড়া করব তোর শোন্।

ছোঁড়াটা থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘোঁতন আগাইয়া আসিয়া বলিল, তোর ছোট মনিব কোথা? একবার ডেকে দিতে পারিস?

—ছোট মনিব মাঠে।

—মাঠে?

—হঁ। বীজ বুনতে গিয়েছে।

ঘোঁতন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বিড়ি খাবি?

—বিড়ি? দেবেন আপুনি? সত্যি?

—এই নে না।

একটা বিড়ি তাহাকে দিয়া নিজে একটা বিড়ি মুখে পুরিয়া দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া, নিজের ধরানো বিড়িটা রাখালটার বিড়িতে ঠেকাইয়া দিয়া বলিল, টান।

রাখালটা হুস করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল।

ঘোঁতন বলিল, হাঁ রে, তোদের ছোট মনিব আর বড় মুনিবের নাকি ঝগড়া হয়?

—দিন রাত। সেই যে বলে, সাপে নেউলে।

—কেন বল তো?

—ছোট মুনিব মানুষটা যে কেমন গো। লোকের কাছে ঠকে আসে। লোককে পাওনাগোণ্ডা ছেড়ে দেয়। টাকা হাতে পেলেই খরচ করে দেয়। এই বড মুনিবের রাগ। আর ছোট মুনিবের রাগ, বড় মুনিব কেপন। বড মুনিব বকে। সবচেয়ে বেশি রাগে, মোল্যানকে বকে বলে।

—হুঁ। বড় মোল্যানের সঙ্গে মহাতাপের খুব মাখামাখি—না রে?

—ওরে বানাস। বড মোল্যান ছাডা কথা নাই ছোট মুনিবের। সে যা বলেই তাই বেদবাক্যি।

—তোদের ছোট মোল্যান রাগ করে না?

—করে না আবার? করে, মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করে। তা ছোট মুনিব বলে—নেহি মাংতা হ্যায়, চলে যা বাপের বাড়ি। বড় মোল্যান আবার বকে ছোট মুনিবকে। ছোট মোল্যানকেও বকে খুব।

হুঁ। একটু ভাবিয়া লইয়া ঘোঁতন বলিল, ভাল ছেলে তুই—তোকে আমার যাত্রার দলে একটা পার্ট দোব। বুঝলি? করবি?

বার বার সে ঘাড নাড়িল। মনে মনে মাকে ব্যঙ্গ করিল। চাঁপাডাঙার বউয়ের উপর মায়ের বড দরদ। অথচ রাখাল ছোঁডা কি বলিয়া গেল? তাহার মানে কি? নয়ানপুরের যত সব ভেড়ার দল—সেতাব-মহাতাপের অবস্থাকে ভয় করিয়া মুখ খুলিতে সাহস করে না। দেওর-ভাজের মাখামাখিরও একটা সীমা আছে। রাখালটাকে হাত করিয়া ঠিক খবরটা বাহির করিবে সে।

আজকালকার ভাল ভাল উপন্যাসে নবনারীর-তত্ত্বের জীবন-রহস্য সে জলের মত বুঝিতে পারিয়াছে।

ছেলেটা খুশি হইয়া ঘাড নাড়িল।

ঘোঁতন আবার প্রশ্ন করিল, এখন বল্ তো কোন্ মাঠে ঘাস পাডছে তোর ছোট মুনিব?

—ওই তো গো আপনার কাছে কেনা—কাঁড়াজোলের সেই বেঁকী বাকুডির মাথায়।

কাঁডাজোলের মাঠ। এখানে ওখানে লোক হাল বহিতেছে। বৈশাখ মাস বীজ বুনিবার সময়। মহাতাপ লাঙল চালাইতেছিল। তাহার বলিষ্ঠ দেহের সকল শক্তিতে লাঙলের মুঠা চাপিয়া ধরিয়াছে। গোরু দুইটা চলিয়াছে মন্থর গমনে।

কৃষাণটা কোদাল কোপাইয়া আলের মুখ কাটিয়া জল-নির্গমের পথ করিয়া দিতেছিল।

এমন সময় আসিয়া দাঁড়াইল ঘোঁতন। ডাকিল, মহাতাপ।

মহাতাপ মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, ভাঙ খাবার দলে আমি নাই, যা।

—একটা বিড়ি খা।

—বকিস না, আমার সময় নাই। দু আড়া বীজ ফেলতে হবে আমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে নাকে তালুতে ঘড়াৎ শব্দ করিয়া গোরু দুইটাকে তাড়া দিয়া বলিল, অই-অই, বেকুব বেহদ্দা গোরু কোথাকার। অই-অই, আবার শব্দ। কহিল—ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যা।

ঘোঁতন বলিল, ওরে দাঁড়া, শোন্। কথাটা বেশ ধমকের সুরেই বলিল।

—কি ?

—বলি মানুষের কথা কটা রে ?

—ক্যানে ? কথা একটা। দু কথার মানুষ মহাতাপ নয়।

—তবে ?

—কি তবে। মহাতাপ লাঙল ছাড়িয়া দিল এবার।

—তুমি যে দাতাকর্ণ সেজে মাকে পাওনা ধান ছেড়ে দিয়ে এলে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তোর মায়ের জন্যে দিয়েছি। তোর জন্যে নয়।

—বুঝলাম। তা তোর দাদা আবার ধান চায় কেন ?

—কি ?

—তোর দাদা, কিপটে সেতাব—

—এক চড়ে তোর দাঁত ভেঙে দোব ঘোঁতনা। কিপটে আছে আপন ঘরে আছে, তুই কিপটে বলবি ক্যানে ?

—সে ধান চায় ক্যানে ? পঞ্চায়েত ডাকে ক্যানে ?

—যা যা, ঘর যা। সে আমি বড় বউকে বলে দোব। সে সব ঠিক করে দেবে।

—বড় বউকে বলে ঠিক করে দিবি ? ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল ঘোঁতন। ঘাড় নাড়িয়া খুব রসিকের মত হাসিয়াই বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দিস। কথার শেষে সে আরও খানিকটা হাসিল।

মহাতাপ তাহার হাসি দেখিয়া ক্ষেপিয়া গেল, বলিল, হাসছিস যে ? এই, তুই হাসছিস যে ?

ঘোঁতন বিজ্ঞের মত বলিল, হাসলাম। তা তুই রাগছিস ক্যানে ?

—তু হাসবি ক্যানে ? মহাতাপ আরও দুই পা আগাইল।

—ওই। ওই! সে পিছাইতে লাগিল।

মহাতাপ খপ্ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—বল্ ব্যাটা ফড়িং, হাসলি ক্যানে ? এমন করে হাসলি ক্যানে বল্—

—ছাড়, ছাড়, ছাড়—ওরে বাপ রে।

নোটন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ছোট মোড়ল, ছাড়, ছাড়, ছোট মোড়ল—

দূর হইতে কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—ঠাকুরপো।

দূরে একটি গাছতলায় বড় বউ কাদম্বিনী হাতে গামছায় বাঁধা জলখাবার লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; মাথায় বিড়ার উপর জলের ঘটি। মাঠে চাষের কাজের সময় চাষীদের বধূরাও মাঠে স্বামীপুত্রের জন্য জলখাবার লইয়া যায়। সেতাব ভরা চাষের সময় ছাড়া চাষে খাটে না। হিসাবনিকাশ দেনাপাওনা বীজের ব্যবসা লইয়া তাহার অনেক কাজ। মহাতাপের চাষ লইয়া মাতন।

ছোটবউকে সমাদর করিয়া কাদু মাঠে বাহির হইতে দেয় না। তাহার উপর পাগলকে তো বিশ্বাস নাই; কোথায় মাঠেই ঝগড়া করিয়া বসিবে মানুষর সঙ্গে। তাহার যদি মনে হয়—গুড় কম কি মুড়ি নরম—তাহা হইতে এক কাদু ছাড়া আর কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বুঝাইয়া খাওয়াইতে পারে। মহাতাপের জন্য জলখাবার লইয়া আসিয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়াই তাহার চোখে পড়িল ঘোঁতন দাঁড়াইয়া আছে, কি কথা বলিতেছে। কথাটা যে গানের কথা তাহা বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না। মুহূর্ত পরেই মহাতাপের উচ্চকণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল। তাহারও মুহূর্ত পরে মহাতাপকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া তাহাকে চীৎকার করিয়া না ডাকিয়া পারিল না।

মহাতাপ চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল।

নোটন বলিল, বড় মুনিব্যান।

দূর হইতে কাদু বলিল, ছেড়ে দাও ঠাকুরপো। ছেড়ে দাও।

মহাতাপ ঘোঁতনকে ছাড়িয়া দিল, যা বেটা আলকাটার কাপ, আজ তোকে ছেড়ে দিলাম। ফের দিন তোকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকা পাকিয়ে দোব।

ঘোঁতন হাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেল।

মহাতাপ গাছের তলায় গিয়া বলিল, ব্যাটা হাসে। দেখ দেখি কাণ্ড।

কাদম্বিনী বলিল, কি হল তাতে? হাসি তো ভাল জিনিস।

—ভাল জিনিস? ওই হাসি ভাল জিনিস? ভাল জিনিস তো গা জ্বলে যায় ক্যানে?

—নাও, ভিজে গামছায় গা মুছে ফেল। জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। একটু বুদ্ধি কোরো। বুঝলে, সব তাতেই মারমূর্তি ভাল নয়।

—তুমি এই কথা বলছ? তোমার কথায় কখনও রাগি আমি?

বড় বউ জলের ঘটি আগাইয়া দিল—মুখ ধোও। হাত ধোও।

মহাতাপ হাতমুখ ধুইতে লাগিল।

বড় বউ বলিল, আমার কথায় রাগো না সে তো কথা নয়। পরের কথাতেই বা রাগবে কেন? ছি! কি হল কি? ঘোঁতন হাসলেই বা ক্যানে?

—ক্যান! এবার মহাতাপ চেঁচাইয়া উঠিল—ক্যানে! তোমার নাম করে হাসল ক্যানে?

বড় বউ তাহার মুখের দিকে তাকাইল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, আমার নাম করে?

—হ্যাঁ। আবার হাসছে যেন মদ খেয়ে হাসছে। দাও মুড়ি দাও।

বলিয়া মুড়ির খোরাটা টানিয়া লইল। হুস করিয়া জল ঢালিয়া দিল। গুড়ের বাটি হইতে চামচখানেক গুড় লইয়া মিশাইয়া দিল। তারপর বলিল, ব্যাটার হাত ভেঙে দিতাম।

বড় বউ কাদম্বিনী বিচিত্র হাসি হাসিল।—তার চেয়ে ওরা আসুক। হাসতে দাও ওদের। পরের হাত ভেঙে তোমাকে ফ্যাসাদ বাধাতে হবে না।

প্রকাণ্ড হাতে মুড়ির গ্রাস তুলিতে গিয়া মহাতাপ বলিল, এমনি করে হাসবে ঘোঁতনা?

—যাঁর বিচারের ভার তিনিই বিচার করবেন। ওতে আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে না। কিন্তু ও আবার তোমার কাছে এসেছিল কেন?

—ওই দেখ। ভুলে যেতাম এখুনি। তুমি সেই কেপনকে বোলো তো, আমি ঘোঁতনকে যে ধান ছেড়েছি সেটা এবার চাষে ফলিয়ে দোব—দোব—দোব!

বলিয়াই সে বড় বড় গ্রাসে খাইতে লাগিয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, বড় মোড়ল বুঝি ছাড়বে না বলেছে?

খাইতে খাইতেই মহাতাপ বলিল, পঞ্চায়েৎ ডেকেছে। আজই সন্ধ্যেবেলা।

চাঁপাডাঙার বউ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না-না-না। সে ঘোঁতনের জন্যে নয়। আজ পঞ্চায়েত বসবে—শিবকেষ্ট রামকেষ্টদের হাঁড়ি আলাদা হবে, বিষয় ভাগ হবে।

—উঁহু, ঘোঁতন বলে গেল। কেপনের সর্দার লোক পাঠিয়েছিল।

চাঁপাডাঙার বউ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিয়া লইল।

মহাতাপ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া বলিল, তুমি বোলো যেন!

—বলব। বলব। তুমি খাও।

—বাস। নিশ্চিন্দি তো?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

—এবার এমন চাষ করব—দেখবে।

—কোরো। এখন খেয়ে নাও।

মহাতাপ বড় বড় গ্রাসে মুড়ি খাইতে লাগিল।

চাঁপাডাঙার বউয়ের বুঝিতে বাকী রহিল না ব্যাপারটা। সে মণ্ডলবাড়ির গৃহিণী, সেতাবও বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি হিসাবে এখানকার পঞ্চায়েতের একজন মণ্ডল, গ্রামের সকল খবরই তাহাদের পক্ষে জানা স্বাভাবিক। রামকেষ্ট এবং শিবকেষ্ট দুই ভায়ের মধ্যে বনিবনাও অনেকদিন হইতেই হইতেছে না। কাজেই তাহারা ভিন্ন হইতে চলিয়াছে। সেইজন্য—আজই সন্ধ্যায় পঞ্চায়েত বসিবার কথা। এই সুযোগ লইয়া সেতাব ঘোঁতনের ব্যাপারটাও পঞ্চায়েতের সম্মুখে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে—কথাটা মুহূর্তে কাদম্বিনী বুঝিয়া লইল। ব্যাপারটা কাদম্বিনীর ভাল লাগিল না। সেতাবের উপর সে বিরক্ত হইল। এ কি? এই স্বভাবটা কি তাহার কোন দিন যাইবে না? একদিন যখন অবস্থা খারাপ ছিল তখনকার কার্পণ্যের কথা সে বুঝিতে পারে। আজ এত কার্পণ্য কেন? তা ছাড়া মহাতাপ বুদ্ধিহীন হোক, সেও তো বাড়ির অর্ধেকের মালিক! তাহার অপমান হইবে যে! মহাতাপকে সে স্নেহ করে। মহাতাপ সরল, নির্বোধ, মাথাতেও একটু ছিট আছে—তাহার উপর ভাঙ খায়, লোকের সঙ্গে মারামারি করিয়া আসে, জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করিয়া আসে; সবই সত্যি। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় মায়ের কথাটাও কি মনে পড়ে না সেতাবের? চাঁপাডাঙার বউয়ের বয়স তখন পনেরো-ষোলো বৎসর—মহাতাপের চোদ্দ-পনেরো, মৃত্যুশয্যায় শাশুড়ী বউকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—বউমা, ওই পাগলকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, তুমি ওকে দেখো।

মহাতাপকে ডাকিয়া মা বলিয়াছিল—বড় ভাজ আর মায়ে সমান। চাঁপাডাঙার বউয়ের কথা কখনও অমান্য করবি নে। ও আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

সেতাবকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—সবই তোমার ভার বাবা। বউমার অযত্ন কোরো না, ওই হল এ বাড়ির ঘরের লক্ষ্মী। তুমি বউমাকে দেখো; মহাতাপকে দেখো।

চাঁপাডাঙার বউ তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা শুধু কর্তব্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে তাহার অন্তরের অকৃত্রিম স্নেহের যোগ আছে। বুদ্ধিহীন মহাতাপ আজও সেই ছেলেবেলার মত চাঁপাডাঙার বউকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়। তাহার ক্রোধ হইলে সে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। প্রতিশোধ না লইতে পারিলে সে মেঝের উপর মাথা কোটে। সে

সময় তাহার সম্মুখে কেহ দাঁড়ায় না। দাঁড়ায় ওই চাঁপাডাঙার বউ। চাঁপা-ডাঙার বউ দাঁড়াইলেই মহাতাপের ক্রোধের মাত্রা কমিয়া আসে। সেই মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকায়। চাঁপাডাঙার বউ বলে, ছি! ছি!

মহাতাপ প্রথমটায় প্রতিবাদ করে।

বড় বউ আবার বলে, ছি! ছি! তোমার জন্তে ছি-ছি করে সারা হলাম। চিরকালই কি তুমি ছেলেমানুষ থাকবে?

মহাতাপ এবার নিজের দিকের ন্যায়কে প্রবল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। বড় বউ বলে, সব বুঝেছি। অন্যায় ওদেরই। কিন্তু সংসারে যে সয়—সেই মহাশয়!

মহাতাপ শান্ত হয়।

মহাতাপের বিবাহও সেই দিয়াছে। মানদা তাহারই জ্ঞাতিকন্যা।

মানদা মেয়েটি দেখিতে বড় ভাল। তাহার উপর কাজে কর্মে এমন পারঙ্গম মেয়ে চাষীর বাড়িতেও বিরল। শুধু সেতাবই কি সব ভুলিয়া গেল? দিন দিন পয়সা পয়সা করিয়া সে কি হইতে চলিল!

চাঁপাডাঙার বউয়ের সদাহাস্যময়ী মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া গেল। স্বামীর এই আচরণের সংবাদে মর্মাহত হইল। মহাতাপ এ বাড়ির অর্ধেকের মালিক, তাহার বুদ্ধি নাই কিন্তু তাহার সবল শরীরের পরিশ্রমেই জমির ধানে এ বাড়ির খামার উথলিয়া উঠে। শুধু তাই নয়—তাহাদের সন্তান নাই, ওই মহাতাপের ছেলে মানিকই এ বংশের উত্তরাধিকারী।

বিষণ্ণ মন লইয়াই সে বাড়ি ফিরিল।

খামারবাড়িতে কতগুলা কুমড়ার লতা মাচায় উঠি-উঠি করিতেছে, সেতাব একখানা কোদাল লইয়া সেগুলোর গোড়ায় চারা করিয়া দিতেছে। পাঁচিলের গোড়ায় হুঁকা-কল্কে ঠেকানো রহিয়াছে।

তাহার অনতিদূরে বসিয়া আছে—রামকেষ্ট ও শিবকেষ্টর দুই বিধবা খুড়ী। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কাছাকাছি—ইন্দাশের বউ ও টিকুরীর বউ। দুইজনেই উবু হইয়া বসিয়া আধঘোমটা দিয়া কথা বলিতেছে, একজন একটা লাঠি দিয়া মাটিতে দাগ কাটিতেছে।

একজন বলিতেছে শিবকেষ্ট রামকেষ্ট ভেন্ন হবে বাবা, তোমরা পঞ্চায়েত মিলে ভাগ করে দিচ্ছ; কিন্তু আমাদের কি হবে, বল?

সেতাব একটু রূঢ়স্বরেই বলিল, সে একা আমাকে বললে কি হবে?

—মোটা মোড়ল তোমাকেই বলতে বললে বাবা। বললে, তোমরা বাপু সেতাবের কাছে যাও। বয়স ছোট হলেও তার কথাই বিকুবে। তার অবস্থা

ভাল। বলতে হেন লোক নাই যে সেতাবের কাছে ধান হোক টাকা হোক ধারে না। শিবকেষ্টদেরও দেনা রয়েছে।

সেতাব কোদালটা রাখিল, বলিল, মিছে কথা বুড়ী, মিছে কথা। দুনিয়া হয়েছে নেমখারামের দুনিয়া। বুঝলে বুড়ী, নেমখারামের দুনিয়া। এই দেখ, ওই ঘেঁাতন—সেই যাত্রার দলের আলকাটার কাপ, তাকে পঞ্চায়েতে আসতে বলেছিলাম, তা সে বলেছে—নেহি যাঙ্গা।

বউ দুটির একজন বলিল, শিবকেষ্ট রামকেষ্ট তা বলতে পারবে না বাবা। তোমার ঘরে তমুস্বদে বাঁধা। তুমি বললে—তোমার কথা অমান্যি করতে পারবে না।

সেতাব গিয়া হুঁকা-কল্কেটা তুলিয়া লইল, টানিতে টানিতে আসিয়া বলিল, তা তোমরা বলছ কি? কথাটা কি?

চাঁপাডাঙার বউ ইহার মধ্যে কখন আসিয়া ঢুকিয়াছিল। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, কথা আর কি? বিধবা বউ, তাদের খাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে! তা না করে দিলে হবে ক্যানে? তা হলে তোমরা কিসের পঞ্চায়েত?

একজন বিধবা বলিল, এই হয়েছে। বউমা এসেছে। বল মা, তুমি বল তো। তুমি বলে দাও সেতাবকে।

সেতাব তাড়াতাড়ি বলিল, আহা, তাই তো বলছি গো! তোমরা কি চাইছ তা বল? বলি আলাদা করে থাকতে চাও, না ওদের সংসারে থাকতে চাও, তা বলতে হবে তো।

একজন বিধবা বলিল, আলাদা হলেই তো ভাল বাবা। স্বাধীন মতে থাকতে পাই।

সেতাব উৎসাহের সঙ্গেই বলিল, তাই হবে। আলাদাই থাকব। দুজনকে খানিকটা করে জমি দিতে হবে দুই ভাইকে।

অন্য বিধবা বলিল, তাতে মোটা মোড়লের মত নাই. বলেছে, সে বলতে পারব না বাপু। তোমরা দুদিন পর কাউকে জমি বিক্রয় কর—

সেতাব বলিয়া উঠিল, করে তো করবে।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, না। মোটা শ্বশুর ঠিক বলেছে। তাতে সংসার নষ্ট হবে। খুড়ীদিগেও তো ভাবতে হবে—সংসার শ্বশুরের সংসার, স্বামীর সংসার। রামকেষ্ট শিবকেষ্টই তো খুড়ীদের জল দেবে! তোমরা তা কোরো না খুড়ী, তোমাদের অধর্ম হবে।

—কিন্তু হতচ্ছেদ্দা করবে যে বউমা!

—ছেদ্দা কেউ কাউকে আপনা থেকে করে না খুড়ী, ছেদ্দা করতে হয়।

তুমি যার বাড়িতে থাকবে তাকে যদি পেটের ছেলের মত ভালবাস, তার সংসারে নিজের সংসার বলে খাটো তবে ছেদ্দা না করে সে যাবে কোথায় ?

সেতাব ইতিমধ্যে কয়েকবার হুঁকায় ব্যর্থ টান দিয়া ধোয়া বাহির করিতে না পারিয়া বসিয়া কল্কেটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তামাক সাজিতে বসিয়াছিল। এবং মধ্যে মধ্যে বিরক্তভাবে আপন মনেই হুঁঃ—হুঁঃ করিতেছিল। চাঁপাডাঙার বউয়ের কথাটা শেষ হইতেই সে বলিল, তাই যা হয় হবে খুড়ী, যা হয় পঞ্চজনে করা যাবে। সন্ধ্যেবেলায় এসো বুঝলে ? উ তোমরা বললেও হবে না, চাঁপাডাঙার বউ বললেও হবে না। আমরা পঞ্চজনে বুঝে-সুঝে যা হয় করব। হ্যাঁ, সে যা হয় হবে। সন্ধ্যেবেলাতে এসো চণ্ডীমণ্ডপে।

—তাই আসব বাবা।

বিধবা দুইজন চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া যাইতেই সেতাব সেইদিকে তাকাইয়া দেখিয়া আপন মনেই বলিল, এই মেয়েলোকের মুড়ুলি আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

বড় বউ বিধবা দুইটির পিছন পিছন দরজা বন্ধ করিতে গিয়াছিল। দরজা বন্ধ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তা পারবে কেন ? খুড়ীদিগে জমির ভাগ বার করে দিয়ে জমিটা কিনে নেবার মতলবে ঘা পড়ছে বুঝি ? সেই মতলব মনে এসেছে ? ছি ছি ছি !

সেতাব ধরা পড়িয়া গেল ! হঠাৎ সেই মতলবই তাহার মাথায় গজাইয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি মতলবের কথাটা নিজের কাছেও ভাল করিয়া পরিষ্কার হয় নাই। ঠিক যেন রোগ-সংক্রামিত দেহের প্রথম অবস্থার মত। কেহ বলিয়া দিলে বুঝিতে পারে—তাই তো শরীরটা অসুস্থই তো হইয়াছে। চাঁপাডাঙার বউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠিক ধরিয়াছে তাহাকে। সে চমকিয়া উঠিল। সেই চমকানির ধাক্কায় হাতের কল্কেটা উল্টাইয়া গেল, হুঁকোটা পড়িয়া গেল। সে চাঁপাডাঙার বউয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল, তোমার দিব্যি, এই হুঁকো ছুঁয়ে বলছি।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, আমি মরে গেলেই বা তোমার কি ? আর হুঁকো ছুঁয়ে মিথ্যে বলেই বা সংসারে কি হয় শুনি ?

সেতাব অপ্রতিভ হইয়া বলিল, হুঁকো ছুঁয়ে বললেই বা কি হয় ? তুমি মরে গেলেই বা আমার কি ?

—হ্যাঁ গো। বল না কি হয় ?

সেতাব আছাড় মারিয়া হুঁকাটা ভাঙিয়া ফেলিল, বলিল, হুঁকোর কিছু না বলেছে ! এই নে।

—এইবার কোদাল নিয়ে আমার মাথাটা কাটো !

সেতাব চীৎকার করিয়া উঠিল, চাঁপাডাঙার বউ ! যা-তা বোলো না বলছি।

চাঁপাডাঙার বউ খুব গম্ভীর ভাবে বলিল, পরের ঘর ভাঙতে যেয়ো না। তোমার নিজের ঘর ভেঙে যাবে।

সেতাব এবার হাত জোড় করিয়া বলিল, জোড় হাত করছি চাঁপাডাঙার বউ, তুমি থাম—তুমি থাম।

চাঁপাডাঙার বউ সঙ্গে সঙ্গে গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, তুমি হাত জোড় করলে, আমি তোমাকে পেনাম করছি। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া বলিল, আরও একটা কথা তোমাকে বলি। ঘোঁতন ঘোষের ধান মহাতাপ ছেড়ে দিয়েছে, তুমি তবু লোক পাঠিয়ে পঞ্চায়েতে ঘোঁতনকে ডেকে পাঠিয়েছ। ভাল কর নি। ও-কথা আর তুলো না।

সেতাব চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, ইয়েকে বলে, ই তো ভারি ফেসাদ জুড়ে দিলে ! পাওনা ধান ছেড়ে দোব ?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, মহাতাপের মানের চেয়ে ধান বড় হল ? তার অপমান হবে।

—বোকা পেয়ে তাকে ঠকিয়ে নিলে, তাতে অপমান হয় না আর—

—না, হয় না। যে দান করে সে দাতা। দাতার বোকা বুদ্ধিমান নাই। মহাতাপ দান করেছে। তাকে যদি খাটো করতে চাও, তবে আমি উপোস দেব বলে দিলাম।

বলিয়া সে হনহন করিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সেতাব নিজের মাথার চুল খামচাইয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি মানি না, মানি না। কারুর কথা আমি মানি না। আমি সেতাব মোড়ল। বলিয়া সেও বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউকে সে ভয় করে। আবার তাহাকে নহিলে তাহার একদণ্ড চলে না।

চাঁপাডাঙার বউ যেন তাহার বুকের ভিতরটা দেখিতে পায়। কোন কথা তাহার কাছে গোপন থাকে না। তার উপর তার কাটা-কাটা কথা। সেতাব থই পায় না। আবার বিচিত্র চাঁপাডাঙার বউ, সে তার বাপের মৃত্যুকালে দেওয়া হাজার টাকা দামের গহনা সেতাবের হাতে দিয়া হাসিয়া বলে—টাকার অভাবে তুমি নীলেমে লক্ষ্মীপুরের বাবুদের চরের জমিটা কিনতে

পারছ না, জমিটা হাতছাড়া হলে তোমার দুঃখ হবে। কিনে ফেল জমিটা। পরে আমাকে টাকা দিয়ো।

লক্ষ্মীপুরের বাবুদের চরের জমি—সোনা-ফলানো চর। সেখানে এক-একটা তরমুজ হয় পাঁচসের ওজনের। সেই জমি কেনার পর, মণ্ডলবাড়ি আবার পূর্বের শ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে। আগের অবস্থাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু—। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহার হুকুমে ওই ঘোঁতনের মত পাষণ্ড উদ্ধত শয়তানকে পাওনা ছাড়িয়া দিতে হইবে। ঘোঁতনকে সে দু-চক্ষে দেখিতে পারে না! সেই স্কুল জীবন হইতে! মহাতাপের অপমান হইবে? মহাতাপ তাহার মায়ের পেটের ভাই। বিষয়-সম্পত্তি, এই ভূতের বেগার খাটা কাহার জন্য কিসের জন্য? তাহার নিজের জন্য? সে খায় ক-মুঠা? পরে কি? তাহার নিজের সন্তান আছে? সে খাটে মণ্ডলবাড়ির জন্য। সবই পাইবে মহাতাপের ছেলে মানিক। মানিকের যে ভাইয়েরা ইহার পর আসিবে তাহারা। চাঁপাডাঙার বউ ছাড়া অন্য কেহ হইলে সে এতদিন বংশরক্ষার জন্য আবার বিবাহ করিত। কিন্তু সেতাব তাহা করে নাই। তুমি সেটা মান না! ঘোঁতনকে পাওনা ছাড়িতে হইবে। রামকেষ্ট শিবকেষ্টদের জমি কিনিতে সে পাইবে না। তোমার কথায়? প্রতাপ মোড়ল মারা গেলে সম্পত্তি নীলামে উঠিয়াছিল—রামকেষ্ট শিবকেষ্টর বাপ হরেকেষ্ট মণ্ডল চাদর গায়ে দিয়া সদরে গিয়া প্রতাপ মোড়লের খিড়কি পুকুরের অংশ কিনিয়াছিল। এখনও তাহারা সে পুকুরের অংশীদার। তোমার কথায় তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে! তুমি সেতাবকে ধর্ম অধর্ম শিখাইতে আসিয়াছ। রাগে তাহার চুলগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বাহিরে আসিয়া গোয়াল-বাড়িতে দাঁড়াইল। ডাকিল, গোবিন্দে, গোবিন্দে! ওরে অ-গোবিন্দে! গোবিন্দে!

গোয়ালঘর হইতে গোবিন্দ বাহির হইয়া আসিল—কি বলছেন গো?

সে চোখ কচলাইতে লাগিল।

—ঘুমুচ্ছিলি?

—ঘুমুই নাই। বসে বসে ঢুলছিলাম।

—ঢুলছিলি?

—কি করব? বড় মনিব্যান না এলে তো দুধ দোয়ানো হবে না।

—তু এক কাজ কর। ছুটে যাবি রামকেষ্টদের বাড়ি, বুঝলি?

ঘাড় নাড়িয়া গোবিন্দ বলিল, হ্যাঁ।

—রামকেষ্টদের তুই কাকীকে জানিস তো?

—এই তো খানিক আগে এয়েছিল, তারাই ?

—হ্যাঁ। তাদের যাকে পাবি ডাকবি, আড়ালে ডাকবি. বলবি—কেউ যেন না শোনে, বুঝলি ?

—হ্যাঁ, চুপিচুপি বলব।

—হ্যাঁ। বলবি—বড় মুনিব বলে দিলে, তোমরা জমি চাইবে। বাস, বলে চলে আসবি।

বলিয়াই আপন মনে বলিল, তারপর আমি দেখছি। আমি কারুর কথা শুনি না। কাউকে গেরাহ্য করি না। বড় সব বাড় বেড়ে গিয়েছে।

বলিতে বলিতে গোয়াল-বাড়ি হইতেও বাহির হইয়া গেল।

চণ্ডীমণ্ডপের পঞ্চায়েত মজলিসে সেতাব আসিল সকলের শেষে। মজলিসের সকলে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রায় দশ-বারো জন লোক বসিয়া আছে। পঞ্চায়েতের প্রধান মোটা মোড়ল বিপিন মণ্ডল স্থূলকায় মানুষ, গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক। শান্তদর্শন লোকটি। তাহার আশেপাশে বাকি লোক বসিয়া আছে। রামকেষ্ট ও শিবকেষ্ট দুই ভাই দুই বিপরীত দিকে বসিয়াছে। একটু দূরে বসিয়া আছে তাহাদের দুই বিধবা খুড়ী। মাঝখানে একটা হ্যারিকেন জ্বলিতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পথের উপরে জন চার-পাঁচ ছোকরা অন্ধকারের মধ্যে বিড়ি টানিতেছে। একজন বলিতেছিল, জমি তো মোট তিরিশ বিঘে। তাতে খুড়ীদিকে জমি দিতে গেলে ওদের থাকবে কি ? অন্য একজন বলিল, ওরা ধরেছে, জমিই ওরা নেবে। সংসারে থাকা মানে অধীন হয়ে থাকা। সে ওরা থাকবে না।

—তা বললে চলবে কেন ? ওদের দু ভায়ের কথা ভাবতে হবে তো ?

—পঞ্চায়েত কি বলছে ?

—মোটা মোড়ল 'না' বলেছে। আর সবাই চুপ করেই আছে। সেতাব পাকু না এলে মুখ খুলবে না।

ঠিক এই সময়েই পিছনে শোনা গেল গলাঝাড়ার শব্দ। একজন বলিল, কে ?

পথের বাঁক হইতে লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আসিল সেতাব।

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। একজন বলিল, সেতাবদাদা !

সেতাব বলিল, আর সেতাবদাদাতে কাজ নাই। পথ ছাড়।

একজন হাসিয়া বলিল, কি হল, মেজাজ এত খারাপ কেন ?

সেতাব তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের তালগাছের টুকরা দিয়া

গড়া সিঁড়িতে পা দিয়া বলিল, সেতাব কারু কথা গেরাহ্য করে না, বুঝেছ? সে পেকো চামদড়ি কৃপণ—যা বল। ন্যায্য কথা সেতাব বলবেই, আর ন্যায্য দাবি পাওনা সে কড়াক্রান্তি কাউকে ছাড়বে না।

সে গটগট করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

মেজাজটা সত্যই তাহার খারাপ হইয়া আছে।

মহাতাপ সন্ধ্যার সময় কাঁধে খোল লইয়া সংকীর্তনের দলে যোগ দিতে যাইবার পথে বাড়ির দুয়ারে প্রকাণ্ড একটা গোখুরা সাপ মারিয়াছে। বৈশাখ মাস, গোখুরা সাপকে পিতিপুরুষে ব্রাহ্মণ বলিত, তাহার উপর অনেক সাপ বাড়ির লক্ষ্মীর প্রহরী। সাপটা বাহির দরজার পাশ দিয়া যাইতেছিল। মহাতাপ একে মহাতাপ, তাহার উপর বৈকালে ভাঙ খাইয়াছে। সাপটাকে দেখিবামাত্র খোল নামাইয়া খামারের একটা বাঁশ লইয়া দুমদাম শব্দে দুই তিনটা আঘাতেই শেষ করিয়াছে। তিরস্কার করিলে বলিয়াছে—হুঁ, সাপ যদি লক্ষ্মীর পাহারা হয় তো মহাতাপও দিগগজ পণ্ডিত!

তারপর দুই হাতের বুড়া আঙুল নাড়িয়া বলিয়াছে—কচু জান তুমি! এ বাড়ির লক্ষ্মীর পাহারা সাপ নেহি হ্যায় মহাতাপ হ্যায়। এ বাড়ির লক্ষ্মী হল বড়বউ, আউর মহাতাপ মণ্ডল পাহারাদার!

সাপটাকে দেখাইয়া বলিয়াছে, ও বেটা লক্ষ্মীকে ডংশাতে এসেছিল। এখুনি বড় বউ আসত সন্ধ্যেতে বার দোরে জল দিতে। বাস্। ফোঁসা না-না করে লাগাত ছোবল!

বলিয়াই খোল লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

তাহার উপর পঞ্চায়েত আসরে আসিবার জন্য লণ্ঠনটি হাতে লইয়া পা-টি সবে বাড়াইয়াছে অমনি আদরিণী বড় বউ টুক করিয়া পিছু ডাক দিয়াছে। সে ডাকার কত ঢং!

—পিছু ডাকছি না। কিন্তু মনে করিয়ে দিচ্ছি আমার মাথার দিব্যি রইল!

সেতাব চমকিয়া উঠিয়াছিল। ভুরু কুঁচকাইয়া বলিয়াছিল—মানে?

হাসিয়া কাদু বলিয়াছিল—ওর আবার মানে থাকে নাকি? মাথার দিব্যি মানে মাথার দিব্যি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু কিসের জন্যে?

কাদু উত্তর দিয়াছে—সত্যি যদি আমাকে ভালবাস তো কিসের জন্যে তা পঞ্চায়েতের আসরে যেতে যেতে ঠিক মনে পড়বে।

সেতাব চটিয়া উঠিয়াছিল—হেঁয়ালী সে ভালও বাসে না, বুঝিতেও পারে না। অথচ ওই কাদুর অভ্যাস। কাদুর স্পর্ধা একেবারে আকাশে ঠেকিয়াছে।

গাঁয়ের অনেক মেয়ে আড়ালে আড়ালে বলে—মোড়লবাড়ির চাঁপাডাঙার বউ অহংকারে যেন মটমট করছে। হেসে ঠেকায় দিয়ে কথা কয় যেন বিন্দাবনের রাধা। সেতাবের মনে হইয়াছিল তাহারা মিথ্যা বলে না। সে উত্তরে বলিয়াছে —ভাল আমি কাউকে বাসি না; হ্যাঁ।

শুনিয়া কাতুর সে কি হাসি।—বেশ আর একবার বল—তিন সত্যি হোক।

—ক্যানে, মিছেমিছি তিন সত্যি করব ক্যানে? কি দায় পড়েছে!

সারাটা পথ সেতাব আপন মনে গজগজ করিতে করিতে আসিতেছে!

মজলিসের প্রান্তে গিয়া লণ্ঠন রাখিয়া প্রণাম করিল। তারপর মজলিসে গিয়া বসিল। বিপিন তাহাকে দেখিয়াই বলিল, এস বাবা। তোমার অপেক্ষাতেই বসে আছি। নাও, তামাক খাও। হুঁকোটা সে আর একজনকে দিল। সে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি। সে সেতাবের দিকে আগাইয়া দিল। সেতাব হুঁকোটা লইয়া মজলিস হইতে সরিয়া গিয়া পিছন ফিরিয়া টানিতে বসিল। টানিতে টানিতে বলিল, তারপর? কি ঠিক হল সব?

বিপিন বলিল, এ দিকে তো গোল কিছু নাই! জমি মাপজোক, হিসেবকিতেব সে সব তো হয়েই আছে একরকম। রামকেষ্ট শিবকেষ্ট, আপন আপন পছন্দ করেও নিয়েছে! বাসনকোসন ভাগ কাল সকালে হবে। এখন দুই খুড়ী বলছে—আমাদের খাবার মত জমি বার করে দাও।

শিবকেষ্ট বলিল, খেতে দিতে আমরা নারাজ নই। কিন্তু জমি দিতে গেলে আমাদের থাকবে কি?

এক খুড়ী বলিল, তা বাবা, তোমাদের সঙ্গে কি বউদের সঙ্গে আমাদের যদি না বনে?

বিপিন বলিল, ও কথা অনেক হল বউমা! আর থাক্। আমার বাপু জমি দেবার মত নাই।

যে মাতব্বর হুঁকাটা লইয়া সেতাবকে দিয়াছিল সে বলিল, আমি. বলি কি, একটা ধান বরাদ্দ করে দেওয়া হোক, দুজনে দুই খুড়ীকে দেবে। আর দুই খুড়ীর থাকবার মত দুখানা ঘর, রান্নাঘর।

বিপিন বলিল, তা মন্দ কথা নয়। সেতাব, বল বাবা, কি বলছ।

সেতাব হুঁকাটা লইয়া মজলিসের মধ্যে ফিরিয়া বলিল, লেন, খান। বিপিন হুঁকাটা লইল। সেতাব বলিল, আপনাদের উপর আমার কথা বলা ঠিক নয় জেঠা। তবু না বললেও নয়।

একজন বিধবা বলিল, বল বাবা, তুমি হক কথা বল।

—হক কথাই বলব, যেন রাগ-টাগ কেউ করবেন না। ধান ঘর এসব

আমার মত নাই। দেখুন, দু বছর পর যদি ধান বন্ধ করে, কি কোন বছর যদি ভাল ফসল না হয়? দিতে না পারে?

বিধবা টিকুরীর খুড়ী বলিল, এই। বুদ্ধিগুণেই হা-ভাত, বুদ্ধিগুণেই খা-ভাত। পঞ্চায়েত বুঝে দেখুক!

ইন্দাশের খুড়ী সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরিল, তার চেয়ে আমাদের দু জাকে পাঁচ বিঘে করে দশ বিঘে জমি আলাদা করে দাও বাবা, আমরাও নিশ্চিন্দি তোমরাও নিশ্চিন্দি। সাতখানা খাটের দড়িতে থাকব না।

উহু-উহু।—সেতাব ঘাড় নাড়িল।—সাতখানা খাটের দড়িতে থাকব না বললে কি হয় খুড়ী? তোমাদের মুখে আগুন দেবে ওরা, তোমাদের মুখে জল দেবে, শ্রাদ্ধ করবে ওরা। বুড়ো বয়সে অসুখ করলে ওদেরই তোমাদের সেবা করতে হবে। তোমাদের শ্বশুর-স্বামীর বংশ! ভাসুরের ছেলে, স্বামীর ভাইপো। তোমাদের গর্ভের সন্তান নাই; ওরাই তোমাদের সন্তান। আমি বলি, জমি দেওয়াও নয়, ধান দেওয়াও নয়, দুই খুড়ী দুই ভাসুরপোর ঘরে মায়ের মতন থাকবে, তেমনি যত্ন-আত্তি করবে, নাতি-নাতনী নিয়ে ঘর করবে, এরা সেবা করবে ছেখা-ভক্তি করবে, বাস।

বিপিন বলিয়া উঠিল, ভাল ভাল ভাল। এর চেয়ে আর ভাল কথা হতে পারে না। গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরিবোল হরিবোল!

সেতাব বলিল, পৃথক হলেই পৃথক। মা বেটায় পৃথক হলে মা বেটা পর হয়। আবার পরকে আপন করলে পরই আপন হয়। শিবকেষ্ট রামকেষ্ট পৃথক হচ্ছে, কেন হচ্ছে জানি না। তা হচ্ছে হোক। কিন্তু তোমরা খুড়ীরা দু ভাগকে চার ভাগ করে সংসারটার সর্বনাশ করে দিয়ো না।

অন্য একজন বলিল, বাস্ বাস্। এর ওপর আর কথা নাই। হরিবোল হরিবোল!

আর একজন বলিয়া উঠিল, তাই বটে। হরিবোল হরিবোল।

মজলিসের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল।

ওদিকে ঠিক এই সময়ে বাহিরের রাস্তা হইতে কোন একজনের চীৎকার শোনা গেল—বিচার করুক পঞ্চায়েত, এর বিচার করুক। গরীব বলে আমার মান-ইজ্জত নাই? পঞ্চায়েত—

বলিতে বলিতেই গায়ের চাদরখানা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল রাখাল পাল। বিশ্বামিত্রের মত ক্রোধী শীর্ণকায় রাখাল আসিয়া বসিয়াই মাটিতে একটা চাপড় মারিয়া বলিল, পঞ্চায়েত এর বিচার করুক। মজলিসটা স্তব্ধ হইয়া গেল।

সেতাব বলিল, কিসের বিচার রে বাপু? হঠাৎ যে একেবারে গগন ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলি!

রাখাল বলিল, চেঁচাবে না? আলবত চেঁচাবে। পঞ্চায়েত বিচার করবে কি না বলুক!

বিপিন মোড়ল এবার বলিল, কি হল তাই বল?

—আমাকে মারলে। ঠাস করে এক চড়! এই গলাটা দেখ, পাঁচটা আঙুলের দাগ বসেছে।

সে লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া নিজের গালের পাশে ধরিল।

—আঃ তাই তো রে; কে মারলে?

—ওই ওরই ভাই। সে আঙুল দিয়া সেতাবকে দেখাইয়া দিল।

মহাতাপ?—সেতাব প্রশ্ন করিল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

সেতাব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, কি বিপদ হয়েছে যে আমার।

বিপিন প্রশ্ন করিল, এমনি মারলে তোকে মহাতাপ? মহাতাপ রাগী বটে খানিকটা অবোধও বটে, কিন্তু এমনি কেন তোকে মারবে রাখাল?

—নাম সংকেত্তনের দলে আমি বাজাচ্ছিলাম। রাখাল পালের সঙ্গে খোলে কে হাত দিতে পারে বলুক পঞ্চায়েত। আমি হাঁক মেরে বলছি, পাঁচখানা গাঁয়ে কে আছে তা বলুক।

—নাই। তাই হল। সে কথা থাক। কি হল তাই বল।

রাখাল বলিল, তাই হল লয়। ডাক কে আছে? ডাক। একটু চুপ করিয়া রহিল। বোধ করি, কেহ তাহার এই আত্মশ্লাঘার উত্তরে সাড়া দেয় কিনা দেখিবার জন্যই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমাকে বলে তাল কাটছে। নিজে ভাঙ খেয়ে তাল কাটছে। তার ঠিক নাই। আমি বললাম, তোর কাটছে। তা গায়ের জোরে বলে, না, তোর। আমি বল্লাম, মহাতাপ, ক্ষ্যাপামি করিস তোর বউয়ের কাছে বউদির কাছে, এখানে করিস না। এই আমার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়।

বিপিন বলিল, তুই বউ বউদির কথা তুললি কেন?

—কি, হয়েছে কি? বলি তাতে কি হয়েছে কি? তোমরা বিচার করবে কি না বল?

সেতাব বলিল, হবে, বিচার হবে। নিশ্চয় হবে। বস তুই। আগে এই কাজ শেষ হোক। তারপর হবে।

—তারপর হবে?

—হ্যাঁ। বস তুই।

—বসব? বসতে হবে।

—হ্যাঁ রে, তামাক খা।

—নেহি মাংতা হ্যায়। চাই না বিচার আমি। চাই না।

বলিয়া রাখাল হনহন করিয়া চলিয়া গেল। বাহির হইতে বলিল, বড়লোক কি না? নিজের ভাই কি না? বেমক্কা চড় খেয়ে যদি মরে যেতাম আমি?

বিপিন বলিল, গাঁজা খেয়ে খেয়ে রাখালের মেজাজে আগুন ধরেই আছে। মহাতাপকে একটু সাবধান কোরো সেতাব! ভাঙ খেতে ওকে দিয়ো না।

সেতাব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমার হয়েছে মরণ। বুঝলেন। আমার কথা কি শোনে?

—চাঁপাডাঙার বউমাকে বোলো, তাকে খুব মানে শুনেছি।

হঠাৎ সেতাব বলিয়া উঠিল, আমি যাই, হতভাগাকে একবার দেখি—

—বোসো,—বোসো। মাথা খারাপ কোরো না। এদের কাজটা সেরে দাও বাবা।

সেতাব আবার বসিল। বলিল, এর আর সারাসারি কি বলুন? দুই খুড়ী দুই ভায়ের ভাগ। কে কাকে নেবে বলুক। খুড়ীরাও বলুক।

যে ব্যক্তি সেতাবকে হুঁকা দিয়াছিল সে বলিল, ছোট খুড়ী ইন্দেশের বউ তো ছোট ভাই রামকেষ্টর সম্পর্কে শাশুড়ী হয়। রামকেষ্টর বউ তো ভাইঝি হয়।

রামকেষ্ট বলিল, তা হোক। ছোট খুড়ীর টান দাদার ছেলেদের ওপর। ভাইঝিকে দশটা কড়া কথা না বলে জল খায় না।

ইন্দেশের বউ বলিয়া উঠিল, আর তোমার বউ মুখে ময়দা লেপে চুপ করে শোনে, না? একেবারে ভাল মানুষের পিত্তিমে। আমাকে বলে না? বলে কি বাবা সকল—তবে ভাইঝির গুণের কথা শোন। লুকিয়ে চাল-ধান বেচে পয়সা করে। আমি বলি, সাজার সংসারে চুরি করিস না। ভাগী ভাঁড়িয়ে খেতে নাই। তাই রাগ বাবা। সেদিন নিজের ছেলেকে একটা বাঁশি কিনে দিলে। তা শিবকেষ্টর ছোট ছেলেটা কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, একেও একটা কিনে দে। পয়সা তো সাজার সংসারের পয়সা, মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল। আমি বাবা তাকে একটা বাঁশি কিনে দিয়েছি। হ্যাঁ, তা দিয়েছি। ছেলেটা আমার কাছে থাকতে ভালবাসে। এই রাগ।

সেতাব বলিল, বেশ বেশ। তা হলে ছোট খুড়ী শিবকেষ্টর সংসারেই থাকবে।

—তাই থাকব। সেই ভাল।

—আর মেজ খুড়ী টিকুরীর বউ রামকেষ্টর সংসারে থাকবে। বুঝলে গা খুড়ীরা ?

টিকুরীর খুড়ী বলিল, বুঝলাম বাবা, খুব বুঝলাম। এমন বোঝা আর বুঝি নাই কখনও। আঃ মরি মরি মরি।

—তার মানে ?

—মানে ? তুমি বাবা দুমুখো সাপ। এক মুখে কামড়াও এক মুখে ঝাড়। তাই হল। তোমরা পঞ্চায়েত, যা বলবে তাই হল।

বলিয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সেতাব ডাকিল, খুড়ী। অ খুড়ী!

বিপিন বলিল, উঁহু উঁহু! ডেকো না। যাক। ভাগ করতে গিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট করা যায় না বাবা। থাক। এখন শিবকেষ্ট, রামকেষ্ট, ইন্দেশের বউমা, এই যা হল—তাতে তোমরা মোটামুটি খুশী তো ?

শিবকেষ্ট বলিল, আমার আপত্তি নাই।

—রামকেষ্ট ?

আমি মশায় যা করে দেবেন তাতেই রাজী।

ইন্দেশের বউ বলিল, আমি মেনে নিয়েছি বাবা, আমি মেনে নিয়েছি।

সেতাব উঠিল। আমি তাহলে উঠলাম জেঠা।

বিপিন বলিল, তা তোমার সেটা কি করে হবে ? ঘোঁতনের সেইটা। ঘোঁতন তো আসে নাই।

সেতাব বলিল, সে—সে আমি ছেড়ে দিলাম। বুঝেছেন ? সে ছেড়ে দিয়েছি। মহাতাপ যখন ছেড়ে দিয়েছে, তখন ও-কথা থাক। তবে বলতে চেয়েছিলাম, ঘোঁতন আমাকে আঙুল খাবে ক্যানে ? বুঝেছেন ? আর পাগলকে শিব সাজাবার লোভ দেখিয়ে দশ টাকা চাঁদাই বা নিয়েছে ক্যানে ? তারই জন্যে। বলুন না দশজনে জোচ্চুরি কিনা! আচ্ছা, আমি চললাম জেঠা।

সে বাহিরে আসিয়া আবার একটি প্রণাম করিয়া লণ্ঠনটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেতাব বাড়ির দরজায় আসিয়াই চাঁপাডাঙার বউয়ের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। বাড়ীর ভিতরে চাঁপাডাঙার বউ কাহাকে তিরস্কার করিতেছে।

—তোমাদের দু ভায়ের জ্বালায় হাড়ে কালি পড়ে গেল। নিন্দে শুনে কান পচে গেল।

সেতাব দরজা খুলিয়া গোয়াল-বাড়িতে প্রবেশ করিল, তাহার পর খামার-বাড়িতে ঢুকিল। এবার মহাতাপের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে বলিল, আমি তোমাকে জ্বালাব? আমি তোমার হাড়ে কালি পড়ালাম?

—পড়াও না?

—কক্ষনও না। সে পড়ায় তোমার স্বামী—কুচুটে পাকাটি চামদড়ি কেপন—

—ছি ছি মহাতাপ।

—আর ওই ছোট বউ। ওই কুঁদুলী, ওই ঘ্যানঘেনানী, ওই দুষ্টু সরস্বতী। মানদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ও মা গ—অ! বলে সেই দরবারে হেরে বউকে মারে ধরে। আমাকে নিয়ে পড়লে কেন?

সেতাব বাড়ি ঢুকিয়াই আলোটি কমাইয়া দিয়া খামার-বাড়িতে চুপ করিয়া বসিল।

বাড়ির ভিতরে তখন মানদা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, খবরদার বলছি, আমাকে নিয়ে কথা বলবে না বলছি।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, মানু, তুই চুপ কর।

—কেন? চুপ করব কেন? আমাকে নিয়ে পড়ল কেন?

মহাতাপ বলিল, পড়বে না? তুই তো আজ আমাকে ভাঙ খাওয়ালি। তুই কিনে আনিয়ে বেটে সরবত করে রাখিস নি, বললি নি? বলুক বড়গিন্নি; সারাদিন ভূতের মত খাটো, বরাবরের অভ্যেস না খেলে বাঁচবে কেন? ভাঙ খেলে আমার চড়াত করে রাগ হয়ে যায়। দিলাম চড়িয়ে রাখালের গালে।

—এখন রাখালের বউ গাল পাড়ছে শোন গিয়ে। যত শাপশাপান্ত একরত্তি মানিকের ওপর। কেন তুমি এমন করে মেরে আসবে?

—নিজে তাল কেটে আমাকে তালকানা বলবে কেন? আমি তালকানা? ও আমাকে বললে। আমি ছাড়ি না কাটি?

—হ্যাঁ, তুমিই তালকানা, তোমার তাল কেটেছিল, আমি বলছি। নাও, মার আমাকে দেখি।

—বড় বউ। ভাল হবে না বলছি!

—নাও, মার না।

তুমি ছোট বউ হলে সে দিতাম এতক্ষণ।

মানদা ফোঁস করিয়া উঠিল, কই, মার না দেখি।

—দেখবি?

বড় বউ দাওয়া হইতে উঠানে নামিল,—কাল সকালে আমি চলে যাব

তোমাদের বাড়ি থেকে। তোমাদের দুই ভায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তারও হবে। মহাতাপের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমারও হবে। দুই ভাইয়ে যা খুশি করবে। এই রাতদুপুরে দুদিক থেকে দুই ভায়ের ওপর গাল পড়ছে। ওদিকে রামকেষ্টদের বাড়ি থেকে, এদিকে রাখালের বউ। আমি আর পারব না, আমি আর পারব না।

বলিয়া চাঁপাডাঙার বউ ঘরে ঢুকিয়া গেল।

মানদা বলিল, নাও, হল তো। গোসাঘরে খিল পড়ল তো। আর খাবেও না, সাড়াও দেবে না, কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে।

সেতাব এবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল ; সে আর থাকিতে পারে নাই। সে বলিতে বলিতেই ঢুকিল, একে বলে, এ তো বড় ফেসাদ। একে বলে, ঘোরালে লাঠি, ফেরালে কোঁতকা—সে বিভ্রান্ত ! আরে বাপু, আমার অন্যায়টা কি হল ? তুমি যা বললে, তাই করে এলাম। জমি ধান সব দেওয়া বাতিল করে দুই বউকে দুই ভায়ের ভাগে ভাগ করে দিলাম। তাতেই গাল দিচ্ছে টিকুরীর খুড়ী। রামকেষ্টরা নয়। তা আমি কি করব ? ঘোঁতনার ওপর নালিশ তুলে নিলাম—

মহাতাপ উঠানে ভাম হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তোমার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হোক—চললাম আমি।

সেতাব ব্যস্ত হইয়া বলিল, অই—অই—ওরে, চললি কোথা ? ওরে। অঃ এ গোঁয়ার গোবিন্দকে নিয়ে কি করি বল তো ? ওরে। সেতাবও বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইতে মহাতাপ বলিল, সেই রাখলার কাছে চললাম। তার পায়ে ধরে নাকে খত দিয়ে নাকের চামড়া তুলে দিয়ে আসছি।

মানদা ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, দিদি ! দিদি ! শুনছ ?

বড় বউ আবার বাহির হইয়া আসিল।

মানু বলিল, ওই আবার গেল বারণ কর।

—না। যাক। রাখাল প্রবীণ মানুষ, গাঁজা খায়, কিন্তু কখনও কারুর মন্দ করে না। ধার্মিক লোক। তার কাছে মাপ চেয়ে আসুক। রাখালের বউয়ের শাপশাপান্ত আর শুনতে পারছি না।

মানদা ফোঁস করিয়া উঠিল—আর টিকুরীর খুড়ীর শাপশাপান্ত ? বড় মোড়লকে পাঠাও পায়ে ধরতে।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, বড় মোড়ল ন্যায়বিচার করে এসেছে মানু। অন্যায় তো করে নি। টিকুরীর খুড়ীই অন্যায় করে শাপান্ত করছে। সে শাপান্ত

আমাদিগকে লাগবে না। আর সে গাল তো দিচ্ছে বড় মোড়লকে আমাকে। তা দিক, মানিকের অকল্যাণ না হলেই হল।

শিবকেষ্ট রামকেষ্ট পালদের বাড়ির একাংশে পথের ধারে দাওয়ার উপর বসিয়া টিকুরীর বউ উচ্চকণ্ঠে গাল দিতেছিল। কিছুদূরে শিবকেষ্ট রামকেষ্ট দাঁড়াইয়া আছে। আর কয়েকজন জুটিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ঘোঁতন রহিয়াছে। দাঁড়াইয়া জটলা করিয়া বিড়ি টানিতেছে।

পল্লীগ্রামে সেই ছড়ার মত বাঁধা গালি-গালাজ—অভিসম্পাত। তাহার বাঁধুনি বিচিত্র, সুর বিচিত্র।

টিকুরীর বউ বলিতেছিল, সব্বস্বান্ত হবে, পথে দাঁড়াবে, ফকির হবে, জমিদার মহাজনে ডুগডুগি বাজিয়ে যথাসব্বস্ব নীলেম করে নেবে। টিনের চাল ঝড়ে উড়ে যাবে, পাকা মেঝে ফেটে চৌচির হবে। সাপখোপের আড়ত হবে। অকালে মরবেন, অকালে মরবেন, বিনা রোগে ধড়ফড়িয়ে যাবেন—ওই আদুরী গিন্দেরী পরিবার চাঁপাডাঙার বউয়ের দশা আমার মত হবেন।

ওপাশ থেকে ঘোঁতন বলিয়া উঠিল, তা হবে না খুড়ী, তা হবে না। ও শাপ দিও না। ফলবে না, ফলবে না।

টিকুরীর বউ ফোঁস করিয়া উঠিল—কে রে, বলি তুই কে রে মুখপোড়া ত্যাঁদড়? তুই কে?

ঘোঁতন হাসিতে হাসিতে আসিয়া দাঁড়াইল।—মুখখানা আমার কালো বটে খুড়ী, কিন্তু পোড়ে নাই; মেচেতা পড়েছে। আমি ঘোঁতন।

—ও। ইংরেজী-পড়া বাবু, যাত্রার দলের কাপ। তা তুই তো বলবিই রে? তোকে ধান ছেড়ে দিয়েছে, নালিশ তুলে নিলে।

—নিলে সাধে! আমি ঘোঁতন ঘোষ। হ্যোৎ-তা-তা লাঙল-ঠেঙানো বুদ্ধি' নয় আমার। আমি কলকাঠি টিপতে জানি। পাঁকাল মাছের পেটে কেঁচোর বাসার খবর জানি আমি। বুঝেছ! আমার নামে নালিশ করবে?

—তুই আমার হয়ে একটা নালিশ ঠুকে দিতে পারিস? পাঁপরের দরখাস্ত না-কি বলে। টাকাকড়ি লাগে না, অনাথ গরীব বলে।

—বললেই পারি। ঘোঁতন কাউকে ডরায় না!

—তা হলে বোস্। আমি গালটা দিয়ে নিই। মনের ঝালটা মিটিয়ে নিই।

—তা লাও। ওদিকে রাখালের বউও খুব জুড়েছে—ওলাউঠো হবে, না হয়তো রাজকাশ হবে। লোহার গতর ভেঙে যাবে। ছেলে মরবে। বউ ভিক্ষে করবে—

সুর ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে টিকুরীর বউ শুরু করিল, করবে, ভিক্ষে করবে, দোরে দোরে হরিবোল বলে ওই চাঁপাডাঙার বউ—

হঠাৎ চমকিয়া টিকুরীর বউ বলিল, কে র‍্যা ?

অন্ধকার পথে একটা তুনী মাথায় করিয়া যাইতেছিল নোটন।

—আমি গো, নোটন।

—নোটনা। তা মাথায় কি ? তুনী নাকি ? এত রেতে তুনী নিয়ে কি করবি ?

—হাঁ্যা গো। আকের জমিতে ছেঁচন দিতে হবে।

শিবকেষ্ট বলিল—চুপ কর খুড়ী। সেতাবদের কৃষেণ নোটন—ও সব শুনে গেল। বলবে তো গিয়ে সব মুনিব-বাড়িতে।

দুই হাতের বুড়া আঙুল নাড়িয়া বুড়ী বলিল—বয়েই গেল—বয়েই গেল। আমাব বেগুনবাড়ি ভেসে গেল ! শুনবে ! শোনবার জন্যেই তো বলছি ! আমি কি ভয় করি নাকি কাউকে।

তখন সেতাবের বাড়িতে দাওয়ার উপর পিঁড়িতে বসিয়া রাখাল ভাত খাইতেছে। সঙ্গে বসিয়াছে—মহাতাপ ও সেতাব। পরিবেশন করিতেছে চাঁপাডাঙার বউ। সে অম্বল পরিবেশন করিতেছিল। সকলেই তালুতে টোকা মারিযা খাইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছিল, আঃ !

রাখাল বলিল, আব একটু দাও, বউমা, আর একটু ! বেড়ে রেঁধেছ ! খাসা হয়েছে !

সেতাব বলিল, তা হলে কি হবে ! কাঁচা তেলের গন্ধ উঠেছে। এত করে নাকি তেল দেয় ! হুঃ ?

মহাতাপ বলিল, তেল বেশি হয়েছে, তেল বেশি হয়েছে ! তেল নইলে রান্না হয় নাকি ?

রাখাল বলিল, আরে, ওই তেলেই তো অম্বলের সৌরভ· সুবাস ! নেশার মুখে যা লাগছে, সে কি বলব, অমৃেত যেন। আর তেমনি কি রান্নার তাক। বেঁচে থাক মা সুখে থাক, সংসারের কল্যাণ হোক। খেয়ে মুখটা জুড়ল। পোড়া আর পরা আসেদ্ধ আর নুনচড়া খেয়ে জিভে যেন চটা ধরেছিল।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, সব আমাদের ছোট বউয়ের রান্না।

—বা-বা-বা ! বলিহারি ! তা হবে না কেনে ? মহাতাপ যে ছোকরা বড় ভাল, বড় ভাল ছোকরা ! আমাকে বড় মেরেছে ভাঙের নেশার মুখে। তা মারুক ! ভুল করেছে। আবার গিয়ে তো বললে—রাখালদাদা দোষ হয়েছে ! তা আমিও বললাম, বাস্‌ বাস্‌; ঠিক আছে। ভাগ্যে পঞ্চায়েতে

নালিশ করি নাই! বুয়েচ, হাতের তীর ছাড়তে নাই। ছাড়লেই বাস্, ভ্যাঁক করে বিঁধে যাবে। তাইতো আমার পরিবারকে তখন থেকে বলছি—এমন করে গাল দিস না, দিস না। তা বুয়েচ, আমাকে মানুষ বলেই গণ্যি নাই। তোমরা কিছু মনে কোরো না—ওর কথায় কিছু হয় না। বুয়েচ? তা সেও ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। মহাতাপ বললে, খেতে হবে, আজই রেতে। তা আমি দোনোমনো করছিলাম, কিন্তু সেই বললে—সে কি, ডাকছে হাত ধরে, যাবে না কি? বুয়েচ! তা পেট খুব ভরল। খুব।

মানদা আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া দিল।

—আবার কি?

—দুধ।

এমন সময় বাহিরে ধম করিয়া একটা শব্দ উঠিল। সকলেই চকিত হইয়া উঠিল। মহাতাপ খাবার ছাড়িয়া উঠিয়া লাফাইয়া নামিল।

—কে?

ওপাশ হইতে সাড়া আসিল, আমি গো ছোট মুনিব।

মহাতাপ বাহির হইয়া গেল।

খামার-বাড়িতে নোটন দুনীটা সশব্দে ফেলিয়াছে, শব্দটা তাহারই।

মহাতাপ বলিল—দুনী আনলি?

—না আনলে? তোমার মন তো বিন্দাবন, যদি বাঁশি বাজে তো রেতেই বলবে—চল্ যাব, লাগাব দুনী! তোমার কিলকে বড় ভয়!

—দাঁড়া রে বাবা, খোল কুটে রেখেছে কি না দেখি!

—সে বড় মোল্যান ঠিক রেখেছে। কাজে তার ভুল হবে না!

—আর খোল তো এসেছে কাল বিকেলে! আজ কুটলে কখন? বড় বউ—অ বড় বউ?

ফিরিয়া আসিয়া বাড়িতে ঢুকিল। তখন সেতাব-রাখালের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহারা হাত মুছিতেছে।

রাখাল বলিতেছে, তা তুমি পালদের বাড়িটা ভাগ করে ভাল করেছ সেতাব। ঠিক করেছ। বউ দুজনাকে ভাগ করে দুজনার ঘরে দিয়েছ, ন্যায্য করেছ। হুঁ! তা নইলে জমি দিলে বেচে-খুচে পালাত। বেশ করেছ। তা হলে আমি যাই। বুয়েচ? আর ওই আমার পরিবারের গালের জন্যে কিছু মনে কোরো না। আমি ঠাণ্ডা, সেও ঠাণ্ডা। বুয়েচ? আমি চললাম। সে আসবে, কাল মহাতাপের বউ-ছেলেকে আশীর্বাদ করতে আসবে। বুয়েচ! বলিয়া পুলকিত হাস্যে স্মিতানন হইয়া উঠিল।

সে চলিয়া গেল। ওদিক হইতে আসিয়া মহাতাপ ঘরে ঢুকিল।

মহাতাপ হাঁকিয়া বলিল, বলি কানমে কেতনা ভরি সোনা পিঁধা হ্যায় বড় মোল্যান? বলি, আকের গোড়ায় দেবার খোল কাটা হয়েছে?

মানদা বলিয়া উঠিল, বিত্তোব দেখ! ষাঁড়ের মত চেঁচানি দেখ?

কথাটা অবশ্য সে চাপা গলাতেই বলিল, কারণ ভাসুর রহিয়াছে। কিন্তু কথাগুলা কাহারও কান এড়াইল না। এড়াইবার জন্য বলেও নাই সে।

মহাতাপ ফাটিয়া পড়িল, অ্যাও! কিল মেরে দাঁত ভেঙে দোব। সে আগাইয়াও গেল।

বড় বউ বাহিরে ছিল না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মহাতাপের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, কি হচ্ছে, হচ্ছে কি?

মহাতাপ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বড় বউ বলিল—মারবে! কেন মারবে শুনি?

মহাতাপ বলিল, তোমাকে নয়। ওই দুষ্টু সরস্বতীকে।

মানদা বলিয়া উঠিল, বটে! আমি বুঝি বানে ভেসে এসেছি?

—আরে, তুই আমাকে ষাঁড় বললি কেনে?

বড় বউ বলিল, তুমি ওকে দুষ্টু সরস্বতী বলবে কেন? আর ষাঁড় তো ভাল কথা। বাবা শিবের বাহন। মা দুর্গার সিংহ তার কাছে পারে না।

—আমাকে বোকা বোঝাচ্ছ তুমি!

—না। তাই পারি? বোসো, ঠাণ্ডা হয়ে বোসো। এখন কি বলছিলে বল? কানে কত ভরি সোনা পরেছি, না—কি?

মানদা বলিয়া উঠিল, শুধাও না. কত ভরি দিয়েছে?

মহাতাপ বলিল, সে ওই কেপনকে বলবে। কেবল ধান বেচেছে, গুড় বেচেছে আর টাকা করেছে।

সেতাব আর পারিল না। বলিল, তুমি দাতাকর্ণ হয়ে লোককে পাওনা গণ্ডা ছেড়ে দিয়ে আসছ! এমনি করলে, খাবে—দু হাতের বদলে চার হাতে খাবে।

মহাতাপ উত্তর না পাইয়া হঠাৎ মাটিতে চাপড় মারিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আমার খোল কোটা হয় নাই কেনে? আমার আকের জমিতে ছেঁচন দিতে হবে। তার আগে খোল না দিলে, আবার সেই এক মাস পর ভিন্ন হবে না। কেনে খোল কোটা হয় নাই?

সেতাব বলিল, হবে রে হবে। ব্যস্ত হোস না! দু-তিন দিন দেরি হলে মহাভা রত অশুদ্ধ হবে না।

কাদম্বিনী বলিল, কাল-পরশু দু দিনে আমি কুটিয়ে দোব। তুমি খেপো না। আর ছেঁচন দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি কোরো না। জল নামবে। দু-তিন দিনেই মধ্যেই নামবে।

—নামবে। তোমার হুকুমে নামবে। আকাশ খাঁ-খাঁ করছে। জ্বলে গেল সব।

—নামবে। গরম দেখছ না? তারপর ওই দেখ। লণ্ঠনটা হাতে লইয়া সে দেওয়ালের গায়ে আলো ফেলিয়া অন্য হাতের আঙুল দিয়া দেখাইল—মেঝে থেকে পিঁপড়েরা ডিম মুখে করে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

দেখা গেল, সারি বাঁধিয়া লক্ষ পিঁপড়া উপরে উঠিয়া চলিয়াছে।

বড বউ বলিল, শুধু এক জায়গায় না, আজ আমি পাঁচ-সাত জায়গায় দেখেছি।

—আ—ত তেরি তোম তেরে না। বলিয়া মহাতাপ একটা লাফ দিয়া উঠিল; তারপর বলিল, দাদা, বোসো বোসো। তামুক সাজি।

বলে কলকে লইয়া তামাক সাজিতে বসিল।

বড বউ ডাকিল, মানু আয় খেয়ে নিবি।

বড় বউয়ের দেখায় ভুল হয় নাই। রাত্রে সত্য সত্যই জল নামিল। গুরু গুরু শব্দে মেঘগর্জনে মহাতাপের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধডমড করিয়া উঠিয়া বসিল।

মানু তখন উঠিয়া পডিয়াছে! সে ঘরের জানালা বন্ধ করিতে ব্যস্ত।

মহাতাপ সদ্য-ঘুম-ভাঙা চোখে বিহ্বলের মত চাহিয়া বলিল, জল? মেঘ ডাকছে?

মানু বলিল, ছাঁটে সব ভিজে গেল।

মহাতাপ বলিল, যাক যাক। বন্ধ করিস না মানু, বন্ধ করিস না।

—বন্ধ করব না?

—না। আহা-হা, কেমন জল নেমেছে দেখ দেখি!

উঠিয়া গিয়া মানুর হাত ধরিল। বলিল, বোস এইখানে। বসে বসে জল দেখি।

মানু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, জল দেখব?

—হ্যাঁ। আমার কোলে মাথা রেখে শো। আমি জল দেখি আর তোকে দেখি। হঠাৎ এই বর্ষার আমেজে তাহার আবেগ-উথলিয়া উঠিল। সে দুই হাতে মানুর মুখখানি ধরিয়া বলিল, পাগলি পাগলি! তোকে আমি খু-ব ভালবাসি।

—ছাই বাস। দিনরাত—মারব, মারব আর অকথা-কুকথা!

—আরে! সে কথা তোকে না মান্থ, তোকে না। তোর ক্যাঁটকেঁটে কথাকে—

—হুঁ। বড় মোল্যানের কথাগুলা তো মিষ্টি লাগে! তার বেলা?

—আরে বাপরে! দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া মহাতাপ বলিল, আর বাপরে, বড়কী বহু, উ তো ঘরকে লছমী হ্যায়।

মহাতাপ মানদাকে সজোরে বুকে চাপিয়া যেন পিষিয়া ফেলিল।

ওদিকে চাঁপাডাঙার বউয়ের ঘরে চাঁপাডার বউ আপন ঘরের জানালায় একা বসিয়া বাহিরের বর্ষণের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

সেতাব মুড়িসুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। দুর্বলদেহ সেতাবের অল্পেই শীত লাগে। গ্রীষ্মকালেও সে একখানা চাদর পায়ের তলায় রাখিয়া তবে ঘুমায়। চাঁপাডাঙার বউ স্বামীর জড়োসড়ো ভাব দেখিয়া একটু হাসিয়া চাদরখানা তাহার গায়ে চাপাইয়া দিল। ও ঘরে মানিক কাঁদিয়া উঠিল। চাঁপাডাঙার বউ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে বর্ষা নামিয়া পডিল। জ্যৈষ্ঠ মাসেব শেষেই। কি যে হইয়াছে দিন কালে—সে কথা কৃষিজীবী সাধারণ মানুষগুলি বুঝিতে পাবিতেছে না। চিরকালেব প্রবাদ—খনার বচন—'চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড়পাথর, জ্যৈষ্ঠে মাটি ফাটে—তবে জেনো বর্ষা বটে'। অর্থাৎ চৈত্রে আধা শীত আধা গবম, বৈশাখে কালবৈশাখী, জ্যৈষ্ঠে প্রখর গ্রীষ্ম—এই হইলে জানিবে সুবর্ষা অবশ্যম্ভাবী। আব এ ফাল্গুনের শেষ হইতেই গরম উঠিতেছে। চৈ॰ বৈশাখে মারাত্মক বৌদ্র, কালবৈশাখী নাই! কদাচিৎ এক-আধ পশলা বর্ষা ঝড়; শিলাবৃষ্টি তো নাই। তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে হঠাৎ বর্ষার মেঘ গুরু গুরু ডাকিয়া চলিয়া আসিতেছে। চাষীদের বীজ পড়া হইতেছে না। বর্ষা তাহাদিগকে বেকুব করিয়া দিয়া বিদ্যুতের মৃদু মৃদু চমকে যেন সকৌতুকে হাসিয়া তামাসা করিতেছে। মহাতাপ বর্ষার মেঘকে নিত্য গালি পাড়ে। সে বিপুল বিক্রমে মাঠে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। শুকনা ধূলার বাতে বীজ পাড়া হইয়াছে সামান্য। বাকি বীজ আছাড়া করিয়া ফেলিতে হইবে। দশ দিনের মধ্যে সে কাজ শেষ করিয়া মহাতাপ জমিতে জল বাঁধিয়া লাঙল চালাইতে লাগিয়াছে। সেতাবও এখন মাঠে। সে কখনও খানিকটা কোদাল চালায়। কখনও এক আধবার

লাঙলের মুঠা ধরে। আলের উপর বসিয়া তামাক সাজে, নিজে খায়। মহাতাপকে ডাকিয়া হাতে হুঁকা দিয়া তাহার লাঙলটা গিয়া ধরে।

মহাতাপ বলে—ক্ষ্যাপামি কোরো না। মোষের লেজের বাড়িতে তুমি পড়ে যাবে। মহাতাপ দুইটি বিপুলকায় মহিষ লইয়া লাঙল চালায়।

নোটন কৃষাণ মুখ টিপিয়া হাসে। মিথ্যা বলে নাই ছোট মনিব। বড় মনিব তাহার তালপাতার সেপাই।

সেদিন আষাঢ়ের পনেরোই। গত দুই-তিন দিন মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছিল। মাঠ ঘাট প্রায় ভাসিয়া গিয়াছে। সকালবেলাটাও ঘনঘটা হইয়া রহিয়াছে। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। চাঁপাডাঙার বউ দাওয়ার উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া অলস দৃষ্টিতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। মানিক একটা বাটিতে মুড়ি খাইতেছে।

মানদা ভিজিতে ভিজিতে এক পাঁজা বাসন লইয়া বাড়িতে ঢুকিল। দুম করিয়া দাওয়ার উপরে রাখিয়া দিয়া আবার প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, মানু—

—আসছি।

—যাচ্ছিস কোথা নাচতে নাচতে ?

—মাছ।

—মাছ !

—মাছ উঠেছে পুকুর থেকে। ছোট ছোট পোনা।

—পোনা বেরিয়ে যাচ্ছে ? গোবিন্দকে পুকুরের মুখে বার দিতে বল।

—তুমি বল। আমি মাছ ধরে নিয়ে আসি। সোঁ-সোঁ করে নালার জলে ছুটছে সারবন্দী।

সে বাহির হইয়া গেল।

মানিক দাঁড়াইয়া উঠিল—আমি যাব। সে তাহার সাধের বাঁশিটা লইয়া একবার বাজাইয়া দিল—পু !

বড় বউ তাহাকে কোলে লইয়া মাথাল মাথায় দিয়া উঠানে নামিল। নহিলে যে দুরন্ত ছেলে—জলে ভিজিয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া একাকার করিবে। মহাতাপের ছেলে তো ! খামার-বাড়িতে আসিয়া ডাকিল, গোবিন্দ ! গোবিন্দ !

মানিক বাঁশি বাজাইল—পু-পু। খামারে গোবিন্দ নাই। নিশ্চয় বর্ষার আরামে গোয়ালের দাওয়ায় খড়ের গাদা বিছাইয়া শুইয়া ঘুম দিতেছে। ছোঁড়াটা ইদানীং বড় কাজে ফাঁকি দিতেছে। কোন দিন সন্ধ্যার সময় থাকে

না। সন্ধ্যার আগেই গোরু গোয়ালে ঢুকাইয়া পালায়। তাও দুটা একটা বাছুর বাহিরে ফেলিয়া যায়!

সে গোয়াল-বাড়িতে আসিয়া ঢুকিল।

গোবিন্দ ঘুমায় নাই। সে গোরুর চালায় দাঁড়াইয়া কোমরে হাত দিয়া নাচ প্র্যাক্‌টিস করিতেছিল। সে ইহারই মধ্যে ঘোঁতনের যাত্রার দলে ভর্তি হইয়াছে। আপন মনেই সে—এক দুই তিন, এক দুই তিন চার গনিয়া গনিয়া নাচিতেছিল।

চাঁপাডাঙার বউ ডাকিল, গোবিন্দ।

তালভঙ্গের অপরাধে অপরাধীর মত গোবিন্দ দাঁড়াইয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, ও কি হচ্ছে? অ্যাঁ?

গোবিন্দ জিভ কাটিয়া মাথা হেঁট করিল। মানিক বাঁশিটা বাজাইয়া দিল—পু।

—বলি ক্ষেপলি নাকি? নাচছিস আপন মনে?

—উ কিছু লয়। কি বলছ? মাথা চুলকাইতে লাগিল।

কিছু নয়! এক দুই তিন, এক দুই তিন—বলে নাচছিলি আর বলছিস—কিছু নয়?

এবার গোবিন্দ বলিল, নাচ শিখছিলাম গো! যাত্তার দলে সখী সাজব কিনা? লাও, এখন কি বলছ বল!

—যাত্তার দলে সখী সাজবি? তা হলে সে খুব যাত্তার দল।

—উঁহু! ঘোঁতিন ঘোষ মশায়ের দল? দেখবে এবার কেমন গায়েন করে! হুঁ।

—ঘোঁতন ঘোষের দলে ঢুকেছিস?

বড় বউ স্থির দৃষ্টিতে ছেলেটার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ধারণা করিতে চেষ্টা করিল, ব্যাপারটা কি? তাহার যেন একটা সন্দেহ হইল।

রাখালটা অস্বস্তিতে পড়িয়াছিল। সে বলিল, বল, ক্যানে গো!

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, শাওন মাস থেকে তোর জবাব হল গোবিন্দে। তোকে আর কাজ করতে হবে না। মাসের শেষে মাইনে—। বলিয়াই মনে হইল—গোবিন্দ মাইনে পাইবে না। পূজা পর্যন্ত তাহার মাহিনা সে অগ্রিম লইয়া রাখিয়াছে। আবার একবার তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—এইজন্যেই তুই সন্ধ্যের আগে পালাস? আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ঘোঁতন তোকে আমাদের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করে না গোবিন্দে? কি জিজ্ঞাসা করে?

গোবিন্দ কিছু বলিবার পূর্বেই ছোট বউ এক আঁচল মাছ লইয়া প্রবেশ করিল!—অ দিদি। পাড়ার ছেলে জুটে সব ধরে নিলে মাছগুলো। থলবল করে বেড়াচ্ছে—এক শো, দু শো—

—করুক। তুই তো নেচেকুঁদে এলি জলে কাদায়।

—এই দেখ কত মাছ ধরেছি!

আঁচল খুলিয়া যে ঝরঝর করিয়া মাছগুলা ফেলিয়া দিল। মানিক বাঁশিটা বাজাইয়াছিল। নেহাত ছোট মাছ নয়, গত বছরের পোনা—কোনটা একপোয়া কোনটা তিন ছটাক! কাতলাগুলা পাঁচপোয়া হইয়াছে।

চাঁপাডাঙার বউ ঘোঁতনের কথা বাদ দিয়া গোবিন্দকে বলিল, গোবিন্দ, শিগ্‌গির যা। যতক্ষণ আছিস কাজ করতে হবে তো। যা!

পুকুরটা ভাগের পুকুর। তবে সেতাবদের অংশই বেশি। সেতাব কিনিয়া কিনিয়া অংশটাকে প্রায় দশ আনার কাছাকাছি করিয়া ফেলিয়াছে। পুকুরটা তাহার বাড়ির কাছে, হেফাজাত করিতে সেই করে। সেতাবের পর মোটা অংশ বিপিন মোড়লের; প্রায় সোয়া তিন আনা অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ। অবশিষ্ট এগার পয়সার মধ্যে ভাগী আছে অনেক কয়জন। রামকেষ্ট এবং শিবকেষ্ট তিন পয়সা রকমের ভাগ আছে। সেটা অবশ্য সেতাবের কাছে ঋণদায়ে আবদ্ধ। শিবকেষ্টর ভাগের খুড়ী টিকুরীর বউ 'মাছ বাহির হইতেছে এবং ছেলের পাল মাছ ধরিতেছে' সংবাদ পাইয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া ছেলের দলের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে শুরু করিল।

—বলি অ ড্যাকরারা, অ আল্‌পেয়েরা, আর অ আবাগেরা, আবাগীর পুতেরা, বলি পরের লুটেপুটে খেয়ে কদিন বাঁচবি রে। ওলাওঠো হয়ে মরবি রে, ধড়ফড়িয়ে মরবি। পুকুরে শিবকেষ্টর দেড় পয়সা অংশ, আমার দেড় পয়সা ভাগ দিয়ে যা বলছি। বলি পালাচ্ছিস যে! আমি বুঝি দেখতে পাচ্ছি না? আমার চোখ নাই? ঢেলা ছুঁড়ে মারব, ঢেলা ছুঁড়ে মারব বলছি। পরের পুকুরের মাছ বেরিয়েছে—বড় মজা, ভাজা খাবি, ঝোল খাবি, অম্বল খাবি, খাবি খেয়ে মরবি, ওলাউঠা হয়ে মরবি, অম্বলশূল হবে—

কয়েকটা ছেলে পথের ধারের গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছিল। তাহাদের দেখিয়া টিকুরীর বউ বলিল, যাবি কোথা? পথ আগলে দাঁড়িয়েছি আমি! দে বলছি আমার ভাগের মাছ, দে।

একটা ছেলে তাহাকে জিভ কাটিয়া ভ্যাঙচাইয়া বলিল, দে! দে বললেই

দেব? মাঠে মাছ ধরেছি; তোমাদের পুকুরের মাছ তা কে বললে? গায়ে নেকা আছে?

—ওরে থালভরা! নেকা নাই, কিন্তু মাছগুলো কি আকাশ থেকে পড়ল?

—তা কি জানি? ওই তো বড় মোড়লের মোটা ভাগ, তাদের ছোট বউ তো কিচ্ছু বললে না?

আর একটা ছেলে বলিল, সি এক আঁচল ধরে নিয়ে গেল—সের দরুনে।

টিকুরীর বউ এবার জ্বলিয়া উঠিল! অ্যাঁ? ওরা নিয়ে গেল? যাই, আমি যাই একবার। আগে তোরা মাছ দিয়ে যা। দে—দে—মাছ দে। দে।

হঠাৎ একটা বড় গাছের আড়াল হইতে রাখাল পাল বাহির হইয়া আসিয়া আঁচল হইতে মাছ কয়েকটা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, ওই লে। সে তোর মাছ!

টিকুরীর বউ তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু গাছ-কোমর বাঁধা কাপড় খুলিল না। সে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। অ মাগো এ কে গো? পালেদের ফাকলা?

—ফাকলা। আমার নাম ফাকলা? ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল রাখাল।

—তা ভাসুরের নাম করব নাকি? তুই যে সম্পর্কে ভাসুর হস মিন্‌সে। বুড়ো মিন্‌সে ছেলের পালের সঙ্গে মাছ ধরতে এয়েছে। নোলাতে ছেঁকা দাও গিয়ে।

রাখাল মুহূর্তে ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত জবাব দিল—গরম গরম মাছভাজা খেয়ে তুমি নোলাতে ছেঁকা নিয়ো মা, তুমি ছেঁকা নিয়ো। নোলাতে আরও গাল ফুটবে; তপ্ত খোলায় খইয়ের মত ফুটবে।

হনহন করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে রাখাল আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, মরে তুমি মেছো পেত্নী হবে, মাছ মাছ করে বিলে বিলে চবং করে ঘুরে বেড়াবে, সারা অঙ্গে জোঁক ধরবে। তা আমি বলে দিলাম। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ছেলেগুলা এই অবসরে সুটসুট করিয়া পালাইতেছে। টিকুরীর বউ এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল, মাথায় সে এতক্ষণে ঘোমটা দিতে পারিয়াছিল এবং রাখাল পালের গমনপথের দিকে চাহিয়া বলিল, মরে যাও, তুমি মরে যাও, অপঘাতে যাও, মাছ বলে সাপ ধর, সাপের কামড়ে জ্বলে পুড়ে মর। পেরেত হও। আপন জ্বালাতে তুমি দাপাদাপি করে বেড়াও।

মাছ কয়টা কুড়াইতে সে কিন্তু ভুলিল না। মাছ কয়টা কুড়াইতেছিল।

এমন সময় মাঠের খাবার লইয়া বড় বউ বাড়ি হইতে বাহিরে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, কি হল গা টিকুরীর খুড়ী?

মাছ কুড়াইতে কুড়াইতেই মুখ তুলিয়া চাঁপাডাঙার বউকে দেখিয়া টিকুরীর খুড়ী বলিল, এই যে! মোড়ল-গিন্নী! ভামিনী আমার!

মাছ কুড়াইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, তোমাদের ছোট বউ নাকি সাজার পুকুরের পাঁচ সের মাছ ধরে ঘরে ঢুকিয়েছে?

চাঁপাডাঙার বউ অবাক হইয়াও হাসিয়া কৌতুকভরে বলিল, পাঁচ সের? দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করলে কে খুড়ী?

দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করলে কে খুড়ী! ওজন করবে কে? বলি ওজন করবে কে? আমি কি মেছুনী নাকি?

চাঁপাডাঙার বউ এবার বিব্রত হইল, সে জানে ইহার জের অনেক দূর যাইবে। সে তাই বলিল, সে আবার কখন বললাম তোমাকে?

—বললে না? তো কি বললে? ও-কথার মানে কি হয়?

তা জানি না। ছোট বউ কতকগুলো মাছ ধরে এনেছে। মাঠে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে মাছ ঘরে আছে, তোমার ভাগ তুমি নিয়ে যাও।

—যাবই তো। ভাগের ভাগ হক্কের ধন। এ আমার ভাইকে ফাঁকি দিয়ে পুঁটলি-বাঁধা ধন নয়। নেবই তো ভাগ।

—কি বলছ খুড়ী যা-তা?

—ঠিক বলছি। দেওর-সোহাগী, দেওরকে সোহাগের মানে আমরা বুঝি না, না? কিন্তু ওতে নিজেই ফাঁকি পড়ে, বলি, ঠকিয়ে জমানো ধন ভোগ করবে কে? বলি হল একটা কোলে? ওই জন্যেই ছেলে নেনা যেমন সেতাব —তেমনি তুমি।

এবার চাঁপাডাঙার বউ গম্ভীরভাবে বলিল, থাম টিকুরীব খুড়ী।

টিকুরীর খুড়ী থামিয়া গেল। চমকাইয়া উঠিয়াই থামিল। চাঁপাডাঙার বউয়ের কণ্ঠস্বরে যেন কি ছিল; সে যেমন অলঙ্ঘনীয়—তেমনি ভর্ৎসনাপূর্ণ।

সেই কণ্ঠস্বরেই চাঁপাডাঙার বউ বলিয়া গেল, তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয়, তবে ভগবান আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত করেন। আর যদি মিথ্যা হয় তারও বিচার তিনি করবেন। কোন শাপান্ত আমি করব না।

ফিরিল সে, ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, মানু! মানু!

মানু বাড়ির ভিতর হইতেই সাড়া দিল, কি বলছ?

—এই টিকুরীর খুড়ীকে ওদের মাছের ভাগ দিয়ে দে। যাও খুড়ী, তোমার ভাগ তুমি নাও গে। মানুও সে মূর্তি সেথায় দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

কোন একটা কথাও মুখে ফুটিল না। মাছ সে বড় ভালবাসে। সেই মাছ ফেরত দিবার আদেশের বিরুদ্ধেও কোন কথা তাহার ফুটিল না।

কথা কটা বলিয়া চাঁপাডাঙার বউ আবার ফিরিল এবং আপন পথে গরবিনীর মতই চলিয়া গেল।

গ্রাম্যপথে তখন চাষীর ঘরের মেয়েরা স্বামী-পুত্রের বাপ-ভাইয়ের খাবার লইয়া মাঠে চলিয়াছে। কাঁকালে ঝুড়ির মধ্যে কাঁসার খোরায় মুড়ি গুড় ইত্যাদি। বৃষ্টিতে যাহাতে সেগুলি ভিজিয়া না যায়, তাহার জন্য তাহার উপর আর একটি ঝুড়ির আবরণ। এক হাতে জলের ঘটি। তাহারা আগে চলিতেছে। চাঁপাডাঙার বউয়ের আজ দেরি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও সে চলিবার গতি ত্বরিত করিতে পারিতেছে না। তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিতেছে, গা যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। টিকুরীর খুড়ী তাহার বুকে যেন শেল ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। সে আঘাতে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। সব বল যেন ফুরাইয়া গিয়াছে। সে গ্রামপ্রান্তরে একটা গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। আর চলিতে পারিবে না।

পিছন হইতে একটি মেয়ে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল! চাঁপাডাঙার বউ মাঠের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বেদনার্ত অন্তরের সঙ্গে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বোধকরি একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। মন এমন ক্ষেত্রে শূন্য বিস্তৃতির দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা পায়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল কাদম্বিনী। এই বিস্তীর্ণ জলভরা মাঠ ও মাসখানেকের মধ্যে সবুজ ফসলে ভরিয়া উঠিবে না!

মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—বড় মোল্যান।

চাঁপাডাঙার বউ মুখ ফিরাইল। ইহারই মধ্যে কখন তাহার চোখ হইতে জলের ধারা গড়াইয়া আসিয়াছে।

মেয়েটি সবিস্ময়ে বলিল, কাঁদছ তুমি বড় মোল্যান?

চাঁপাডাঙার বউয়ের খেয়াল হয় নাই যে, তাহার চোখ হইতে জল গড়াইতেছে। কথাটা শুনিয়া সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চোখ মুছিতে চেষ্টা করিল। দুই হাত আবদ্ধ, কাজেই মুখখানি নিজের কাঁধের কাপড়ে গুঁজিয়া চোখের জল মুছিয়া চাহিল।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, কি হল গো মোল্যান?

বিষণ্ন হাসিয়া চাঁপাডাঙার বউ বলিল, বড় মাথা ধরে'ছ মা। শরীরটা কেমন করছে আমার।

সে আবার মুখ ফিরাইল।

সামনেই বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র। বর্ষণের মধ্যে কর্ষণ চলিয়াছে। মাঠে মাঠে হালগোরু আর মানুষ। চাষীর পেশীবহুল দেহ সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, গোরুগুলি কাঁধ টান করিয়া লাঙল টানিয়া চলিতেছে। কতক লোক আলের উপর কোদাল কোপাইয়া চলিয়াছে। বীজক্ষেতের মধ্যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বীজচারা তুলিতেছে।

মধ্যে মধ্যে বীজের বোঝা মাথায় করিয়া চাষী চলিয়াছে রোয়ার ক্ষেত্রের দিকে। পরিপাটি কাদা-চাষ-করা-জমিতে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়া ধানচারা রোপণ করিতেছে। চারিদিকে ব্যাঙের কোলাহলে মুখর। কাদা-চাষ-করা জমির চারপাশে কাক নামিয়াছে—পোকামাকড়ের আশায়। দুই একটা কাদাখোঁচা এখানে ওখানে ঘুরিতেছে। কালো মেঘের গায়ে সাদা বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে মাঝে মাঝে। মেঘমেদুর দিনটির সঙ্গে ক্লান্ত বিষণ্ণ চাঁপাডাঙার বউ যেন একাত্মতা অনুভব করিতেছিল।

যে মেয়েটি চাঁপাডাঙার বউয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিল সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির সঙ্গে বলিল, দেহ ভাল নেই তো এই জলে ভিজে এলে ক্যানে মা? ছুটকীকে পাঠালেই হত।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, অমরকুড়ির পানে যাস যদি নয়ানের মা, তবে আমাদের ওদিকে ডেকে দিস্, বলিস্—এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আর যেতে পারছি না।

—দোব—দোব। ছোঁবার তো নয় মা, নইলে আমিই নিয়ে যেতাম।

—তার চেয়ে বড় মোড়লকে বলিস। মহাতাপ চাষ ছেড়ে আসতে রাগ করবে। বড়কে বলিস, সে এসে নিয়ে যাবে।

অমরকুড়ি অর্থাৎ অমরকুণ্ড। ধান সেখানে মরে না। সেখানেই তখন সেতাবদের চাষ চলিতেছিল।

চাষের সময় সেতাবও চাষে খাটে। কঠিন কাজগুলো তেমন সে পারে না, তবে অন্য সকল কাজই করে। কোদাল কোপায়, বীজচারা পোঁতে, কাদা-চাষ করা জমিতে কোন ঠাঁই উঁচু হইয়া থাকিলে, সেও পায় করিয়া ঠেলিয়া সমান করিয়া দেয়।

সেতাবদের চাষ বড়। দুইখানা হাল। হাল দুইখানার কাজ শেষ হইয়াছে; লাঙল খোলা অবস্থায় হাল কাঁধে লইয়া গোরু চারিটা ঘুরিয়া ঘাস খাইতেছে। কয়েকজন সাঁওতাল মেয়ে ধান পুঁতিতেছে। মহাতাপ কোদাল

কোপাইতেছে! সেতাব হুঁকা হাতে জমির এধার হইতে ওধার পর্যন্ত ঘুরিয়া উঁচু জায়গাগুলি পায়ে বসাইয়া দিতেছে।

নয়ানের মা জমির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চাঁপাডাঙার বউয়ের দেহ খারাপ, আসিতে পারিবে না শুনিয়া সেতাব উদ্বিগ্ন চিত্তেই আলপথে হাঁটিতেছিল। গাছতলায় উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, চাঁপাডাঙার বউ চুপ করিয়া যেন মাটির পুতুলের মত বসিয়া আছে।

সেতাব বলিল, নয়ানের মা বললে—দেহ খারাপ তোমার?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলের বাঁধ ভাঙিয়া গেল।

—ওই—ওই, একে বলে, তা হলে জলে ভিজে এলে ক্যানে? ম্যালেরিয়ার সময়—দেখি, কপাল দেখি! সে কপালে হাত দিতে গেল।

চাঁপাডাঙার বউ কপাল সরাইয়া লইয়া বলিল, না।

—এই দেখ না ক্যানে? দেখি।

—না কিছু হয় নি আমার।

—একে বলে, এ তো ভ্যালা বিপদ রে বাবা!

লোকের কথা আমি আর সইতে পারছি না।

—এই দেখ। কে আবার কি কথা বললে তোমাকে? কে? কার ঘাড়ে তিনটে মাথা? বল, আমি দেখছি তাকে। মহাতাপকে বললে—

—না, সে শুনবে বলে তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে এখানে এনেছি আমি। লোকে বলছে মহাতাপকে ঠকিয়ে তুমি পুঁজি করছ। কেন তুমি মহাতাপকে সব কথা বল না?

—তোমাকেই বলি না কি আমি?

—তাতে ক্ষেতি হয় না। কিন্তু—

—সে আমি বুঝব; সে আমার মায়ের পেটের ভাই তাকে বলি—আর সে পাড়াসুদ্ধ গেরামসুদ্ধ বলে বেরাক। কিন্তু কে কি বললে—আমার দিব্যি দিয়ে বলছি বলতে হবে তোমাকে।

—দিব্যি দিলে?

—দিলাম।

—বললে টিকুরীর খুড়ী।

টিকুরীর খুড়ী তখন সেতাবদের বাড়ির দাওয়াতে বসিয়া মানদার সঙ্গে মাছ ভাগ লইয়া বেশ একটা ঝগড়া পাকাইয়া তুলিয়াছিল। উঠানে মাছ ভাগ

করা পড়িয়া আছে। এদিকে অনেকগুলি—সেটা সেতাবদের ভাগ, আর এক জায়গায় বিপিনের অর্থাৎ মোটা মোড়লের ভাগ, সেটা সেতাবের ভাগ হইতে কিছু কম হইলেও নেহাত কম নয়, আর কয়েকটি ভাগে—কোনটিতে দুইটি কোনটি এমনি। গোবিন্দ মাছ ভাগ করিতেছে।

মানিকের হাতে একটি মাছ। সে মাছটি লইয়া টিপিতেছে।

টিকুরীর খুড়ীর ভাগ ওই তিনটি মাছওয়ালা ভাগের একটা ভাগ। মাছ তিনটি তুলিতে তুলিতে বলিল, ভাগী ভাড়িয়ে খেতে নাই বাছা, তাতে মঙ্গল হয় না। বুঝেছ? খেয়ো না তা। তোমার একটা ছেলে। ভাসুরের কাছে জায়ের কাছে ও বিদ্যা শিখো না। ফল দেখেছ তো? তোমাদের স্বামীস্ত্রীকে ঠকিয়ে গোপনে পুঁজি অনেক করেছে ওরা। কিন্তু হয়েছে? বলি একটা সন্তান হয়েছে চাঁপাডাঙার বউয়ের? মাছশুদ্ধ হাত দুটা সে মানদার মুখের কাছে নাড়িয়া দিল।

মানদা কি বলিবে খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, মিছে কথা বলছ কেনে?

—মিছে কথা! মিছে কথা! গাঁয়ের লোককে শুধাও গা। দেওর-সোহাগী আমার! মরণ তোর দেবীপুরের বউ। কিছু বুঝিস নে তুই। শোনগে, ঘোঁতন ন্যাকাপড়া-জানা ছেলে—ভদ্দর-নোক—সে কি বলে শোনগে। বলে দেওর-ভাজ আমরা আর দেখি নাই কখনও। নতুন দেখছি। মর্ তুই মর্ ছুড়ি! তুই মর্।

সে চলিয়া যাইতেছিল।

গোবিন্দ এবার বলিল, অই, অই, তুমি রাখাল পালের কাছে যে মাছ কটা নিলে, সে কটা ভাগ কর এইবার। ওগো ও মোল্যান—অই! মানিকের মা, বল না গো। অ ছোট মোল্যান! ওই ওর কোঁচরে ভরা রয়েছে গো।

মানদা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল—কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তবু সে বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে টিকুরীর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

টিকুরীর খুড়ী কিন্তু মাছগুলি লইয়া শিবকেষ্টর বাড়ি গেল না। এই জলের মধ্যেই সে গিয়া উঠিল ঘোঁতনের বাড়িতে। ঘোঁতন তাহার মামলা করিয়া দিবে বলিয়াছে। সেই জমি ভাগের মামলা।

সেদিন সাবরেজেষ্ট্রি আপিস বন্ধ। তাহার উপর বর্ষার দিন। ঘোঁতন দাওয়ার উপর বসিয়া বাঁয়া-তবলা লইয়া পিটিতেছিল। গান তাহার বড় আসে না। তবলাতেই তাহার সঙ্গীত-প্রিয়তার আবেগ নিঃশেষিত হয়। ধা তিন—ধা—ধাতিন ধা। তে রে কেটে—মুখে বোল বলে আর তবলা বাজায়। তবে

বক্তৃতায় সে মজবুত! শকুনি, কলি, তক্ষক প্রভৃতি কয়টা পার্টে তাহার খুব নাম।

খুড়ী ঘেঁাতনের দাওয়ায় মাছগুলি ঢালিয়া দিয়া বলিল, লে বাবা ঘেঁাতন, ভেজে খাস। খুড়ী চাপিয়া বসিল।

ঘেঁাতন খুশী হইয়া বাজনা বন্ধ করিয়া বলিল, এ-যে লহনা পোনা খুড়ী।

—হেঁ বাবা। পেলাম, তা বলি ঘেঁাতনকে দিয়ে আসি। তা আমার মামলার কি করলি বাবা?

—করেছি খুড়ী। ঠুকে দিয়েছি দরখাস্ত। লিখে দিয়েছি সেতাব মোড়ল বিপিন মোড়ল গং প্রভৃতি পঞ্চায়েতবর্গ ঘুস খাইয়া বিধবাদের সম্পত্তি ঠকাইয়া শিবকেষ্ট রামকেষ্ট গংকে দিয়াছে। একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে! ইংরিজীতে দরখাস্ত লিখে দিয়েছি।

বলিতে বলিতেই হেঁট হইয়া একটা মাছ তুলিয়া লইয়া বলিল, মাছ উঠেছে বুঝি পুকুর থেকে? বেড়ে টাকটা মাছ। ভাজি যা হবে! পুটি, পুটি, অ পুটি!

খুড়ী বলিল, সাজার পুকুরের মাছ, বুয়েচ বাবা, মাঠে একেবারে ছয়লাপ। মহাতাপের বউ সের দরুন ধরে ঘরে ঢুকিয়েছে। তা যদি বলতে গেলাম বাবা, তো চাঁপাডাঙার বউয়ের ঠেকার কি? আমিও টিকুরীর বেটী, আমি খুব শুনিয়ে দিয়েছি। মুখে মুখে বলে দিয়েছি—বলি দেওর-সোহাগী আমার, ঘরের ভাগী ভাগিয়ে খেয়ে তোমার তো একটা হল না। আবার শেষে পাড়ার সরিকদের ফাঁকি? ওদের ছোট বউকে বলে এসেছি। গলায় দড়ি তোর। দেওর ভাজ আর পৃথিবীতে নাই? তা কাকে বলছ? ছুঁড়ী ভাবলী।

ঘেঁাতন বলিল, তুমিও ভাবলী খুড়ী, তুমিও ভাবলী।

—আমি ভাবলী?

ঠিক এই সময়েই পুটি—ঘেঁাতনের অবিবাহিত যুবতী বোন—ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।—কি, বলছ কি?

—এই মাছ কটা নিয়ে যা। বেশ করে ভাজি করবি। কিংবা ঝাল।

টিকুরীর খুড়ী বলিল, অ মা গো? পুটি? তোমার বুন। এ যে হাতি হয়ে উঠেছে?

খুড়ীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া পুটি বলিল, আমি পারব না। হাঁড়ি চড়ে না, তার মাছভাজা? এ ঘরে তোমার মা ধুকছে জ্বরে, ওঘরে বউ ধুকছে তুমি বসে বসে তবলা পিটছ। আমি এত পারব না। তোমরা সবাই আমার হাতির গতরই দেখেছ।

পুটি !—কড়াস্বরে ঘোঁতন শাসন করিয়া উঠিল।

পুটি যাইতে যাইতে ফিরিয়া মাছ কয়টা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, ভাজতে পারব না, পুড়িয়ে দিচ্ছি, খেয়ো। ঘরে তেল নাই। আর ডাক্তার-কবরেজ যা হয় ডাক—মায়ের জ্বর খুব।

—ম্যালেরিয়া জ্বর, ওর আবার ডাক্তার কবরেজ কি হবে? হু হু করে উঠেছে. আবার খানিক পরে ছেড়ে যাবে। ইউনিয়ান বোর্ড থেকে মেপাক্রিন এনে দোব, খেলেই সেরে যাবে।

—ভাল, উদিকে ভাগীদার নেপাল কাহারের বউ এসে বসে আছে।

—ধান-টান দিতে আমি পারব না। সে বলে দেগা। ধান নাই তো দেব কোথা থেকে ?

—ধান পরের কথা, এখন বেচন নাই। জমি চাষ হবে না। বেচন দেখে দাও গো।

—বেচন ? বেচনই বা পাব কোথা আমি ?

তবে থাকবে তোমার জমি পড়ে।—বলিয়া পুটি ঘরে চলিয়া গেল।

থাকুক গে! আমার কচুটা।—বলিয়া ঘোঁতন বুড়ো আঙুল দেখাইয়া দিল। তারপর খুড়ীকে বললে, খাই যেন একা আমি, বুঝলে খুড়ী? হুঁ। বলিয়া তবলায় অকারণে চাঁটি মারিয়া দিল।

—আমি চললাম বাবা। একটা তাগিদ দিস, বুঝলি ?

বলিয়া খুড়ী উঠিয়া পড়িল।

আরও দিন পনের পর সেদিন বিকেলবেলা বেচারী পুটি আসিয়া উপস্থিত হইল বিপিন মোড়লের-বাড়ী।

মোটা মোড়ল পায়ে সরিষার তেল মাখিতেছিল। তামাক সাজিতেছিল একজন কৃষাণ। পুটি আসিয়া দাঁড়াইল এক পাশে। বলিল, আমি একবার আপনার কাছে এলাম জ্যাঠা!

—কে? কে বল দেখি তুমি বাছা? চেনা-চেনা করছি, চিনতে ঠিক লারছি—

আমি নবগেরেমের গোপাল ঘোষের কন্যে—

গোপালের কন্যে? তুমি ঘোঁতনের ভগ্নি?

—হ্যাঁ।

—দেখ দেখি কাণ্ড! বড় হয়ে গিয়েছ। চিনতে লারছি।

—মা পাঠালে আপনার কাছে।

—বল, কি জন্যে পাঠালে ?

—বললে পাঁচজন থাকতে বীচনের অভাবে আমাদের জমি চাষ হবে না ?

—তোমাদের বীচন নাই ? কি হল ? তা তুমি এলে কেন ? ঘোঁতন কই ? ছি-ছি-ছি !

—তাকে তো জানেন। সে উ সব দেখবে না। আর তার সময়ও নাই। রেজেস্টারী আপিস ইউনিয়ন বোর্ড আপিসে সারাদিন কাজ তো ! পুটি ক্ষীণযুক্তিতে ভাইকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল।

হুঁ, তা কতটা জমির বীচন চাই ?

—দশ বিঘে জমি ; তার বিঘে ছয়েক পুঁতেছে, চার বিঘে পড়ে আছে —বীচন নাই।

—তাই তো বাছা। আমার খানিক বীচন আছে, বাঁচবে, কিন্তু বেনো জমির জন্যে রাখতে হবে। তা—

—আমাদের কি হবে।

ঘোঁতন হলে বলতাম, উপোস করে মরবে। তা সে কথা তো তোমাকে বলতে পারছি না। দেখি সেতাবের বীচন বাঁচবে, সেতাবের হিসেব মহাতাপের গতর— । তা সেতাব আবার ঘাড় পাতলে হয় ? তুমি বাছা ওদের বড় বউকে গিয়ে ধর গা। নাঃ চল, আমিই যাই।

মোটা মোড়ল পথে নামিল। আপন মনেই বলিতে লাগিল, বুয়েছ মা, এই সেতাবের কত্তা বাবার নাম ছিল দয়াল মোড়ল, লোকে বলত দলু মোড়ল ; আমার বাবার নাম ছিল পরেশ। দুজনা ছিল চাকলার মাথা। নবগেরামে তখন নতুন ফেশান ঢুকেছে। দেখেশুনে দুজনে পরামর্শ করত আর বলত— দলো মলেই হল, আর পরশা মলেই ফরসা। তাও আমরা কিছু কিছু বজায় রাখলাম, এর পর সব খাঁ-খাঁ। উচ্ছন্ন দিলে। ইংরেজী ইস্কুল ঢুকে-বাবু হয়ে ফেল মেরে ঘর ঢুকছে ; জমি বেচে-বেচে খাচ্ছে বসে।

সারা পথটাই বকিতে বকিতে সেতাবদের দরজায় হাজির হইল। দরজা হইতে ডাকিল—সেতাব ? সেতাব রয়েছ ? অ সেতাব ?

বাড়ির বাহির-দরজায় বাহির হইয়া আসিল মহাতাপ, তাহার হাতে হুঁকা। ফরাত ফরাত শব্দে হুঁকাটা টানিতে টানিতে বাহির হইয়া আসিয়া মাতব্বর খুড়ো মোটা মোড়লকে দেখিয়াই অপ্রস্তুত হইয়া গেল। চট করিয়া হুঁকা-সুদ্ধ হাতটা পিছনের দিকে করিল।

বিপিন বলিল, সেতাব কই ?

মহাতাপের পেট ভর্তি তামাকের ধোঁয়া, সে দম বন্ধ করিয়া বলিল, তামাক

খান। বলিয়া হুঁকাটা বিপিনের হাতে দিয়া পিছন-ফিরিয়া হুস করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল। এবং এতক্ষণে স্বচ্ছন্দ হইয়া বলিল, বসুন, উঠে বসুন।

দাওয়ার উপর উঠিয়া মোড়াটা আগাইয়া দিল। পুটি অদূরে পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল।

বিপিন মোড়ল দাওয়ায় উঠিয়া মোড়ায় বসিয়া ডাকিল, এইখানে এস বাছা।.. অ পুটি!

মহাতাপ সবিস্ময়ে বলিল—পুটি! এই লাও, ঘোঁতনা তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

পুটি ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল।

মহাতাপ বিপিনকে বলিল, তোমরা হুকুম দাও জেঠা, ঘোঁতনকে আমি কিলিয়ে সোজা করে দিই। বড়া বজ্জাত। নচ্ছারটা বড় বজ্জাত। এ মেয়েটা ভাল। যা গালাগাল দেয় আর মারে ওকে—। আমি চোণ্ডপরবের সঙের সময় দেখে এসেছি।

বিপিন বলিল, তুই থাম্ মহাতাপ! ও তার জন্যে আসে নি।

মহাতাপ আগাইয়া গিয়া বলিল, তার জন্যে আসে নি! কই বলুক পুটি, বলুক কালীমায়ের দিব্যি করে—ঠাস ঠাস করে চঁড়িয়ে দেয় কি না? বলুক।

পুটি দায়ে পড়িয়াছে। সে না পারে স্বীকার করিতে, না পারে প্রতিবাদ করিতে! স্বীকার কবায় লজ্জা আছে, প্রতিবাদে কুণ্ঠা আছে, আশঙ্কা আছে; মহাতাপ তো নিজেই কালীর দিব্যি গালিয়া চাক্ষুষ দেখার কথা চিৎকার করিয়া বলিবে এবং হয়তো শেষ পর্যন্ত 'বীচন দিব না' বলিয়া বসিবে।

বিপিন মোড়ল প্রবীণ লোক। সে পুটিকে নতমুখ দেখিয়া বলিল, না রে বাপু, না। আজ ও-অন্য কাজে এসেছে। ওদের জমির বীচন নাই। বীচন খোঁজ করতে এসেছে।

হঁরিবোল! হরিবোল। মহাতাপ হাসিতে লাগিল।

—হাসছিস ক্যানে?

—বীচন হয় নাই তো! সে আমি জানতাম—প্রচুর কৌতুকে সে হাসিতে লাগিল।—তুষ ফেললে বীজ হয় খুড়ো? আমি জানতাম। ঘোঁতনের ভাগীদার নেপাল যেদিন বীচন ফেলে, সেইদিনই আমি বলেছিলাম। আমি বললাম, ই কি রে? এ যে সব তুষ! এতে বীজ হবে ক্যানে? নেপাল বললে—আমি কি করব? ঘোঁতন ঘোষ বললে—যা হয় ওতেই হবে। আমি বললাম—দে তবে গোঁজ গোঁজায় নমো করে। মহাতাপ খুব হাসিতে লাগিল।

বিপিন বলিল, কিছু বীচন দিতে হবে। তোর তো নিশ্চয় আছে।

হ্যাঁ।—অহঙ্কার করিয়া মহাতাপ বলিল, জরুর আছে, আলবৎ আছে। কিন্তু ঘোঁতনকে নেহি দেঙ্গা—

—দোব না বললে কি হয়? দিতে হবে। ডাক্, সেতাবকে ডাক্।

সেতাব!—রাগিয়া উঠিল মহাতাপ।—সেতাব কি করবে? সেতাব? মাঠে যতদিন বীচন থাকবে ততদিন সেতাবের এক গাছ নেহি হ্যায় বাবা। সব মহাতপের বিলকুল। হ্যাঁ ধান কাটেগা, ঘরে আনেগা, ঝাড়াই করেগা, গোলায় তুলেগা, তারপর উ যা করেগা তা করেগা। মাঠকে মালিক হাম হ্যায়—হাম। একবার ঘোঁতনার মায়ের কথায় ধান ছেড়ে দিয়েছি, সবাই বকেছে আমাকে। মহাদেবের পাট নিয়ে দশ টাকা চাঁদা দিয়েছি। উঁহু, আর নেহি দেগা।

এবার পুটি বলিল, আমার মাই আমাকে পাঠিয়েছে মহাতাপদাদা। জমি পোতা না হলে আমরা খাব কি বল?

—খাব কি? শুধু তোরা খাবি? ঘোঁতন খাবে না? আগে ভাত বেড়ে তো তাকে দিবি।

হঠাৎ বিপিন মোড়ল পুটিকে বলিল, চল, বাড়ির ভিতর চল। ডাক, চাঁপাদাদার বউমাকে ডাক। বউমা তো তোমাদের আপনার গো। বউমার মা তোমার মা তো সই।

মহাতাপ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু বড়বউয়ের শরীর খারাপ। সে শুয়ে আছে। উঁহু।

সত্যই বড় বউ ঘরের মধ্যে শুইয়া ছিল। শরীর খারাপ বলিয়া শুইয়া আছে। আসলে টিকুরীর খুড়ীর সেই মর্মান্তিক কথা কয়টা বিষাক্ত তীরের মত তার মর্মস্থল বিঁধিয়া অবধি তাহাকে বিষণ্ণ ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কথা কয়টার বিষে তাহার অন্তর এমনই জর্জর হইয়া গিয়াছে, সংসারের জীবনে যেন রুচি পর্যন্ত বিস্বাদ ঠেকিতেছে। অপর সকলের কাছে কথা গোপন করিবার অভিপ্রায়েই সে শরীর খারাপের অজুহাতে আপন ঘরে শুইয়া আছে। সে চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। মাথার দিকে জানালার ধারে বসিয়া সেতাব তামাক খাইতেছিল আর মৃদুস্বরে বকিতেছিল।

—একে বলে এ তো ভারি বিপদ করলে তুমি! এ তো বড় ফ্যাসাদ! টিকুরীর খুড়ী কি বললে, আর তুমি গিয়ে শয্যা পাতলে! ওঠ—ওঠ।

—না। আমাকে জ্বালিয়ো না। আপনার কাজ দেখগে যাও।

—ওই! তুমি না খেয়ে পড়ে থাকবে, আর আমি কাজ দেখব? ওঠ ওঠ। কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে। টিকুরীর খুড়ী বললে, ভাগী ভাঁড়িয়ে

খুঁজি করি বলে তোমার ছেলে হয় নাই। টিকুরীর খুড়ী একেবারে সাক্ষাৎ বেদব্যাস। তা হয় নাই তো হয় নাই। ছেলে নাই তো নাই—

—কি বললে? বড় বউ উঠিয়া বসিল। সেতাব ভয় পাইয়া থামিয়া গেল। চাঁপাডাঙার বউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি বললাম?

·ছেলে নাই তো নাই। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের কথা আলাদা। কিন্তু—

বড় বড় বিচিত্র হাসি হাসিল।

সেতাব সে হাসি দেখিয়া জ্বলিয়া গেল। বড় বউয়ের হাসিতে যে আগুন ছিল, সেই আগুন তাহার অন্তরের সঞ্চিত সন্তানকামনার গোপন ক্ষোভের শুষ্ক দাহ্য বস্তুতে ধরিয়া গেল। কথাটা দুই জনেই পরস্পরের কাছে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। সেতাব চাঁপাডাঙার বউয়ের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিল—বড় বউয়ের মত বিচিত্র দৃষ্টিতে। তারপর হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া বলিল, আলাদা? পুরুষের কথা আলাদা? না? হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, এক সময় মনে হয়—। সে থামিয়া গেল এবং চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বড় বউ উঠিয়া দাঁড়াইল। সেতাবের গায়ের কাপড়ের খুঁট চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কি মনে হয়? বলে যাও।

সেতাব বলিল, মনে হয় ঘর-দোর-ধান-ধনে আগুন দিয়ে চলে যাই।

বড় বউয়ের হাতখানা খসিয়া পড়িল।

আমার মনে হয় না—ছেলের কথা? আমার সাধ নাই। মনে হয় না এ সব আমি ক্যানে করছি? কার জন্যে করছি? কে ভোগ করবে? আমার জলগণ্ডুষের সাধ নাই!. পেরেত হয়ে জলের জন্য হা-হা করে বেড়াতে হবে না আমাকে? তবু কি করব?—

সেতাব চলিয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ একটা অস্ফুট কাতর শব্দ করিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল! মনে হইল আকাশ ভাঙিয়া পড়িতেছে, মাটি ফাটিতেছে। ফাটুক। তাই ফাটুক! সে তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া থাক।

ঠিক এই মুহূর্তে নীচে হইতে বিপিনের ডাক শোনা গেল—বড় বউমা! চমকিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। তবু মাথার ঘোমটা তুলিয়া দিল।—কে?

পাশের ঘরের জানালাটা খুলিয়া মানদা মুখ বাড়াইয়া বলিল, পঞ্চায়েতের শিব মোড়ল—মোটা মোড়ল এসেছে দিদি!

চাঁপাডাঙার বউ কোন রকমে উঠিয়া সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

বিপিন নীচেই দাওয়ার উপর চাপিয়া বসিয়া ছিল। তামাক খাইতেছিল। পুটি একটি খুটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল একপাশে। সেতাব হনহন করিয়া নামিয়া আসিল এবং পুটিকে দেখিয়া খানিকটা অবাক হইয়া গেল। সে পুটিকে ঠিক চেনে নাই। এমন কালো অথচ শ্রীমতী এত বড় একটি মেয়ে সিঁথিতে সিঁদুর নাই, বিধবা বা কুমারী ঠিক ঠাওর করা যায় না; এ কে? কিন্তু চমৎকার মেয়ে! তাহাকে দেখিয়া বিস্ময় স্বাভাবিক ভাবেই জাগিয়া উঠিবার কথা।

মহাতাপ উঠানে বসিয়া একটি কাঠ দিয়া দাগ কাটিতেছিল এবং বলিতেছিল, সে হোগা নেহি, কভি নেই!

সেতাব বলিল, কি গো খুড়ো?

বিপিন বলিল, এই যে তুমি বাড়িতে আছ। তুমি নাই ভেবে অগত্যে বড়বউমাকে ডাকছিলাম।

সেতাব হুঁকোটা লইয়া টানিল না। সে পুটিকেই দেখিতেছিল। হাতের কাঁচের চুড়ি, লোহা দেখিয়া এতক্ষণে বুঝিল মেয়েটি কুমারী। কিন্তু এত বড় কুমারী মেয়ে? কার বাড়ির? বলিল, এ মেয়েটি?

মহাতাপ উত্তর দিল—ঘোঁতনার বোন।

ঘোঁতনের ভগ্নি?

বিপিন বলিল, হাঁা, গোপালের কন্যে। বেচারী এসেছে, ওদের বীচন নাই। জমি পড়ে আছে। চার পাঁচ বিঘের মতন বীচন নাই। ঘোঁতন বলে দিয়েছে, সে কিছু জানে না। কি করে বল? ওকেই আসতে হয়েছে। এত বড় কুমারী মেয়ে, এক গাঁ থেকে আর এক গাঁ—। তা পাগল বলছে—নেহি দেগা। তোমরা সব ওকে বকেছ ঘোঁতনকে ধান ছেড়ে দেওয়ার জন্য, তাই ও আর বীচন দেবে না। তাই।

সেতাব বলিল, গোপাল ঘোষ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে খুড়ো, সে তুমি জান। কিন্তু আমি মনে রাখিনি। ঘোঁতনকে গতবার ধান দিয়েছিলাম। সে বৃত্তান্তও সব জান। আবার বীচনও দোব। পাবে বীচন। পুটি এসেছে যখন বুঝছি—ওর মা পাঠিয়েছে। গোপাল ঘোষ যা করুক—ঘোঁতন যা করুক ঘোঁতনের মা—বড় বউয়ের সইমা! আমার পূজ্য লোক। দিতে হবে বৈকি, দোব বীচন। বড় বউ বলবে কি? বীচন দোব। পাবে, বীচন পাবে।

মহাতাপ অবাক হইয়া গেল। সেতাবের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বীচন দেবে?

হ্যাঁ, জমি তো পুঁততে হবে ?

মহাতাপ তাহাকে বলিল, তুমি আর নেহি বাঁচেগা। মর যায়েগা। জরুর মর জায়েগা।

সেতাব বলিল, কি বকছে দেখ। সিদ্ধি খেয়েছিস ?

—কি বকছি ? আ-হা-হা ? তুম এক বাতমে বীজ খয়রাত কর দিয়া ? তুম চামদড়ি, তুম কিপটে ; তুম দাতাকর্ণ বন গিয়া, তুম নেহি বাঁচেগা। কিন্তু আমি বীচন দোব না। কভি না! শূয়ার ঘোঁতনা যদি পিঠে একটা কিল খায় আমার তবে দোব। নেহি তো কভি না।

সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

পুটি হাসিয়া ফেলিল!

বড় বউ এবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, বীচন পাবে কাকা। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।

তারপর পুটিকে বলিল, ওরে, তুই কত বড় হয়েছিস পুটি ? এতদিনে বীচনের জন্যে দিদি বলে মনে পড়ল ? সইমা কেমন আছে ?

তাহাকে লইয়া সে বাড়ির ভিতর ঢুকিল।

—মায়ের খুব জ্বর দিদি। মা তোমার কথা প্রায়ই বলে।

—কি বলে রে ?

—কত কথা বলে। বেশী বলে—কাদু আমার ভাগ্যবতী, গুণবতী, রূপবতী—মায়ের কাছে সবই ভাল তুমি।

কাদম্বিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিল, সইমা আমাকে বড় ভালোবাসে।

—সেদিন রূপের কথায় বলছিল—সে দেখতে হয় কাদুকে! যেমন মুখ চোখ, তেমনি গড়ন-পেটন—আহা-হা, এখনও যেন কনে বউটি ?

—মরণ আমার রূপের। মরণ আমার কনে বউয়ের ছিরির ? কে যেন কাদুর অন্তরে অন্তরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

পুটি তাহা বুঝিল না, সে উৎসাহভরে বলিল, শোন—এই শেষ না কি ? আমার এক পিসী বললে—তা বাঁজা মেয়ের বাঁধন ভাল থাকে। মা বললে—কি হল দিদি ? দিদি ?

কাদম্বিনী পাশের দেওয়ালটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। মুখখানা তাহার কেমন হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

সে এক হাতে গলার কবচটা চাপিয়া ধরিয়াছিল, আপনার অজ্ঞাতসারেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভাদ্র মাস পড়িয়া গিয়াছে।

সেদিন ষষ্ঠীর দিন। চাষীর গ্রামটির পাড়ায় পাড়ায় এক এক ঘরে উলুধ্বনি পড়িয়াছে। মেয়েরা ষষ্ঠীব ব্রতকথা শুনিয়া উলু দিতেছে। রোদে শরতের আমেজ ধরিয়াছে। ভাল চাষীদের চাষ প্রায় শেষ। মহাতাপ তো রোয়াঁর কাজ শেষ করিয়া নিড়ানের কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

সেতাবের বাড়ির ভেতরেও মেয়েরা বসিয়া ষষ্ঠীর ব্রতকথা শুনিতেছে।

সেতাব গোয়াল-বাড়িতে দাঁড়াইয়া ছিল। রাখালটা দুধ দুহিতেছে। গোয়াল বাড়ির উঠানে ধানের বীচনের একটি বোঝা পড়িয়া আছে। বীচনের বোঝাটি ঘোঁতনের জমির জন্য তুলিয়া আনা হইয়াছে।

বাড়ি আসিয়া ঢুকিল পুটি।

সেতাব তাহাকে দেখিয়া বেশ প্রসন্ন হইয়াই বলিল, এই দেখ। বীচন তোলা আজ তিন দিন পড়ে আছে!

পুটি লজ্জিত হইয়া বলিল, কি করব। জমির পাট হয় নাই। লোকজন নাই। নেপালের এক হাতের কাজ। তার ওপরে ভাগীদের কাজ।

সেতাব অগ্রসর হইয়া আসিল। বলিল. আজ আবার ষষ্ঠী। আজও ভাবলাম—। সে হাসিল!

পুটি বীচনের বোঝাটা নাড়িতে চেষ্টা করিল।

সেতাব বলিল. ওই—ওই? একে বলে. ওই বোঝা তুমি তুলতে পার? বীচন নেবে কে? নেপাল কই?

—নেপাল জমিতে মই দিচ্ছে। ষষ্ঠীর দিন নেপালের বউ আসে নাই।

—তবে?

—আমিই নিয়ে যাব।

—এই দেখ। বলি তাই হয় না কি?

পুটি এবার ডাকিল, দাদা, অ-দাদা!

বাহির হইতে ঘোঁতন সাড়া দিল, কি? আয় না বোঝাটা মাথায় তুলে নিয়ে।

সেতাব বলিল—ঘোঁতন এয়েছে! কই? অ-ঘোঁতন! ঘোঁতন!

ঘোঁতন এবার ঘরে ঢুকিল। তাহার পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা হাফসার্ট—অবশ্য দুইটাই পুরানো। সে ঘরে ঢুকিতেই সেতাব বলিল, বাইরে দাঁড়িয়ে ক্যানে রে? দেখ দেখি। তা তোর লোক কই? এ বোঝা নেবে কে?

ঘোঁতন একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল—শুধাও তাই পুটিকে। বললাম, আজ ষষ্ঠী, কাল নেপালের বউ আসবে, কাল সেই নিয়ে যাবে। তা বলে— তুমি তুলে দিয়ো আমি নিয়ে যাব। আমি বললাম—তাই যাবি তো চল। আমার কি !

পুটি বলিল, তাই দাও না তুলে। ধর।

সেতাব ব্যস্ত হইয়া বলিল,—এই—। ওরে নোটন ! নোটন ! যা তো, যা তো, বীচনের বোঝাটা মাঠে দিয়ে আয় তো ! যা তো !

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ভিতরে উলু পড়িল।

বাড়ির ভিতরে উঠানে ৫।৬টি মেয়ে সুপারি হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিয়াছে। সকলেই স্নান সারিয়া এলোচুলে গোল করিয়া বসিয়াছে।

উলু দিয়া প্রণাম করিয়া সকলে উঠিল।

যে প্রবীণা ব্রতকথা বলিতেছিল, সে বলিল, এ ব্রত করলে কি হয় ?

নিজেই উত্তর দিল—নিঃসন্তানের সন্তান হয়। সন্তান মরলে, সেই সন্তান জিউ পায়। রণে গোনে অরুন্যে মা ষষ্ঠী বুক দিয়ে রক্ষা করেন।

চাঁপাডাঙার বউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দরজার চৌকাঠে একটি ফোঁটা দিল। ষষ্ঠীর প্রসাদী হলুদতেলের ফোঁটা।

একটি মেয়ে বলিল, দরজার মাথায় কাকে ফোঁটা দিচ্ছ চাঁপাডাঙার বউ ?

বিষণ্ণ হাসিয়া বড় বউ বলিল, দেওংকে ভাই। সে তো মাঠে। শাউড়ী বলে গিয়েছে—বউমা, ওকে ফোঁটা তুমি চিরকাল দিয়ো।

মেয়েরা বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

এবার চাঁপাডাঙার বউ ডাকিল, মানিক ? মানিক কই ?

মানু কাছে আসিয়া বলিল, তাকে পুরে রেখেছি ঘরে ! কোথায় বেরিয়ে পালাবে। বলিয়াই সে চাঁপাডাঙার বউয়ের হাতের হলুদতেলের বাটী হইতে খানিকটা হাতের তেলোয় তুলিয়া লইয়া বন্ধ ঘরের দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল।

বড় বউ চকিত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। একটা সন্দেহ তাহার মনে সাড়া দিয়াছে। পাছে সে আসে মানিককে ফোঁটা দেয়, এই ভয়েই কি মানু এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে ?

মানু মানিককে কোলে লইয়া বাহির হইয়া আসিল এবং বড় বউয়ের সামনে দাঁড়াইল।

বড় বউ মানিকের মুখের দিকে চাহিয়া বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল, এই যে ফোঁটা দিয়েছিস তুই ? বলিয়া সেও ফোঁটা দিল মানিকের কপালে।

মানু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি হাসলে ক্যানে বড়দি ?

আমি পাছে আগে ফোঁটা দিই, তাই তুই আগে ফোঁটা দেবার জন্যেই ওকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলি। তাই হাসলাম। তা, আমাকে আগে বললেই পারতিস !

মানু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, তোমাতে আর ভাসুরে সেদিন ঘরে কথা বলছিলে, সে সব কথা আমি শুনেছি বড়দি। মানিক নিয়েও তো তোমাদের বুক ভরে না।

মানু মানিককে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। দেহখানা তার অবশ হইয়া গিয়াছে। সে তাহার গলায় সুতার ডুরিতে বাঁধা কয়েকটা মাদুলি টানিয়া বাহির করিয়া নাড়িতে-চাড়িতে লাগিল।

দিন কয়েক পর সেতাব বাড়িতে আসিয়া ঢুকিল। হনহন করিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। মিনিটখানেক পরেই ডাকিল, শোন তো একবার! বলি শুনছ ?

বড় বউ আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

সেতাব তাহার কোঁচড়ে কিছু গুঁজিতেছিল। দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না যে বস্তুটা টাকা। বড় বউ আসিয়া দাঁড়াইতেই সেতাব বলিল, দেখ ঘোঁতন ঘোষ এয়েছে। বুয়েচ ? একে বলে—বলছে, নবগ্রামের রাখহরি দত্তর ছেলে চার-পাঁচ ভরির সোনার হার বাঁধা রেখে টাকা নেবে। বলেছে তিনশো, তা আমি বলছি, দুশো ! মেরে কেটে আড়াই শো। স্বদ টাকায় মাসে ছ পয়সা। দোব ? বলব তাকে আসতে ?

বড় বউ বলিল, মহাতাপকে শুধাও।

—তুমি ক্ষেপেছ না কি ?

—না। তাকে না শুনিয়ে কোন কাজ তুমি করতে পা. না।

স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সেতাব বলিল, এ তো ভ্যালা আবদার রে বাবা। মহাতাপ, মহাতাপ, মহাতাপ করে আমাকে জ্বালিয়ে খেলে তুমি। বলি মহাতাপ তো আমার মায়ের পেটের ভাই। না কি ? তুমি এত হাঁপাও ক্যানে ?

বলিয়াই সে বাহিরে চলিয়া গেল।

সে যখন দাওয়ায় বাহির হইল, তখন মানদা এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া যাইতেছিল।

বাহিরে ঘোঁতন দাওয়ার উপর মোড়ায় বসিয়া পা নাচাইতেছিল এবং

ছোট একটা আয়না-চিরুনি লইয়া চুল আঁচড়াইতে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে শিস দিতেছিল।

কাছে দাঁড়াইয়া ছিল গোবিন্দ—সেই রাখাল ছেলেটি।

সেতাব আসিতেই গোবিন্দ পলাইল।

সেতাব বলিল, এই লাও। বলিয়া পাঁচটি টাকা ঘোঁতনকে দিল এবং বলিল, দোব, তাই দোব। বুঝলে। বুঝলে, বলে দিয়ো।

ঘোঁতন আয়না-চিরুনি পকেটে রাখিয়া টাকা পাঁচটা রুমাল বাহির করিয়া খুঁটে বাঁধিল। বলিল, তোমাকে লোকে খারাপ লোক বলত বুয়েচ, আমিও বলতাম। কিন্তু তুমি তা লও। বুয়েচ, এ আমি বুঝেচি। বুয়েচ! মুখ্খুতে বলবে, কিন্তু আমি মুখ্খু লই। তুমি গুড ম্যান, তবে হ্যাঁ, স্ত্রীকট্ ম্যান—

সেতাব বুদ্ধি ধরে বিচক্ষণ, সে চ্যাংড়াও নয়। তাহার উপর সে পঞ্চায়েতের মণ্ডল। সে বলিল, তুই বড় ফাজিল ঘোঁতন। বড় বেশি বকিস। যা, বাড়ি যা। রাখহরির ছেলেকে পাঠিয়ে দিস। আর শোন্, আর একটা কথা বলি। নিজে একটু খাটিস। এতবড় আইবুড়ো বোনটাকে অমন করে খাটাস না। বুঝলি?

ঘোঁতন বিচিত্র মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, ওরে বানাস্ রে? তা এক কাজ কর না। সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া বলিল, তুমি পুটিকে বিয়ে কর না। তোমার তো ছেলেপুলে হল না।

সেতাব প্রথমটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—ইয়েকে বলে, ইয়েকে বলে—। তারপর অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, ঘোঁ-ত্-না—

—এই দেখ, রাগ করছ ক্যানে? ঘোঁতনা হাসিল।—ও বউয়ের ছেলেপুলে হবে না তোমার। আর তোমার উপর টানও নাই তার। সে যা কিছু—

সেতাব আবার আরও জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ঘোঁ-ত্-না—

ঘোঁতন আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই মহাতাপের গলা শোনা গেল রাস্তার বাঁকে। সে গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল—

কাজুলী কাজুলী ও আমার আখের
বনের আদুরী, কালো বরণ কাজুলী—
তোর পয়ে হবে আমার বউয়ের
আমার হবে মাদুলী

ঘোঁতন চমকিয়া উঠিয়া প্রায় লাফ দিয়া নামিল রাস্তায়। বলিল, চললাম। পাঠিয়ে দোব রাখহরির ছেলেকে।

সে দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

সেতাবের হুঁকা-ধরা হাতখানি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। চোখে তাহার বিচিত্র দৃষ্টি ফুটিয়াছে। মুখ কেমন হইয়া গিয়াছে।

মহাতাপ ওদিক হইতে দুইজন ব্যবসায়ীকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল, বলিল, এই লাও। গুড় কিনতে এসেছে। আলুর বীচন কিনবে! সাহজী, এই হামারা দাদা। ওই দাম-দর করেগা।

চমকিয়া উঠিল সেতাব। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিল।

মহাতাপের সর্বাঙ্গে কাদা। সে জমি নিড়াইতেছিল। বাড়ি ফিরিবার পথে গুড়ের পাইকারদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

তাহাদেব বসাইয়া সে হাঁকিতে হাঁকিতে বাড়ি ঢুকিল, বড় বউ। ও বড় বউ। সুর করিয়া আবদারের ডাক।

ছোট বউ দাওয়ায় বসিয়া ময়দা মাখিতেছিল। সে বলিল, অ মাগো। ডাকের ঢঙ দেখ একবার।

মহাতাপ গ্রাহ্য করিল না। বলিল, কোথা গেল বড় বউ?

ছোট বউ বলিল—উত্তাপের সহিতই বলিল, তার শরীর খারাপ। ঘরে শুয়ে আছে।

মহাতাপ বলিল, শরীরের কিছু না বলেছে! রোজ শরীর খারাপ। রোজ শরীর খারাপ! অ-বড় বউ। বড় বউ!

বড় বউ বাহির হইয়া আসিল। বলল, কি বলছ?

বলি ফোঁটা দেবে না আমাকে? ষষ্ঠীর ফোঁটা?

বড় বউ হাসিয়া বলিল, দেব বইকি। চৌকাঠে দিয়েও মন তো মানে নি! জল না খেয়েই বসে আছি।

—আর একটি কথা শোন।

—বল।

গুড়-আলুর খরিদ্দার নিয়ে এসেছি। হিন্দুস্থানী পাইকাব।

—তা বেশ তো। বেচ দুই ভাইয়ে যুক্তি করে।

—সে যুক্তি তুমি তার সঙ্গে কর গিযে। ওসব আমি জানি না! আমার কৃষাণের ভাগের দশ মন গুড় চাই। আমি বিক্রি করেগা। সে কথা হয়ে আছে। তুমি সাক্ষী। সে টাকা হাম লেঙ্গে। ১৮·০০ টাকা করে মন। ১৮০·০০ রূপেয়া।

—আচ্ছা পাগল তুমি। সবেরই তো অর্ধেক ভাগ তোমার। নাও না দাদার কাছে।

—উঁহু। উ সব নেহি মাংতা। এই আমার কৃষানের ভাগটা চাই।

মান্নু বলিয়া উঠিল, পাগল লোক সাধে বলে না! মরণ!

—চুপ রহো, চুপ রহো, আরে দুষ্টু সরস্বতী, চুপ রহো। ওহি টাকাসে হম হার গড়ায়েগা। বড়া বহুকে লিয়ে আর তুমহারা লিয়ে। কেয়া দুষ্ট সরস্বতী, এরে ময়না—বোলো রাধা কিষণ, বোলো মিঠি বাত। সোনেকা হার। সোনেকা হার।

মান্নু বলিয়া উঠিল, একশো আশী টাকায় দুজনের সোনার হার। এ যে সেই দুপয়সার মণ্ডা কিনলাম, আমি খেলাম, আমার দাদা খেলে, তারপর ফেলে দিলাম, কুকুরে খেলে, তাও শেষ করতে পারলে না, পড়ে থাকল। নব্বই টাকা সোনার ভরি।

মহাতাপ এবার হুঙ্কার দিয়া উঠিল—এ, তু মুন্সামালকে বাত কহো—আশী রূপেয়াকে হারসে মন উঠতা নেহি; অঃ, তেরা লিয়ে পাঁচশো আশী রূপেয়াকে হার চুরি করকে আনেগা হম। দেখো বড়া বহু—

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, চুপ কর মহাতাপ। ছি, কতবার বলেছি তোমাকে, এমন কথা বোলো না মান্নুকে। আর মান্নু, মানুষটা বড় মুখ করে কথা বললে, তাকে কি ওই ভাবে কথা বলে?

—না, বলে না। আশী টাকার হার—তাও রূপোর না সোনার। সেই পাঁচ সিকের জমিদারি।

—বেশ তো হার শুধু তোর জন্যেই হবে।

—নেহি। কভি নেহি। কখনও না।

—আমি হার পরব না। আমার চাই না ভাই।

মান্নু এবার হঠাৎ খুব ভাল মানুষ হইয়া গেল; একেবারে একমুখ হাসিয়া অত্যন্ত মিষ্টি ভাষায় অতি মোলায়েম করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আশী টাকার হার পরে, না, মানায় দিদিকে। পাঁচশো আশী টাকার হার পরবে দিদি, হারের বায়না হয়ে গেল। বুঝেছ?

বলিয়াই সে ময়দার থালাটা হাতে লইয়া অত্যন্ত দ্রুত উঠিয়া চলিয়া গেল।

বড় বউ আর্তকণ্ঠে ডাকিল—মান্নু—। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এক মুহূর্তে; কে যেন তাহাকে অতর্কিতে নিষ্ঠুর আঘাতে চাবুক হানিয়াছে মুখের উপর।

ছোট বউ ঘরে ঢুকিবার মুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চার পাঁচ ভরির হার দুশো আড়াইশো টাকায় খুব সস্তা বড়দি—জলের দর। ওতে তুমি এতটুকু খুঁতখুঁত কোরো না। বড় ভাল মানাবে তোমাকে।

বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া গেল।

মহাতাপ কিন্তু উল্লসিত হইয়া উঠিল; সে পরমোল্লাসে বলিয়া উঠিল, সত্যি কথা? বড় বউ আমার দিব্যি, বল? আরে বাপ রে বাপ রে। চামদড়ি কিপটের এ কি সুমতি। সেদিন পুটি আসবামাত্র বীচন দিয়ে দিলে। আজ তোমাকে সোনার হার! বলিহারি বলিহারি! আজ দাদাকে পেনাম করেগা, পায়ের ধুলো লেগা।

সে পরমানন্দেই বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বাহির-বাড়ির রাস্তার ধারের দাওয়ার উপর হিন্দুস্থানী দুইজন বসিয়া পিতলের থালায় ছাতু ভিজাইয়াছে, লঙ্কা-নুন রাখিয়াছে। লোটার জলে হাত মুখ ধুইতেছে। সেতাব বসিয়া হুকা টানিতেছে। তখনও সে যেন কেমন হইয়া আছে। মাথাটা তাহার কেমন করিতেছে।

মহাতাপ আসিয়া হঠাৎ গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বসিল।

সেতাব চমকিয়া উঠিল—ওই। ওই। এ কি রে বাপু? ও কি?

—পরনাম। তোমাকে পেনাম করলাম।

—ওই। হঠাৎ পেনাম ক্যানে রে বাপু?

—তুমি—। তারপর ওই হিন্দুস্থানী দুইজনের কথা মনে করিয়া চুপ করিয়া গেল। বলিল, শুনেছি, আমি শুনেছি। হাসিতে লাগিল।

—কি?

—বলব, বলব। দাও, হুঁকোটা দাও।

সে হুঁকোটা প্রায় টানিয়াই লইল সেতাবের হাত হইতে এবং পিছন ফিরিয়া হুঁকা টানিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল ওই গুড়ের পাইকারদের কাছে। ভিজানো ছাতুর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। ভিজানো ছাতু বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, ই কেয়া হ্যায়? ছাতু? সাহজী?

সাহুজী উত্তর দিল, হুঁ, সত্তু!

মহাতাপ বলিল, হুঁ হুঁ! বহুত আচ্ছা চিজ! নুন-লঙ্কা দিয়ে আচ্ছা লাগতা হ্যায়, না?

সাহু হাসিল। বলিল, বাঙালীকে হজম নেহি হোতা।

বিকালের দিকে ওজন করিয়া গুড় বিক্রয় হইতেছিল। খামারে একটা কাঁটা-ওজন খাটাইয়া টিন-বন্দী করিয়া গুড় ওজন করিতেছিল রাখাল পাল। সেতাব দাওয়ায় বসিয়া খোলার কুচিতে করিয়া মাটির উপর একটার পর একটা দাগ দিয়া হিসাব রাখিতেছিল। পাশেই একটা গামলা। গামলায় আধ-গামলা

গুড় রহিয়াছে। টিনে গুড় বেশী হইলে তাহার ভিতর হইতে হাতায় করিয়া গুড় তুলিয়া গামলায় রাখিতেছিল, আবার কম হইলে পূরণ করিয়া দিতেছিল। কাঁটার ওজন করিতে রাখালের দক্ষতার খ্যাতি আছে। সে খ্যাতি—খোল বাজানোর খ্যাতির সমান। রাখালের ওজন-করা জিনিস কখনও কম বেশী হয় না! আর তেমনি দ্রুত ওজন করে।

একদিকে একটা আধ মণ, অন্যদিকে টিন।

কাঁটাটা তুলিতেছিল। রাখাল কাঁটার উপরে একটা হাত রাখিয়া কাঁটার দিকে তাকাইয়াছিল, আর সুর করিয়া বলিতেছিল, তের রাম তের—তের রাম, তের রাম তের রাম—

খানিকটা গুড় তুলিয়া লইয়া বলিল, তের রামে চৌদ্দ। চৌদ্দ। ওঠাও।

নোটন টিনটা নামাইয়া রাখিল। তেরটা টিন আগে হইতেই সাজানো ছিল। এটা রাখিতেই চৌদ্দ হইল। রাখাল বলিল, চৌদ্দ, চৌদ্দ। চাপাও।

নোটন আর একটা টিন চাপাইল।

—চৌদ্দ রাম। চৌদ্দ রাম। চৌদ্দ রাম।

ওদিকে কাঁকালে একটা, মাথায় একটা, দুইটা টিন লইয়া বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া হাজির হইল মহাতাপ।

—ধর্ নোটনা ধর্। আগে কাঁকালেরটা।

নোটন কাঁকালেরটা ধরিতেই সে নিজেই মাথারটা নামাইল। তাহার গায়ে হাতে গুড় লাগিয়াছে। বাখাল হাঁকিল, চৌদ্দ রাম, চৌদ্দ রাম—পনের। পনের। পনেব।

মহাতাপ নিজের হাতটা লইয়া গিয়া গোরুটার মুখের কাছে ধরিল।—লে, চেটে লে। গোরুটাকে চাটাইয়া লইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

রাখাল হাঁকিতেছিল—পনের্ পনের্ পনের্।

ওদিকে বাড়ির ভিতরে জালার ভিতর হইতে বাটিতে করিয়া গুড় বাহির করিয়া টিনে ঢালিতেছিল বড় বউ! গাছ-কোমর বাঁধিয়া সে কাজ করিতেছে।

দাওয়ায় বসিয়া মানিক মুড়ি ও গুড় খাইতেছে। পাশেই তাহার বাঁশিটি পড়িয়া আছে। মধ্যে মধ্যে পুঁ করিয়া দিতেছে।

মানদা টিনের পাশে বসিয়া টিনের গায়ে যে গুড় পড়িতেছে সেই গুড় চাঁচিয়া লইয়া একটা পাত্রে জমা করিতেছে।

মহাতাপ ঘরে আসিয়া ঢুকিল। টিনে ভরা হয় নাই দেখিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, বলিল, আরে রাম রাম, এখনও টিন ভরে নাই?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, দিচ্ছি, দিচ্ছি, হাত তো আমাদের দুটো; চারটে

তো নয়। চতুর্ভুজো দেখে বউ আনলেই তো পারতে তোমরা! সবুর কর, ঘোড়াটা বাঁধ।

এখন কাজের মধ্যে চাঁপাডাঙার বউয়ের সে বিষণ্ণতাটুকু আর নাই। এই সময়ই বাহির হইতে রাখাল ডাকিল, এক ঘটি জল দেবে বউমা? বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মানদা বলিল, গুড়ের লোভে আবার জল খেতে এসেছে গেঁজাল। ওজন করবার আর লোক পেল না।

বাহির হইতে রাখাল বলিল, শুনছ, অ বড় বউমা!

চাঁপাডাঙার বউ একটা বাটিতে গুড় লইয়া বাহির হইয়া গেল। মহাতাপকে বলিল, তুমি বার কর হে ততক্ষণ।

রাখাল বলিল, গুড় কিন্তু ফাস্টো কেলাস মা। কি সুবাস! আর কি তার। সুন্দর! সে বসিয়া হাত চাটিতেছিল, চাঁপাডাঙার বউকে দেখিয়া হাতখানা পাতিয়া বলিল, তা দেবা নাকি একটুকুন? তা দাও।

চাঁপাডাঙার বউ বাটিটা নামাইয়া দিয়া অন্য ঘরে জল আনিবার জন্য চলিয়া গেল। রাখাল লম্বা জিভ বাহির করিয়া বাটি হইতে চাটিয়া চাটিয়া গুড় খাইতে লাগিল। হঠাৎ মহাতাপ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—যেন পলাইয়া আসিল এবং খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে মানদাও পিছন পিছন বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, দেখ দেখ, কি করণ দেখ! কাণ্ড দেখ। কথাগুলির মধ্যে আদরের সুর। ছলনা করিয়া মিছামিছি কান্নার ভান। মহাতাপ তাহার দুই গালে গুড় মাখাইয়া দিয়াছে। পুলকিত হইয়াই মানু কাঁদিতেছে।

সেই কৌতুকে মহাতাপ খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

রাখালও কৌতুকে খুকখুক করিয়া হাসিতে লাগিল। বড় বউ আসিয়া জলের ঘটিটা নামাইয়া দিয়া বলিল, মানিককে বল চেটে খেয়ে নেবে, পরিষ্কার হয়ে যাবে। যাও তো বাবা মানিক, মায়ের গালের গুড় চেটে—

এই রঙ্গ দেখিয়া মানিকও উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে খুব জোরে জোরে বাঁশি বাজাইতে লাগিল, পু—পু—পু—পু—

পাগল মহাতাপ এই কথা শুনিয়া যাহা করিল তাহাকে অসম্ভব কাণ্ড ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। সে অতর্কিতে তাহার দুই হাতের গুড় বড় বউয়ের গালে মাখাইয়া দিয়া বলিল, তা হলে তোমার গালের আমি চেটে খেয়ে লোব।

রাখাল অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল।—বলিহারি—বলিহারি—বলিহারি।

ঠিক এই মুহূর্তেই গলা পরিষ্কারের শব্দ তুলিয়া সেতাব বলিল, বলি সব হচ্ছে

কি ? অ্যা। প্রথমেই সে চটিয়া উঠিল রাখালের উপর। বলিল, বলি গুড় খাওয়া হল কবার ? রাখাল ! বলি হা-হা-হা-হা হাসিই বা কিসের ?

রাখাল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, মহাতাপ, বুঝলে কিনা সেতাব, ও আমাদের কি বলে, ওঃ ভারি আমুদে। ওঃ—

সেতাব রুদ্ধ রোষে ভ্যাঙাইয়া বলিল, ওঃ ! ওঃ ! ভারি আমুদে। দায়ে করে নিজের গলায় কুপিয়ে আমারও আমোদ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমোদ, আমোদ—

মানদা মহাতাপকে বলিল, তুমি মর তুমি মর।

মহাতাপ দুই হাত নাড়িয়া বলিল, কেয়া, হুয়া কেয়া ? আরে, হল কি ? বড় বউ স্বামীর দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া মহাতাপকে বলিল, কিছু হয় নি, এস, গুড় বের করে বিক্রির কাজটা শেষ কর। বাইরে লোকেরা বসে আছে। সে ঘরে ঢুকিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভাদ্র শেষ হইয়া গিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ। পূজার ঢাক বাজিতেছে। 'পূজার ঢাক বাজা' কথাটার মানে পূজার কাজ পড়িয়াছে। পূজার ঢাক সত্য সত্য বাজে বোধনের দিন হইতে। অবশ্য বোধন কোথাও একমাস আগে হয়, কোথাও বা পনেরো দিন, কোথাও বা শুক্লপক্ষের পূর্ববর্তী অমাবস্যায় অর্থাৎ মহালয়ার দিন হইতে। যেখানে যেমন নিয়ম। এখানে বোধনের ঘট আসে মহালয়ার দিন। গ্রামের মধ্যে একখানি পূজা—ওই চণ্ডীমণ্ডপে হইয়া থাকে। কয়েক শরিকের পূজা। বোধনের দেরি আছে। তবুও আশ্বিন পড়িতেই পূজার কাজের ধুম পড়িয়া গিয়াছে পল্লীতে পল্লীতে। কিন্তু আজ ঢাক সত্যই বাজিতেছে। আজ ইঁদপূজা বা ইন্দ্রপূজা। সকাল বেলাতেই ইঁদপূজার স্থানটায় ঢাকী ধুমুল দিতেছে। ইঁদপূজা সরকারী পূজা অর্থাৎ আইনমতে জমিদার মালিক। আইনমতে জমিদার মালিক হইলেও আসল মালিক গ্রামের মণ্ডলেরা। পঞ্চমণ্ডলে পূজার কাজ চালাইয়া থাকে। তাহারাই তত্ত্বাবধান করে, তাহারাই খরচ জোগায়, পরে খরচ জমিদারের খাজনা হইতে হিসাব করিয়া বাদ লইয়া থাকে।

সেতাব ইঁদপূজার বেদীব স্থানটার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মোটা মোড়ল চণ্ডীমণ্ডপের কিনারায় বসিয়া মোটা একটা হুঁকায় তামাক খাইতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপে একখানি একমাটি-করা দশভূজা প্রতিমা শুকাইতেছে। এখনও মুণ্ড বসানো হয় নাই। কতকগুলা উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ ছেলে ঘুরিতেছে এদিক

ওদিক। তাহার সঙ্গে মানিকও রহিয়াছে। গোবিন্দ রাখালটা তাহাকে লইয়া আসিয়াছে। মানিককে নামাইয়া দিয়া সে ইন্দ্র-দেবতার বেদীটা গড়িতেছে। দশ-হাত-লম্বা দারুময়-দেহ দেবতাটি একটা বিরাটকায় ফড়িংয়ের মত ঠ্যাং উল্টাইয়া পড়িয়া আছে। মূর্তিটার মধ্যে মূর্তিত্ব নাই, নাক কান চোখের বালাই নাই। দশ-হাত-লম্বা একটা বৃক্ষশাখা, ছালটা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, একদিকে মাথায় ঢেঁকির মত ছোট দুইটা কাঠের সঙ্গে খিল পরাইয়া গাঁথা; ওই ছোট কাঠ দুইটাকে বেদীতে পুঁতিয়া দেবতাকে ঠোকা দিয়া উন্নত এবং উর্ধ্বশির করিয়া পূজার সময় খাড়া করা হইবে।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে গ্রাম্য রাস্তা। রাস্তার ওপর দিয়া চাষীরা চলিয়াছে। কয়েকটি মেয়ে ঝুড়ি করিয়া লালমাটি লইয়া চলিয়াছে। কয়েকজনের মাথায় খড়িমাটি। তাহারা হাঁকিতেছিল—লাল মাটি লেবেগো, লাল মাটি।

খড়িমাটিওয়ালীরা হাঁকিল—খড়িমাটি চাই, ঘর নিকুবার খড়িমাটি! দুধের মত অং লবেন। খড়িমাটি!

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে খানকয়েক বাড়ির পরে শিবকেষ্ট-রামকেষ্টর বাড়ি। শিবকেষ্টর বাড়ির দাওয়া হইতে টিকুরীর খুড়ী উঁকি মারিয়া মুখ বাড়াইয়া সমান জোরে হাঁকিয়া প্রশ্ন করিল, কি লা? কি?

—মাটি গো, মাটি।

—লাল মাটি, খড়িমাটি।

খুড়ী মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিল, মাটি গো মাটি! লাল মাটি! খড়িমাটি! মাটি নিয়ে কি বুকে চাপাবে লোকে? মাটি গো মাটি! ঘরে চাল সেজে না, (অর্থাৎ সিদ্ধ হয় না) লোকে তা বোঝে না। ঘরে ধান নেই, চাল নাই, খাবার নাই; যার ঘরে ধান ছিল লেবি না মেবি করে নিয়ে গেল (লেভি-প্রথা)। যার আছে সে লুকিয়ে রেখেছে। ঘর নিকুবে! লোকে রঙ করবে! মরণ!

—কি খাবি তা আমি জানি? আমি কি খাব, পঞ্চায়েত ভেবেছে? জমি দিয়েছে আমাকে? সেই পাপেই হচ্ছে এসব। গতবারে পোকা লেগেছিল ধানে। এবারে শুকোতে যাবে। শুকিয়ে যাবে, ধান ফুলোবে না। ফুললে শুকিয়ে তুষ হবে! আর জল হবে না। আর জল হবে না। ঠায় দাঁড়িয়ে ধান মরবে। দেখবি! টিকুরীর বউ যেন নাচিতেছিল। সর্বাঙ্গ দোলাইয়া সুর টানিয়া টানিয়া কথা বলিতেছিল। আনন্দ যেন তাহার ধরিতেছে না।

মাটিওয়ালী মেয়েগুলা তাহার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। একজন ঠিক তাহারই মত সুর করিয়া বলিল—তা হবে না মোল্যান, আর সিটির জো নাই।

ক্যানেল এয়েছে। মৌরক্ষী বেঁধেছ। পাকা দেওয়াল দিয়ে গো, লোহার ফটক বেঁধে। ফটক বন্ধ করলেই জল চলে আসবে।

—আসবে না, আসবে না, আসবে না; ঘোঁতন বলেছে আসবে না। খালের ভেতর গোড়াল পড়ে জল চলে যাবে পাতালে। লয় তো বাঁধ ভেঙে যাবে। লয় তো সি জলে ধান বাঁচবে না। বাঁচলে পচে যাবে, লয় তো পোকা লাগবে। ধান হবে না, তুষ হবে। ঘোঁতন বলেছে।

একটি মেয়ে বলিল, ঘোঁতন ঘোষের অমনি কথাই বটে! বলে, হরিনামের নিকুচি করি আমি।

খুড়ী খ্যাঁক্ করিয়া উঠিল—ঘোঁতন ঘোষের অমনি কথাই বটে। ঘোঁতন নেকাপড়া জানে। বিদ্যে আছে পেটে। হোত-ত্যা-ত্যা করে না। এক লজরে ধরতে পারে। আমাকে সেদিন বলেছিল, ভাবলী। রেগেছিলাম আমি। হুঁ বাবা। তা ভাবলীই হলাম আমি। ভাজের গায়ে গুড় মাখিয়ে চেটে খায়! মা গো! কোথায় যাব! বলিতে বলিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল। কণ্ঠস্বর খাটো করিয়া বলিল, অ—মা! মহাতাপ আসছে যে। গোঁত গোঁত করে আসছে দেখ্, বুনো শুয়োর আসছে। অ—মা, হারামজাদী রাঙীকে ধরে আনছে ক্যানে? এই মরেছে। সঙ্গে আবার মোটা মোড়ল।

সে ঘরে ঢুকিয়া গেল। মেয়ে কয়টা এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া চলিতে শুরু করল। একজন হাঁকিয়া উঠিল—মাটি চাই মাটি, রাঙামাটি, খড়িমাটি।

মহাতাপ একটা গোরুর গলায় দড়ি বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছিল; সোজা টিকুরীর খুড়ীর বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া বলিল, তোমার গোরু আমি খোঁয়াড়ে দিতে চললাম। গোরু ভগবতী না হলে, এ যদি ছাগল-ভেড়া হত তো ওকে মেরেই ফেলতাম আমি।

পিছনে পিছনে মোটা মোড়ল বিপিনও আসিয়াছিল। সে গোরুর দড়িটা হাতে লইয়া বলিল, চেঁচাস নে। যা বলবার আমি বলছি।

—তুমি কি বলবে? আমার এক ভিলি আকের নেতার মেরে দিয়েছে। কিছু রাখে নাই। ওটা গোরু, আর মালিক হল বিধবা মেয়েছেলে, আমি কি করব বল দিকি নি?

নিজের চুলগুলা টানিয়া কঠিন আক্রোশ ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, আমার চুল ছিঁড়ে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার অমন ভাল আক, সকলকে কষকষে হয়ে উঠেছিল—

বিপিন ডাকিল, টিকুরীর বউ! বেরিয়ে এস বাছা। শোন!

টিকুরীর বউ বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, কি গো? আমি কাকে কথা

শুনি না। সব মিছে কথা। আমার গাভীকে আমি কখনও বাঁধি না। দিব্যি মাঠে ঘুরে চরে এসে ঘরে ঢোকে। আমি বিধবা মানুষ, আমি বেঁধে খেতে দিতে পাব কোথা? যারা ফসল আজ্জায়, তারা বেড়া দেয় না ক্যানে? ক্ষেতে যখন যায় তখন হেটহেট করে তাড়িয়ে দেয় না ক্যেনে?

বিপিন বলল, তুমি ক্ষেপেছ না কি? কি সব বলছ—

—ঠিক বলছি। দাও, আমার গোরু দাও। আমি ভাসুর বলে খাতির করব না। আমি মোড়ল বলে মানব না। খোঁয়াড়ে দেবে! অঃ!

সে আগাইয়া গেল গরুটা বিপিনের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইবে বলিয়া। মহাতাপ অবাক হইয়া এতক্ষণ খুড়ীব দাপট দেখিতেছিল। সে এবার হাঁক দিয়া উঠিল, কভি নেহি। দাও, গোরু দাও। বলিয়া ঝটকা মারিয়া দড়িটা বিপিনের হাত হইতে কাড়িয়া লইল।—খোঁয়াড়ে দোব আমি।

গোরুটাকে সে টানিতে লাগিল।

টিকুরীর খুড়ি গাছকোমর বাঁধিয়া বলিল, ওরে, আমি তোর পরিবারের মত ম্যানমেনে নই। তোর হাঁকারিকে আমি ভয় করি না—

সে আগাইয়া গিয়া মহাতাপের হাত হইতে গোরুটা ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইল। মহাতাপ গ্রাহ্য করিল না। সে টানিতে লাগিল গোরুটাকে।

—আর, আর।

টিকুরীর খুড়ি বলিয়াই চলিয়াছিল—আমি ঘরের কোণে চোখের জল ফেলব না। রাজের ''ও গাল পেতে খেয়ে মনের দুস্কু মনেই রাখব না। আমি দরখাস্ত করব। হাঁা, দরখাস্ত করব। এখুনি ঘোঁতনের কাছে যাব।

তাহার কথা শেষ হইতে হইতে শিবকেষ্ট টলিতে টলিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, মহাতাপ! ভাই! আমি হাত জোড় করছি, মিনতি করছি। আমার জ্বর, ঘরে পয়সা নাই ধানচালও নাই। খোঁয়াড়ে দিলে, ছাড়াতে হবে আমাকে। নবগ্রাম হাঁটতে হবে। পয়সা লাগবে। আমার দশা দেখ। গোরুটা ছেড়ে দে ভাই।

মহাতাপ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

বিপিন বলিল, দে গোরুটা ছেড়ে দে বাবা।

মহাতাপ বলিল, আহা-হা শিবে, তু যে মরে যাবি রে! আঁা! আহা-হা-হা রে, কি দশা হয়েছে তোর?

শিবকেষ্টর দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা ছিল না, সে উপুড় হইয়া বসিয়া হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া দুই হাতে মাথা ধরিয়া বলিল, জ্বরে একেবারে হাড় ভেঙে দিলে রে। তিনখানা কাঁথাতে কাঁপন থামে না। গোরুটা ছেড়ে দে ভাই।

খুড়ী আগাইয়া আসিয়া মহাতাপের শিথিল হাত হইতে গোরুর দড়িটা টানিয়া লইয়া বলিল, দেবে আর ভাল বলবে। দেবে না?

মহাতাপ গোরুটা ছাড়িয়াই দিল, বলিল, আজ ছেড়ে দিলাম শিবের মুখ চেয়ে। ফের দিনে কিন্তু ছাড়ব না।

খুড়ী বললে, শিবের মুখ চাইতে হবে না। যার মুখ চাইলে ধর্ম হবে, তার মুখ চেয়ে দেখ-গে! ভাজের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিজের পরিবারের মুখের পানে তাকাগে যা! শিবের মুখ! মরণ!

খুড়ী গরুটা লইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন মোড়ল শিবকেষ্টকে বলিল, টিকুরীর বউকে নিয়ে বিপদ হল শিবু! ওকে সাবধান করিস। বলিয়া চলিয়া গেল।—কথাগুলি ভাল কথা নয়।

শিবকেষ্ট মাথার উপর হাতটা উল্টাইয়া দিল। সে কি করিবে?

মহাতাপ হাত বাড়াইয়া শিবকেষ্টকে বলিল, ওঠ্ আমাকে ধরে ওঠ্।

শিবকেষ্ট ধীরে ধীরে উঠিল।

মহাতাপ তাহাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। খুড়ী যেন কী কথাটা বলিয়া গেল! কি ভাজের মুখ! পরিবারের মুখ! কি সব বলিল! শিবকেষ্টর অবস্থা দেখিয়া সে তখন এমনই অভিভূত হইয়াছিল যে, কথাটা ঠিক শুনিয়াও বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। এতক্ষণে কথাটা মনে হইল। কি বলিল? সে হাঁকিয়া ডাকিল—এই, এই খুড়ী, এই বিষমুখী টিকুরীর খুড়ী! বলি শুনছ?

খুড়ী ঘরের ভিতর হইতেই উত্তর দিল—কেন রে—ড্যাকরা? বলি বলছিস কি?

—কি বললে কি তখন? আর একবার বল দিকিনি? কি ভাজের মুখ—বউয়ের মুখ—কি বলছিলে?

টিকুরীর খুড়ী হাসিয়া বলিল—তোমাদের বড় বউয়ের মুখখানি বড় সুন্দর রে, চাঁদের পারা। তাই বলছিলাম। তোর বউয়ের মুখ কিন্তু এত সুন্দর নয়, তাই বলছিলাম আমি?

মহাতাপ খুশী হইয়া গেল। সে উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করিয়া বলিল,—হাজার বার লক্ষ বার। এ তুমি ঠিক বলেছ। আমি বলি কি বলছ। নাঃ এ তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু এবার গোরু সামলে রেখ। তা বলে গেলাম। সে হনহন করিয়া মাঠে চলিয়া গেল। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর তখন। মাঠে ধান ভরিয়া উঠিয়াছে। নিড়ান চলিয়াছে। নিদারুণ রৌদ্রের মধ্যে ধানের ক্ষেতে হামাগুড়ি দিয়া

আগাছা তুলিয়া চলিয়াছে চাষীরা। দূরে তখনও মাটিওয়ালীদের হাঁক শোনা যাইতেছে।—মাটি, মাটি চাই গো! মাটি, লাল মাটি—খড়িমাটি!

সেতাবের বাড়ীতে সেদিন দুপুরে ঢেঁকিতে ছোলা কলাই কুটিয়া বেসম তৈয়ারী হইতেছিল। বেসম হইতে সেউই ভাজিয়া গুড়ে পাক করিয়া পূজার নাড়ু হইবে। দুইজন ভানাড়ী মেয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিতেছিল, ঢেঁকির মুখে নাড়িয়া-চাড়িয়া দিতেছিল।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর বেলা, বাড়িটা নির্জন। বড় বউকে দেখা যাইতেছে না। এই নির্জনতার মধ্যে তাহারা গান গাহিতেছে। মানদা গাহিতেছে মূল গান-মেয়েগুলি গাহিতেছে ধুয়া।

মেয়েগুলি ধুয়া গাহিতেছিল—

আমরা বাজুবন্ধের ঝুমকো দোলায়
বঁধুর মন তো দুলল না,
ও-তার সিঁথিপাটির লালমানিকের
ছটাতে চোখ খুলল না
হায় সখি, লাজে মরি লাজে মরি গো।

মানদা গাহিল—

আমার মন যে দোলন খেলে
ও-তার বনমালার দোলাতে।
আমার মন সেই গেল ভুলে.
তারে এসে ভুলাতে।

ভানাড়ী মেয়েগুলি আবার ধুয়া ধরিল—

আমার বাজুবন্ধের ঝুমকো দোলায়
বঁধুর মন তো দুলল না!
হায় লাজে মরি লাজে মরি লাজে মরি সখি গো!

মানদা আবার গাহিল—

মন কাড়িতে এসেছিলাম
মন হারায়ে ঘর ফিরিলাম—
লাজে গলায় চিক মাছুলি পড়ল ছিঁড়ে ধুলোতে।

সঙ্গে সঙ্গে ভানাড়ীরা ধরিল—

হায় লাজে মরি লাজে মরি লাজে মরি সখি গো।

মানদা আবার গাহিল—

খুলতে গেলাম বাজুবন্ধ বাঁধন যে সেই খুলল না!
ভুলতে গেলাম তারে সখি ভুল যে মোকে তুলল না।
কালনাগে ধরতে গেলাম—
কালীয়ারে জড়াইলাম——
মারতে গিয়ে অমর হলাম জলতে জলন জালাতে?
—লাজে মরি লাজে মরি লাজে মরি সখি গো।

রাধাকৃষ্ণের লীলার স্পর্শ জড়াইয়া এমন ধরনের প্রেমের গান বাংলার পল্লী অঞ্চলে কালে কালে কালোপযোগী ভাষায় ছন্দে উপমায় রচিত হইয়া আসিতেছে। এ ভাব পুরানো হয় না। নূতন ভাষায় নবীন হইয়া দেখা দেয়। সকল কালেই পুরবধূরা এ গান—বাউল বৈরাগী পাঁচালীদল, যাত্রার দলের গায়কদের কাছে শুনিয়া শিখিয়া লয়। কালে কালে এই ভাবে নির্জন দ্বিপ্রহরে গাহিতে থাকে। ঘরে গায়—ঢেঁকিশালে, ঘাটে গায়—জলে গলা ডুবাইয়া, সখিরা মিলিয়া জল আসিবার পথে গায়।

গানের মধ্যেই দরজায় ধাক্কা পড়িল। কেহ শিকল বাজাইয়া দরজার ও-পাশে সাড়া দিতেছে। মানদা সেদিকে তাকাইয়া বলিল, কে?

মেয়েলি গলায় সাড়া আসিল, একবার দরজাটা খোল।

মানদা ভানাড়ীদের একজনকে বলিল, দে তো লা খুলে।

মেয়েটি দরজা খুলিয়াই বলিল, অ! পুটি মোল্যান! মানদার দিকে তাকাইয়া বলিল, ঘোঁতন ঘোষের বুন গো! বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

পুটি বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া বলিল, ওরে বাপরে! এ যে পুজোর ধুম পড়ে গিয়েছে যে! খুব কলাই-কুটছ! খুব গান জুড়েছ!

মানদা মুখ চমকাইয়া বলিল, তা কুটছি। কিন্তু তুমি কি মনে কর হে এই ভত্তি দুপুরে?

—বড় বউ কই? চাঁপাডাঙার দিদি? একটা কথা বলতে এসেছি।

মানদা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি কথা হে?

—না ভাই, সে আমি তাকেই বলব। আমার মা ব'লে পাঠিয়েছে, অন্য কাউকে বলতে বারণ করেছে।

—আমি জানি হে, আমি জানি। পয়সা তো? টাকা?

—তা জানবে বইকি ভাই। তুমি অদ্ধেকের মালিক। জানবে বইকি। তবে আমি চাঁপাডাঙার দিদিকে বলে যাই; তুমি তার কাছে শুনো। কই দিদি কোথায়?

মানদা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ধান সেদ্ধ করছে, ওদিকের চালায়।

পুটি এগিয়ে গেল।

মানদা হাতের কুঁচিগাছটা লইয়া বলিল, ললাটে তিন ঝাঁটা মারতে মন হয় —তিন ঝাঁটা।

বাড়ির আর একদিকে খোড়ো চালায় উনান হাঁড়িতে ধান সিদ্ধ হইতেছিল। ছোট এক টুকরা উনান, সেখানে সিদ্ধ-করা ধান মেলা রহিয়াছে। একটি মজুর মেয়ে পায়ে পায়ে ধানগুলি টানিয়া ওলট-পালট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। চাঁপাডাঙার বউয়ের কাপড়খানা ময়লা, ধোঁয়ায় কালো। গাছকোমর বাঁধিয়া কাপড় পরা। মাথায় ঘোমটা নাই। চুলগুলি রুখু দেখাইতেছে। এখনও স্নান হয় নাই। মুখ-চোখ আগুনের আঁচে এবং এখনও অস্নাত অভুক্ত বলিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। একটু বেশী কালো দেখাইতেছে।

পুটি গিয়া একটু অবাক হইয়াই বলিল, তোমার কি অসুখ করেছে নাকি দিদি? এ কি মুখ হয়েছে তোমার? যেন বড় অসুখ থেকে উঠেছ? সে সকরুণ বিস্মিত দৃষ্টিতে কাদুর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুটি?—পুটিকে দেখিয়া বড় বউ একটু বিস্মিত হইয়া গেল।—এমন অসময়ে!

—মা পাঠালে তোমার কাছে। কিন্তু—

—সইমা? কেন রে? অসুখ শুনেছিলাম সইমায়ের—; শঙ্কিত হইয়া উঠিল সে। পুটি কি তবে টাকা পয়সার জন্য আসিয়াছে।

—উঠেছে অনেক ভুগে। কিন্তু তোমার এমন চেহারা কেন?

এবার সলজ্জ হাসিয়া বড় বউ বলিল, উপোস কিনা আজ। তার উপর—

—উপোস। ইঁদপূজোর?

—না, আজ সংক্রান্তি। সংক্রান্তিতে কালীর উপোস করি।

—কালীর কবচ নিয়েছ বুঝি দিদি? ছেলের জন্যে?

—হবে না জানি, তবুও নিয়েছি। চাঁপাডাঙার বউ হাসিল—বড় বিষণ্ণ সে হাসিটুকু। উপবাসশুষ্ক মুখে ঠোঁটের সে হাসিটুকু অনাবৃষ্টি আকাশের বর্ষণহীন বন্ধ্যা মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুৎরেখার মতই বিশীর্ণ।

পুটি বলিল, তুমি কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার দেখাও না কেন দিদি? ওই তো বাবুদের গাঁয়ের রবীনবাবুর বউ কলকাতায় গিয়ে কি সব চিকিৎসা করালে —দিব্যি বছর না ঘুরতে ছেলে হয়েছে।

বড় বউ বলিল, ওসব বাবুদের যা হয় তাই কি আমাদের হয়, না সাজে? এখন কি বলেছে সইমা বল?

পুটি বলিল—কেন কাদু দিদি, জামাই মোড়লের পয়সা তো অনেক। বাবুদের চেয়ে কম নয়। তবে কেন হবে না? না-না, তুমি ধর। তুমি কলকাতা যাও!

কাদু বলিল—টাকা খরচ করবে তোর জামাই মোড়ল? তার থেকে সে নতুন বিয়ে করবে!

পুটি সভয়ে যেন চাপা গলায় চীৎকার করিয়া উঠিল—না—কাদুদি না।

কাদু হাসিয়া ফেলিল পুটির এমন ভয় দেখিয়া। হাসিয়া বলিল—মরণ। ভয় দেখ ছুঁড়ির। ভয় নেই, তাও পারবে না তোর জামাই মোড়ল। দুটো বউকে ভাত দিতে হবে না? তাতে খরচ কত জানিস?

পুটি স্তব্ধ হইয়া কাদুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কাদু হাসিয়াই প্রশ্ন করিল—কি—এমন করে চেয়ে রয়েছিস কেনে?

পুটি বলিল—ব্যাটাছেলেদের জান না দিদি, ওদের ঝোঁক চাপলে—ওরা সব পারে।

—ব্যাটাছেলেদের খবর তুই এত জানলি কি করে লা?

যেন অপ্রতিভ হইয়া গেল পুটি। পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—চোখের উপর দেখছি দিদি।

—তোর দাদাকে?

—হ্যাঁ। আরও কতজন দেখছি।

—মরুক গে। যে যা করছে করুক। তোর কেপন জামাই মোড়ল আর যা করবে করুক—এ কাজ করবে না। এখন সইমা কি বলেছে বল।

পুটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কাদুর শেষ কথায় চমকিয়া উঠিল, একটু আড়ালে চল দিদি।

—আড়ালে? আয়।

পুটিকে লইয়া সে একটা ঘরে ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিল, কি রে?

—জান কি না জানি না; তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার দাদার আজকাল খুব মাখামাখি। হঠাৎ অঘটন ঘটেছে যেন। মোড়ল প্রায় যায় দাদার কাছে।

চমকিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ। কিন্তু সে বড় শক্ত মেয়ে। মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিয়া বলিল—তোর দাদার কাছে যায়? তাতে কি হল? তোর দা'র সঙ্গে এককালে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল বলে, চিরকালই কি আক্রোশ থাকবে না কি?

—তুমি আমার দাদাকে জান না চাঁপাডাঙার দিদি।

—দাদার ওপরে এত রাগ ক্যানে রে? বিয়ে দেয় না?

—মরণ আর কি, বিয়ের জন্তে ভাবি নে। কথাটা কিন্তু আমার নয়, মায়ের। মা বলে দিলে। দাদা বড় মোড়লকে ঠকাচ্ছে। রাখহরি দত্তের ছেলের সঙ্গে জোট করে ফাঁদ পেতেছে। দু ভরির গয়নার ভেতর লোহার তার ভরে, সীসের টোপা ফেলে, চার ভরি ওজন দেখিয়ে বাঁধা দিচ্ছে। মা বললে—আমার সইয়ের মেয়ে, তারপরে মহাতাপ এবার ধান ছেড়ে দিয়ে উপকার করেছে, তাতে এসব জেনে-শুনে চুপ করে থাকলে আমার ধর্মে সইবে না। তোমার স্বামী সেই লোভে মজেছে দাদার সঙ্গে।

—সে তো ভাই স্যাকরাকে দেখিয়ে-শুনিয়ে নেয় নিশ্চয়।

—না। নেয় না! সেই তো! মা বললে—কিসে যে সেতাবকে ও বশ করলে ভগবান জানেন। কাল দুশো টাকা দিয়ে একজোড়া ফারফোরের অনন্ত বাঁধা রেখেছে! তার ভেতরে নাকি দুটো লোহার সরু সিক ভরা আছে। মা নিজের কানে শুনেছে। সে গয়না না ভাঙলে ধরা যাবে না।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, বলব আমি তাকে। সে আসুক।

পুটি বলিল, আমার নাম কোরো না দিদি। দোহাই তোমার! তা হলে দাদা আমাকে—

—তোকে মারে নাকি পুটি?

পুটি হাসিল, বলিল, ও কথা ছেড়ে দাও। আর একটা কথা বলি—

চাঁপাডাঙার বউ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পুটি বলিল, যা করে হোক তোমার স্বামীকে ওর সঙ্গ ছাড়াও। নইলে তোমাদের ঘর থাকবে না। ভেঙে দেবে। নিশ্চয়ই ভেঙে দেবে। বড় মোড়ল আমাদের বাড়ি যায়, গুজগুজ করে দাদার সঙ্গে। আমার ভাল লাগে না। হয় তোমার নিন্দে, নয় ছোট মোড়লের নিন্দে! বড় মোড়ল মধ্যে মধ্যে বলে, ইচ্ছে হয় কি জান ঘোঁতন—ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাই, নয়তো আগুন লা য় দিই ঘরে। তোমার স্বামী আর সে মানুষ নাই দিদি। তুমি সাবধান হও।

বড় বউ বিস্ফারিত নেত্রে সম্মুখের শরৎকালের গাঢ় নীল মধ্যাহ্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সেখানে ছোটবড় হালকা মেঘের পুঞ্জগুলি ভাসিয়া মন্থরগতিতে যাইতেছিল। পুঞ্জ পুঞ্জ হালকা দুধের মত রঙের নব লক্ষ গাভীর পাল। আকাশগঙ্গার অসীম-বিস্তার কোমল নীল তটভূমিতে স্বচ্ছন্দ চারণে মন্থরগতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রৌদ্রে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ দুই-একটার গায়ে—একেবারে মাঝখানে হয়তো ঈষৎ কালো রঙের আমেজ। যেন দধিমুখী ধবলী গাইটার পিঠে টুকরাখানেক কালো রঙের বিচিত্র সমাবেশের

মত। ছোট ছোট টুকরাগুলা যেন লাল্‌কী বাছুর ; বড় মেঘের টুকরার চেয়ে ওইগুলা ছুটিয়াছে দ্রুততর বেগে। প্রাণের আবেগে পিঠে লেজ তুলিয়া আকাশের অঙ্গনময় দাপাদাপি করিয়া ফিরিতেছে।

বাহিরে একটা গাই ডাকিয়া উঠিল।

সেই ডাকে বউয়ের চমক ভাঙিল। পুটি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। গরবিনী চাঁপাডাঙার বউয়ের নিজের মনে হইল—সে এক মুহূর্তে যেন কত গরীব হইয়া গিয়াছে। পুটি তাহার সে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি বলিল, আমি যাই, দিদি।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। চাঁপাডাঙার বউ তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, পুটি।

পুটি তাহার দিকে সবিস্ময়ে তাকাইয়া বলিল, কি? চাঁপাডাঙার বউয়ের দৃষ্টি যেন কেমন! ভাদ্রের ভরা দীঘির মত তাহার চেহারা। কূলে কূলে ভরা অথৈ জলতল হইতে যেন কোন একটা জলচারী নড়িয়া উঠিতেছে। সে নড়ায় উপরটায় কাঁপন জাগিয়াছে।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল—অত্যন্ত চাপা স্বরে, আমার স্বামী আর সে মানুষ নাই? আমার নিন্দে করে? কি নিন্দে করে পুটি? আমি কি করেছি? কি বলে?

পুটি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, সে ভয় পাইয়া গিয়াছিল ; সভয়ে হাত টানিয়া লইয়া সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানি না চাঁপাডাঙার দিদি, আমি জানি না।

সে এক রকম ছুটিয়াই পলাইল। যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, গুজগুজ করে কথা বলে দিদি। শুনতে পাই না। শুনতে পাই না। কিন্তু অনেক কথা, অনেক কথা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইহার পর প্রায় এক মাসের উপর চলিয়া গিয়াছে। পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। ষষ্ঠীর দিন। চণ্ডীমণ্ডপে যথানিয়মে ঢাকের সঙ্গে ঢোল সানাই কাঁসী আসিয়া পূজার সুর জমাইয়া তুলিয়াছে। দেশে অন্নের অভাব, কাপড়-চোপড় দুর্মূল্য, এসব সত্ত্বেও পূজার সুর একেবারে কাটিয়া যায় নাই। আগেকার কালে এ সুর একটা দেশব্যাপী ঐক্যতানের ঝঙ্কার তুলিত, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছিয়া সে গ্রামের বাজনার সঙ্গে সুর মিলাইত। আজ সুর ওঠে, কিন্তু সে সুর

ঐক্যতান ভুলিতে পারে না ; গ্রামের প্রান্তদেশ পর্যন্ত গিয়া গ্রামান্তরের মধ্যবর্তী মাঠের সীমানার মুখেই এলাইয়া পড়ে। সেদিন বেলা তখন প্রহরখানেক, নবগ্রামের বাজারে কাপড় কিনিতে গিয়াছিল সেতাব। কেনা-কাটা শেষ করিয়া ফিরিবার পথে ঘোঁতনের দলিজায় উঠিল। পুটি সত্য সংবাদই দিয়াছিল ; ঘোঁতনার সঙ্গে সেতাবের এখন খুব মাখামাখি। নবগ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক-শ্রেণীর অর্থাভাব ক্রমশই দারুণ হইতে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। সকলের আগে এ অবস্থায় তাহারা গহনা বন্ধক দিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। প্রাণ ধরিয়া বিক্রয় করিতে পারে না। ঘোঁতন এই কারবারটায় সেতাবকে ঢুকাইয়া দিতে সাহায্য করিতেছে।

ঘোঁতন বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। কোথায় পূজামণ্ডপে সানাই বাজিতেছে। দাওয়ার পাশেই একটা শিউলিগাছের তলায় শিউলি ঝরিয়া পড়িতেছে।

সেতাব আসিয়া দাওয়ায় উঠিতেই সে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বসাইল। বিড়ি দিল। সেতাবের বগলে একটি বাণ্ডিল, হাতে একটি পোঁটলা। বিনা ভূমিকাতেই সে ঘোঁতনের হাতে দিয়া বলিল, দেখ দিকি ছেলেগুলার গায়ে হয় কি না।

পোঁটলা খুলিয়া ঘোঁতন দেখিল, কয়েকটা ফ্রক জামা, দুইখানা শাড়ি, একখানা ধুতি, একখানা থান কাপড়, দুইটা ব্লাউজ ও একটা সার্ট। ঘোঁতন বুঝিল, এগুলি তাহার জন্যই লইয়া আসিয়াছে। সে দন্ত বিস্তার করিয়া বলিল, দাঁড়াও, দিয়ে আসি বাড়িতে, বুঝলে।

পোঁটলাটা লইয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

সেতাবের উপু হইয়া বসা অভ্যাস। সে হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া মাথায় একহাত দিয়া অন্য হাতে বিড়ি টানিতে লাগিল।

পথের উপর দিয়া কয়েকটা গরু লইয়া একটা রাখাল চলিয়া গেল। তাহার পিছনে বহুবল্লভ বাউল একতারা এবং কোমরে গামছা বাঁধিয়া টুংটাং শব্দ তুলিতে তুলিতে যাইতেছিল। বহুবল্লভ সেতাবকে দেখিয়া বলিল, বড় মোড়ল এখানে বসে ?

সেতাব বলিল, বলি তার কৈফিয়ত তোকে দিতে হবে নাকি ?

বহু বলিল, কাপড় কিনতে এসেছিলে ?

সেতাব বিড়িতে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, উঁহু আকাশের তারা গুনতে এসেছিলাম।

বহু বৈষ্ণব মানুষ, রাগ তাহার নাই ; সে হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, দিনের বেলায় ?

সেতাব বলিল, রেতের বেলা পথে সাপ-খোপ শেয়াল কুকুর ; রেতের বেলা নিজের বাড়িতে তারা গুনি। নবগেরামের আকাশের তারা দিনে গুনতে আসাই ভাল।

—তা দিনে তারা দেখবার সময় তোমাদের বটে! যা ধান জমেছে তোমাদের! আঃ, যেমন কালো কষকষে রঙ, তেমনি গোছ! তা মহাতাপ একটা মরদ বটে! ক্ষ্যামতা ধরে বটে!

সেতাব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ফতুয়ার পকেট হইতে একটা পয়সা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, যা যেখানে যাবি চলে যা। বকর বকর করে কানের পোকা মারিস না আমার। মেজাজ খারাপ করে দিস না।

হরিব-ল—হরিব-ল!—বলিয়া পয়সাটি কুড়াইয়া কপালে ঠেকাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, তা মেজাজ খারাপ হবার কথা বটে! আঃ, আকাশ খাঁ খাঁ করছে। মেঘের চিহ্ন নাই। তোমার উ মাঠে এখনও ক্যানেল আসে নাই। জল না হলে এমন বাহারের ধান সব মরে যাবে। আঃ! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, তা, ভেবো না, হবে জল হবে। এই পুজোতেই হবে জল।

—না, হবে না।

বহু চমকাইয়া উঠিল কথার সুর শুনিয়া।

সেতাব আবার বলিল, একেবার শুকিয়ে খড় হয়ে যাবে। জ্বলে যাবে।

বহু বলিল, না না না। হবে। ভগবান তা করবেন না। না না। দেবেন দেবেন। মা ভগবতী আসছে—ভোগ খাবেন, মুখ ধোবেন না, এই হয়? হে মা, জল দাও। জল দিয়ে সৃষ্টি রাখ মা।

সেতাব বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাওয়ার উপব ঘরের দরজার মুখে গিয়া ডাকিল, ঘোঁতন! ও ঘোঁতন!

বহু আর দাঁড়াইল না, সে চলিয়া গেল।

ঘোঁতন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। সে ইহার মধ্যে নতুন জামাটা পরিয়া ফেলিয়াছে। হাসিয়া বলিল, দেরি হয়ে গেল। চা করতে বললাম। দুধ নাই ঘরে, পুটি গেল দুধ আনতে।

—জামাগুলো গায়ে হল ছেলেগুলার?

—হয়েছে। তোমার চোখ আছে হে!

—তা বউয়ের, পুটির কাপড় পছন্দ হয়েছে?

—বউয়ের হয়েছে, পুটির কথা জানি না। ঝাঁটাখাগী আবার কথা বলে না। ওই এক রকম। বড় বজ্জাত হে।

—না না। বড় কাজের মেয়ে। ভাল মেয়ে।

—বউ কিন্তু হাসছিল।

—ক্যানে, হাসির কথাটা কি এর মধ্যে?

—সেই চাঁপাডাঙার বউয়ের সঙ্গে আমার ছেলেবেলায় বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, সেই নিয়ে ঠাট্টা করছিল। সতীনের আড়ি প্রেম হল শেষ!

সেতাব একটু হাসিল, তারপর সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, তুই ভাগ্যিবান ঘোঁতন। তোর ভাগ্যি ভাল। অনে-ক ভাগ্যি তোর।

তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ওই ওর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়নি ঘোঁতন, তুই বেঁচে গিয়েছিস।

ঠিক এই সময় ঘোঁতনের মা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, ধনে-পুত্রে তোমার লক্ষ্মীলাভ হোক বাবা, কিন্তু এত টাকার জিনিস তুমি না দিলেই পারতে। এমন মিষ্টি কথাগুলি বলিলেও তাহার কণ্ঠস্বর কেমন বিরস। কেমন যেন বেসুর বাজিতেছে।

সেতাব সোজা হইয়া উঠিল, বলিল, সইমা।

—হ্যাঁ বাবা।

—ঘোঁতনের ছেলে কাঁদছিল দেখে গেলাম, তা বলি—

—তা ছেলেদের দিলেই হত। এই বাজার। তার ওপর, কিছু মনে কোরো না, তোমার ভাই-ভাজ নিয়ে সংসার—

ভাই-ভাজ। সেতাব রাগিয়া উঠিল।—ভাই-ভাজের কি আছে এতে? আমি দোব আমার অংশ থেকে। তার ছেলে আছে। আমার ছেলে নাই, পুলে নাই। আমার খাবে কে? কি করব আমি? কি করব আমার যুগিয়ে?

—কাদুকে বলেছ বাবা?

—কাদুকে? চমকাইয়া উঠিল সেতাব। মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না, তাকেও বলে নাই।

—তুমি বাবা, আমার আর পুটির কাপড় দু-জোড়া নিয়ে যাও।

—নিয়ে যাব?

—হ্যাঁ।

—মা! চীৎকার করিয়া উঠিল ঘোঁতন।

মা তাহাতে দমিল না। বলিল—কথা হবে বাবা! হবে নয় হয়েছে।

টিকুরীর বউ—সে থামিয়া গেল। একটু পর যেন শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিল—টিকুরীর বউ আমাকে কাল বলছিল, সেতাব খুব আসছে যাচ্ছে। কনেও খুঁজছে। তা—পুটিকে—। আবারও সে থামিয়া গেল।

সেতাব বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘোঁতনকে মায়ের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কথাটাই যেন তাহার একান্তভাবে মনের কথা—অথচ এই মুহূর্তের পূর্বেও তাহার মন কথাটি হাতড়াইয়া পায় নাই। হ্যাঁ, সে সন্তান চায়। কাদু বন্ধ্যা; সে তাহার প্রতি একান্তভাবে অনুরক্ত আসক্ত—তাহার প্রতি প্রেম-প্রীতিতে অভিষিক্ত স্ত্রী নয়। কাদু মহাতাপ মহাতাপ করিয়া সারা। তাহার প্রথম যৌবন অর্থোপার্জনের নীরস কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে উপবাসী রহিয়া গিয়াছে। বহুজনের বঞ্চনায় কৈশোরে সে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া সংসারকে কুটিল অবিশ্বাসী হিসাবেই দেখিয়াছে। ঘোঁতন তাহার মনে সন্দেহ জাগাইয়া দিয়াছে। টিকুরীর খুড়ী তাহাতে বাতাস দিয়াছে। অবিশ্বাস তাহার জাগিয়াছে! এই লগ্নে পুটি আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়াছে। যুবতী মেয়ে। বিবাহ হয় না। বড় দুঃখী। এই তো—ইহাকে বিবাহ করিলে এ তাহাকে পরম কৃতজ্ঞতায় আঁকড়াইয়া ধরিবে। আজ সব কথাগুলি এক কথায় পরিষ্কার হইয়া গেল। সে বলিতে গেল—চোখ তাহার জলজল করিয়া উঠিল—বলিতে চাহিল—হ্যাঁ। আমি পুটিকে চাই। আমি আমার সব—সব তাহাকে দিব—।

কিন্তু বলা হইল না।

কিন্তু এই সময়েই সেতাবের রাখাল গোবিন্দ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, মোড়ল মশায়, শিগগির আসেন। বাড়ি চলেন।

—ক্যানে রে, কি হল? প্রশ্ন করিল ঘোঁতন।

সেতাব বলিল, কি হবে? নিশ্চয় সেই আমার জন্ম-শত্রু কিছু করেছে। ভাই তো নয়—জন্ম-শত্রু আমার। চিরদিন জ্বালিয়ে খেলে। সেই কিছু করেছে।

—হ্যাঁগো। মাঠে একেবারে কাটাকাটি লাগিয়ে দিয়েছে। নিজের মাথা ফেটেছে। এই রক্ত পড়েছে। আর মীরবন্ধের শেখেদের দুজনার মাথা ফাটিয়েছে। সেও রক্ত-গঙ্গা। জল নিয়ে মারামারি।

সেতাব চিৎকার করিয়া উঠিল, মরুক মরুক, নয় তো ধরে নিয়ে যাক। আমি জানি না, কিছু জানি না।

বলিয়া হন হন করিয়া অগ্রসর হইল।

এত বড় কাণ্ডটার কারণ যেটি, সেটি শুনতে সামান্য মনে হয়, কিন্তু চাষার জীবনে তাহা অসামান্য, তাহার গুরুত্ব অনেক বেশী।

কারণ, জল চুরি।

মহাতাপ নিজের মুখেই বলিল, কাল রাত এক প্রহর পর্যন্ত ধরে অমরকুড়ির বেঁকে বাকুড়িতে আল-ছাপু-ছাপু জল করেছি আমি। আঙুল দিয়ে মেপে দেখেছি, আল ছাপাতে দু আঙুল বাকি ছিল। সেই জল চুরি করে নেবে শেখের পো? বললাম, তো বলে—ক্ষ্যাপামি করিস না, বাড়ি যা। চাঁপাডাঙার বউ ভাত বেড়ে রেখেছে, খা গা। ধরলাম টুঁটি চেপে তো হায়দার মাথায় বসিয়ে দিলে পাঁচনের বাড়ি। আমি মহাতাপ! সেই পাঁচন কেড়ে নিয়ে দিলাম দু ভাইয়ের মাথা পিটিয়ে ফাটিয়ে।

মহাতাপ তখন বাড়িতে বসিয়া বড় বউয়ের পরিচর্যা লইতেছিল। ভাল করিয়া রক্ত ধুইয়া গাঁদাফুলের পাতা বাটিয়া চাপান দিয়া ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিতেছিল। মানদা জল দিয়া রক্তাক্ত দাওয়াটা ধুইয়া ফেলিতেছিল।

সেতাব গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। মহাতাপের কথা শেষ হইতেই বলিল, বেশ করেছ, খুব করেছ এইবার ফৌজদারী মামলা হোক। যাও জেলে। একটি পয়সা আমি খরচ করব না। সে আমি বলে দিলাম।

—তা বলে আমার জল চুরি করে নেবে?

—জল চুরির প্রমাণ হয় নাকি? জলের গায়ে নাম লেখা থাকে না কি?

—ও জল পেল কোথা থেকে?

—যেখান থেকে পাক। তুই কোথা পেলি? গাড়োল, মুখ্যু পাগল কোথাকার!

বড় বউ এবার বলিল, দেখ, এমন করে ওকে তুমি যা মুখে আসে তাই বোলো না। তোমাকে বারণ করছি আমি। সহোদর বড় ভাই তুমি, তোমার মুখে এ সব বলতে বাধছে না? ছি-ছি!

মহাতাপ বড় বউয়ের হাত দুখানি পরম আবেগের সহিত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, যার বড় বউ নাই তার কেউ নাই।

মুহূর্তে সেতাব যেন জোর পাইল; সে জ্বলিয়া উঠিল। চাঁপাডাঙার বউকে বলিল, তোমাকেও ছি, তোমাকেও ছি, তোমাকেও ছি! বুঝলে! বলিয়া কাপড়ের বাণ্ডিলটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিল কাদু। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্বামীর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর মহাতাপকে বলিল, ছাড়-তোমার জন্যে দুধ গরম করে আনি। যাও ঘরে গিয়ে শোও একটু। মানু, নিয়ে যা ওকে।

বড় বউ রান্নাশালে আসিয়া উনোনে দুধের বাটি বসাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মহাতাপ ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া আপন মনেই বলিল, চামারের নেতার আমি একদিন নিকেষ করে দোব।

পাশের বিছানায় মানিক শুইয়া ছিল। মানু তাহার চাপাপড়া হাতখানা সরাইয়া দিতেছিল। চামার কথাটা সে শুনিতে পায় নাই। নেতার মারিয়া দিবে শুনিয়াই সে ভাবিল—তাহাকেই বলিতেছে মহাতাপ। এ সংসারে পোড়াকপালি মানদা ছাড়া এত সহজে নেতার আর কাহার মারিবে সে! চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কার?

—কার আবার, ওই চামারের কেপনের, ওই বড় বউয়ের স্বামীর। ওই আমার দাদার তোর ভাসুরের।

—তোমাকেও ছি! বুঝলে?

—তোমার নেতারভি এক রোজ মার দেগা। হ্যাঁ!

বড় বউ কথাগুলি সিঁড়ি হইতেই শুনিতেছিল, বলিল, কি যা তা বলছ? তোমার জন্যে কি আমি শান্তি-স্বস্তি এক দণ্ড পাব না মহাতাপ? নাও, দুধটা খেয়ে ফেল।

না। দুধ খাব না আমি। ভাত দাও। মছলি আওর ভাত। কাল পলুইয়ে ধরা মাছ আছে। মনে পড় গিয়া। মাছের মাথা আর ভাত। লে আও।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, মানু, ভাত এনে দে।

বলিয়া সে ফিরিল। মহাতাপ তাহার আঁচলটা ধরিয়া বলিল, নেহি, উ হামকো ছি করতা। উসকো হাতমে নেহি খায়েগা। তুমি এনে দাও ভাত।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, ছাড়, আঁচল ছাড়।

তাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মহাতাপ আঁচল ছাড়িয়া দিয়া বলিল, কি, হল কি তোমার, বলতে পার?

—কিছু হয় নি, মাছ আজ ছোঁব না আমি। মানু এনে দিক্।

বলিয়া নামিয়া গেল।

মহাতাপ চিৎকার করিয়া উঠিল, ছোঁবে না কানে? তুমি বিধবা হয়েছ, না, খড়দার মাঠাকরুণ হয়েছ? মাছ ছোঁবে না?

সিঁড়ির মধ্যধাপ হইতেই উত্তর আসিল—আজ ষষ্ঠী।

—ষষ্ঠী?

মানদা মুখ বাঁকাইয়া এবার বড় বউ চলিয়া যাওয়ার সুযোগ পাইয়া স্বামীর কাছে আসিয়া বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ষষ্ঠী। ছেলে বংশধর। চাই না? ছেলের জন্যে কি করেছ দেখ না। গলায় এই এক বোঝা মাদুলি। নিত্য উপোস, কানা না কি?

মহাতাপ আজ রাগ করিল না। সে এক মুহূর্তে বিষণ্ণ বেদনায় অভিভূত হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ অস্ফুটস্বরে সে বলিল, ছেলে। সন্তান! সীয়ারাম, সীয়ারাম! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল সে।

মানদা বলিল, বড় দরদ বড় বউয়ের জন্যে। এইবার বোঝ।

আবার একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহাতাপ বলিল, তুই ঠিক বলেছিস মানু, আমি বুঝতে পারতাম না। একটু পর বলিল, আমি তো একটু ক্ষ্যাপাটে বটে। মাথা তো একটু খারাপ!

—একটু? কিন্তু এইবার আক্কেল হল তো?

—হ্যাঁ, হল। আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নেহি। ই হাল নেহি বুঝা!

—এখন যদি বুঝে থাক, তবে সময়ে বিধান কর। বুঝলে?

—কি করি বল্ তো মানু?

—কি করবে? তাও বলে দিতে হবে আমাকে। দাদাকে গিয়ে সোজা জিজ্ঞাসা কর, ঘোঁতনের সঙ্গে শলা করে কত টাকার গয়না বাঁধা রেখেছে বল? এ পর্যন্ত কত টাকার ধান বেচেছে, হিসাব দাও।

বিষয়! —মহাতাপ ঘৃণাভরা তিক্ত দৃষ্টিতে মানদার মুখের দিকে চাহিয়া শিব শিব-শিব! এতক্ষণ ব্যাড়র ব্যাড়র করে হল বিষয়?

মানদা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। মহাতাপ তাহাকে সিঁড়ি দেখাইয়া দিয়া বলিল, বেরিয়ে যা, আমার সামনে থেকে তুই বেরিয়ে যা। আমার সারা অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। বেরিয়ে যা। বিষয়!

বেরিয়ে?—মানদা ফোঁস করিয়া উঠিল। বেরিয়ে যাব ক্যানে? আমি ছেলের মা, এ আমার ছেলের ঘর।

—হাম ছেলের বাবা। আর বেরিয়ে যাবি আর ভাল হবি। বলিয়া ঘাড়টি ধরিয়া তাহাকে সিঁড়িতে বসাইয়া দিয়া আসিল। আসিয়া মানিকের মাথায় শিয়রের কাছে জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

নীচে বড় বউ ক্লান্ত দেহে বিষণ্ণ অন্তরে দাওয়ার উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া ছিল। শুইয়া ছিল ঠিক নয়, অন্তরের দুর্বিষহ আবেগের আলোড়ন সম্বরণ করিবার জন্য উপুর হইয়া পড়িয়া ছিল। সে আর পারে না, পারিতেছে না। এমন সময় মানদা দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিয়া বড় জাকে এইভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। নিরুপায় দুরন্ত ক্রোধ যেমন মানুষ সর্বংসহা পৃথিবীর বুকে পা ঠুকিয়া বাহির করে, কখনও বা মাথা ঠুকিয়া নিজের কপাল ফাটাইয়া শান্ত হয়—আঘাত করে মাটিকেই, রক্তাক্ত

করে মাটিকেই—তেমনি ভাবেই মানদা বড় জায়ের উপর সব ক্রোধ সব ক্ষোভ দিয়া আঘাত করিল। বলিল, তুমিই—তুমিই আমার কপালে আগুন ধরিয়ে দিলে। তুমি।

বড় বউ তেমনি ভাবে পড়িয়া থাকিয়াই উত্তর দিল, দিনরাত চোখের জল ঢেলেও যে নেবাতে পারছি না, কি করব বল?

বলিতে বলিতে সে উঠিয়া বসিল! চোখের জল তখনও গড়াইয়া পড়িতেছিল।

মানু আজ প্রায় ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়াছে। সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, এখন হয়েছে কি? অনেক কাঁদতে হবে। অনেক কাঁদতে হবে তোমাকে।

মানদার চিৎকারেই বোধ করি এক সঙ্গে দুই দিক হইতে সেতাব ও মহাতাপ দুই ভাই আসিয়া হাজির হইল। সেতাব আসিয়াছে বাড়ির বাহির হইতে; মহাতাপ উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে। মহাতাপের কোলে মানিক।

সেতাব তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, একদণ্ড শান্তি দেবে না তোমরা? এত অশান্তি কিসের? কাঁদছ? তুমি কাঁদছ? কেন কাঁদছ শুনি?

মহাতাপ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে হঠাৎ গতি সঞ্চয় করিয়া বড় বউয়ের কাছে আসিয়া কোলের মানিককে প্রায় বড় বউয়ের কোলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, এই নাও, ছেলের জন্যই যদি এত দুঃখু তোমার, তবে এই নাও। আমার ছেলে তোমাকে দিলাম। নাও।

মানদা চিৎকার করিয়া উঠিল, না-না-না। আমার ছেলে—

মহাতাপ পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—না।

সেতাব অধীর পদক্ষেপে আসিয়া বড় বউয়ের কোলের মানিককে তুলিয়া লইয়া মানদা ও মহাতাপের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, না। পরের ছেলে আমি চাই না। ভগবান যদি আমাকে দিয়ে থাকে, তবে সে আমি পাব। আমার হবে।

বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বড় বউ তাহাকে ডাকিল, শোন, শোন, যেয়ো না।

কি?—সেতাব ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বড় বউ বলিল, আমাকে তুমি খালাস দাও।

সেতাব বলিল, বাঁচি বাঁচি, তা হলে বাঁচি আমি। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বড় বউ উঠিল এবং খিড়কির পথের দিকে পা বাড়াইল।

মহাতাপ বলিল, কোথা যাবে তুমি ?

বড় বউ বলিল, সর। পুকুরে ডুব দিয়ে আসি।

বলিয়া সে পাশ কাটিরা বাহির হইয়া গেল। মহাতাপ তাহাকে অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়া ডাকিল, বড় বউ !

মানদা বলিল, আদিখ্যেতা কোরো না। ডুবে মরবে না।

মহাতাপ মানদার দিকে ফিরিয়া বলিল, তোরা সাপের জাত। তোরা সাপের জাত। বিষ ছাড়া তোদের কিছুই নাই। জীবনটা জালিয়ে দিলে। বলিস্ বড় বউকে, তোর কামড় সয়েও ছিলাম। ওর কামড় সইল না। আমি চললাম। এ বাড়িতেই আর আসব না আমি। দু চোখ যেদিকে যায় চলে যাব আমি। হে শিবো ! হে ভগবান—

বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল।

গেল খিড়কির পথেই। পুকুরঘাটে তখন বড় বউ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভরা পুকুরের দিকে তাকাইয়া ছিল সে। ডান হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়াছিল গলার কবচ-মাদুলিগুলি।

দূর হইতে মহাতাপ তাহাকে দেখিয়া বলিল, আমি চললাম ! আর আমি ফিরব না।

বড় বউ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, কথা বলিতে পারিল না।

মহাতাপ যাইতে যাইতেই বলিল, না। ছেলে—ছেলে তোমার হোক। তাই নিয়ে তুমি সুখে থাক। আমি চললাম। কি দরকার তোমার আমাকে ?

সে চলিয়া গেল। বড় বউ দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে তাহার বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; তারপর সে সজোরে টান দিল হাতে ধরা কবচের মুঠায়; কবচ-বাঁধা সুতার ডোরাটা পট করে ছিঁড়িয়া গেল। কবচগুলা সে জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। সেখানে একটা টুপ করিয়া শব্দ তুলিয়া কবচগুলি জলে ডুবিয়া গেল। তারপর সে ধীরে ধীরে জলে নামিল। হাঁটু জলে নামিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইতেছিল।

মহাতাপ দুই চোখ যেদিকে যায় সেই দিকেই চলিবার সংকল্প লইয়াই বাহির হইয়াছিল। আধপাগল মানুষ সে আজ গভীর আঘাত পাইয়াছে ! বড় বউ তাহার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী। দশ-এগারো বছরের কাদম্বিনী শ্বশুর-ঘরে আসিয়া দেওরের সঙ্গে খেলাঘরে খেলা করিত—সে সাজিত মা, মহাতাপ সাজিত ছেলে। কাদাধুলার ভাত রাঁধিয়া দেবরকে খাইতে দিত।

উঠানের একটা খালি অংশকে পুকুর কল্পনা করিয়া সেখানে মহাতাপকে স্নান করাইয়া দিত। ছোট আঁজলায় শূন্যকে জল কল্পনা করিয়া তাই মহাতাপের মাথায় ঢালিয়া দিয়া মুখে বলিত—হুপুস হুপুস।

ছেঁড়া ন্যাকড়ায় গা মুখ মুছাইয়া দিত।

এক একদিন মারিত। মহাতাপ কাঁদিত এবং কান্না থামাইয়া হঠাৎ চাঁপাডাঙার বউয়ের ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উল্টা মার মারিত।

মহাতাপের মা আসিয়া বলিত, কি হল?

কাদু লজ্জায় চুপ করিয়া থাকিত।

মহাতাপ বলিত, আমাকে মারলে।

—তুমি কি করেছিলে?

—বলেছিলাম ভাত খাব না। ও মা-সেজেছে কিনা।

—ও! তুমি ছেলে ও মা!

—মা না কচু! ছাই! ছাই! ছাই!

—না-না-না। ও বলতে নাই, ও বলতে নাই। বড় ভাজ মায়ের মত. মত নয়—মা।

—ওইটুকু মেয়ে আবার মা হয়?

—হয়। লক্ষ্মণের চেয়ে সীতা বয়সে ছোট ছিলেন। তবু সীতা লক্ষ্মণের মায়ের চেয়ে বেশী। জান?

শুধু কি খেলা। কত খেলা তাহারা খেলিয়াছে—তাহার কথা একটা পালাগানের চেয়েও বেশি। সে ফুরায় না। লিখিতে গেলে রামায়ণ মহাভারত হইবে বোধ হয়, বলিতে গেলে রাত ফুরাইয়া যায়। এইভাবে একসঙ্গে কতদিন কাটিয়াছে। তাহার উপর এতদিন নিঃসন্তান অবস্থায় মহাতাপকে নিবিড় ভালবাসায় জড়াইয়া থাকিয়া, আজ হঠাৎ সে ভালবাসাকে খাটো করিয়া তুচ্ছ করিয়া সন্তান-কামনাকে বড় করিয়া তোলার সংবাদে মহাতাপ মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছে।

সে নিজেদের স্বজাতি জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পাড়া বাদ দিয়া আসিয়া উঠিল গ্রাম-প্রান্তে বাউরীদের পাড়ায়।

বাউরীপাড়া পার হইয়া আসিয়া উঠিল মাঠের প্রান্তে।

আশ্বিন মাসে ধানের জমিতে কানায় কানায় জল প্রয়োজন। কিন্তু সারা আশ্বিন জল নাই। মাঠ শুকাইয়া গিয়াছে। মাঠের মধ্যে উৎকণ্ঠিত চাষীরা কোদাল কাঁধে ফিরিতেছে। মহাতাপের ওই মাঠের মধ্যেই ঘুরিবার কথা! এই সকালবেলাতেও সে ঘুরিয়াছে; মারপিট করিয়া মাথা ফাটাইয়াছে।

কিন্তু আর তাহার সে ইচ্ছা নাই। পাগল, মাঠের সীমানার প্রান্তে একটা গাছে চড়িয়া ডালে বসিয়া পা ঝুলাইয়া গান ধরিল—

"এ সংসারে কেবা কার মন,
কেবা তোমার তুমি বা কার?
আমার আপন জনা যে জন
কে জানে হায় ঠিকানা তার?"

দুই কলি গাহিয়াই তাহার কি মনে হইল; সে লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল এবং হনহন করিয়া আলপথ ধরিয়া হাঁটিয়া আসিয়া নিজের জমিগুলি যেগুলিতে সে দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া দুনীতে তুলিয়া জল ভরিতেছিল, সেই জমিগুলির বাঁধ পায়ে লাথি দিয়া ভাঙিয়া দিল। জল বাহির হইতে লাগিল। সে সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল—বিষয়! বিষ—বিষ! যা! বিষ বেরিয়ে যা! ধান মরে যাক! মরে যাক!

চারিপাশে মাঠেও চাষীরা অবাক হইয়া গেল। ছোট মোড়লের এ কি মতি? ইহাদের অধিকাংশই মজুর-শ্রেণীর লোক, ধান বাঁচাইবার জন্য মাঠে আসিয়া বুক দিয়া পড়িয়াছে। পুকুরে পুকুরে দুনী বসাইতেছে। নালা কাটিতেছে। খাওয়া-দাওয়া মাঠেই। মাঠেই রাত্রি কাটিবে। কড়া পচাই মদের ভাঁড়ে চুমুক দিতেছে, কড়া তামাক টানিতেছে আর খাটিয়া চলিয়াছে। মহাতাপদের কৃষাণ নোটনও মাঠে ছিল। সে ছুটিয়া আসিল। সে মদের হাঁড়িতে চুমুক দিতেছিল; সেটা হাতে করিয়াই সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ছোট মোড়ল! ছোট মোড়ল!

মহাতাপ বলিল, যাক যাক, বিষ বেরিয়ে যাক।

নোটন হাঁড়িটা আলের উপর রাখিয়া ভাঙা আল বাঁধিতে লাগিল। মহাতাপের নজর পড়িল হাঁড়িটার দিকে। সে হাঁড়িটা তুলিয়া নাক সিঁটকাইয়া মুখ ঘুরাইতে বাধ্য হইল। আবার জোর করিয়া মুখ ফিরাইল। সে খাইবেই।

নোটন সবিস্ময়ে বলিল, কি, হচ্ছে কি? মদ খাবা নাকি?

—খাব। খাব।

—এই দেখ, বাড়িতে বকবে।

—বাড়ি? আমি আর বাড়ি যাব না।

বলিয়া চুমুক দিল ভাঁড়ে।

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা তুলিয়া মোড়লেরা একদিকে পূজার আয়োজন করিতেছিল, অন্যদিকে জমিতে জলের কথা হইতেছিল।

বিপিন, সেতাব, রামকেষ্ট এবং আরও মোড়লেরা বসিয়া আছে। ঘোঁতনও আসিয়া জুটিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে টিকুরীর খুড়ী এবং আরও দুই-তিনজন প্রবীণা মিলিয়া কেহ ঝাঁটা বুলাইতেছে, কেহ পূজার বাসনগুলিতে জল বুলাইতেছে অর্থাৎ ধুইতেছে। একজন খড়ের দড়িতে আমের শাখা পরাইতেছে। গোটা কয়েক ছেলে রঙীন কাগজ কাটিয়া শিকল তৈয়ারী করিতেছিল। একজন একখানা কাগজে মোটা হরফে লিখিতেছিল—যাত্রাভিনয়। এক পাশে বসিয়াছিল ঘোঁতন।

বিপিন বলিতেছিল, তা পূজার কটা দিন যাক। তারপরেতে ক্যানেল আফিসে চল। জল যখন আসছে ক্যানেলে, তখন মাঠে এখনও খাল আসে নাই বলে জল দেবে না, ই তো হয় না। জল দেক। আমরা কোন রকমে নিয়ে আসব।

ঘোঁতন বলিয়া উঠিল, সে দেবে না। পরম বিজ্ঞভরে সে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

বিপিন ঘাড় ঘুরাইয়া ঘোঁতনকে দেখিয়া বলিল, কে বটে? ঘোঁতন। ই তাই বলি এমন বিজ্ঞ মানুষটা কে? ইউনিয়ন কোর্টের উকিল কি না? আইন একেবারে ঠোঁটস্থ। দেবে না। ক্যানে দেবে না? তুই এখানে কোথা? অ্যাঁ?

সেতাব বলিব, ও আমাব কাছে এযেচে।

—তোমার কাছে। তা বেশ। এসেছে বেশ করেছে। তা ই সব কথার মধ্যে ও ক্যানে? আমাদের কথা আমরা বুঝব। সব তাতেই ওর পাক মারা চাই। দেবে না। চল সব জোট বেঁধে যাই। বলি, ক্যানেল যখন ধান বাঁচাবার জন্যে; তখন ক্যানে দেবেন না মশাই? না কি হে?

রামকেষ্ট শিবকেষ্ট এবং অন্যান্য মোড়লেরা সায় দিয়া বলিল, সেই কথাই ভাল। গেরামসুদ্ধ লোক যাবে—

সেতাব উঠিয়া পড়িল। তার এসব ভাল লাগিতেছে না। তাহারও সংসার বিষ হইয়া গেছে।

সে ডাকিল, ঘোঁতন।

ঘোঁতন উত্তর দেবার পূর্বেই বিপিন বলিল, উঠলে যে সেতাব?

—কি করব? আমার জলে দরকার নাই। মরে যাক ধান, জলে যাক মাঠ। যা হবে হোক। বুঝেচেন।

শিবকেষ্ট বলিল, সেতাবের জমিতে জল আছে। সে মহাতাপ করে রেখেছে আগে থেকে। ওর ভাবনা নাই।

ওহে।—বলিয়া সেতাব চিৎকার করিয়া উঠিল। তারপরই কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল। বলিল, থাক সে সব কথা। আমার কথা আমার মনেই থাক্। বলিয়া সে খানিকটা চলিয়া গেল। কিন্তু একটা কথা মনে হতেই সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হঁ্যা, আর একটা কথা জ্যেঠা। আমার পরিবার তো পূজার বরণের ডালা ধরে ; তা এবার অন্য লোক দেখুন। সে ধরবে না।

ওদিক হইতে টিকুরীর খুরী সর্বাগ্রে বলিয়া উঠিল, তা ভাল, তা ভাল বাবা। আমরা বলতে পারছিলাম না। এ সুমতিটি ভাল হয়েছে তোমার।

বিপিন দৃঢ়স্বরে বলিল. কি বলছ কি গো টি:রীর বউমা ?

—ন্যায্য কথা বলছি। মোড়ল কি কালা না কি ? কানে কথা যায় না ?

—না। যায় না। অন্যায় কথাগুলান বোলো না।

সেতাব বলিল, ন্যায়-অন্যায় বিচারে কি কাজ জ্যেঠা ? তার দেহ ভাল নয়, মন ভাল নয়—

—ক্যান রে। মন ভাল লয় ক্যানে ? মহাতাপ নিজের ছেলে বড় বউকে দিয়েছে শুনলাম, তবু মন ভাল লয় ? বাবা রে, দেওরের কি ভালবাসা ?

খুড়ী !—সেতাব কঠিন স্বরে বাধা দিয়া বলিল, মহাতাপের ছেলে আমি নেব ক্যান ? আমার কপালে থাকে—

—হবে না রে বাঁজার ছেলে কার্তিক ঠাকুরের বাবা এলে। চাঁপাডাঙার বউয়ের কোঁক ফলবে না।

বাধা দিয়া সেতাব বলিল, চাঁপাডাঙার বউয়ের কপালের নেকনই তো একটি নেকন নয় খুড়ী। আমার কপালের একটা নেকনও তো আছে !

সেতাব হন হন করিয়া পথে নামিয়া গেল। ঘোঁতন বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও !

সে সেতাবের সঙ্গ লইয়া বলিল—আচ্ছা কথাটা তুমি বলেছ ! ঠিক বলেছ ! পরের ছেলে নিজের সাধ মেটে ? মেটে না। মেয়ের অদেষ্ট আর পুরুষের অদেষ্ট এক নয়। বিয়ে করবে তুমি পুটিকে ? দেব। আমি দেব। বল তুমি।

সেতাব কথা বলিতে গেল কিন্তু পারিল না। অন্তর তাহার লালায়িত। কিন্তু চাঁপাডাঙার বউ ! চাঁপাডাঙার বউ ! ওঃ সে যেন পাগল হইয়া যাইবে !

ঘোঁতন পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিজে একটা মুখে গুঁজিয়া একটা সেতাবকে দিল, বলিল—খাও।

—সিগারেট ?

—হঁ্যা। লাও ধরাও।

সে দেশলাই জ্বালিল।

ঘোঁতন আবার বলিল—ওই যে বললে, ন্যায় অন্যায় বিচারে কাজ কি জ্যাঠা? খুব বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ। কথাটা যখন পাঁচজনে বলছে, সন্দেহ যখন—

সেতাব বলিল—চুপ কর ঘোঁতন! চুপ কর। ওরে তুই চুপ কর। সে রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

পথে নামিতেই দেখা হইল নোটনের সঙ্গে। নোটন বলিল—বড় মুনিব! ছোট মুনিব—

—ছোট মুনিবের কথা আমি কিছু জানি না। সে চলিতেই লাগিল।

সে চলে গেল—

নোটনও সঙ্গ ধরিয়া পিছন হইতে কথা বলিতেছিল। মহাতাপ মদ খাইয়া মাঠ হইতে চলিয়া গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে, সে বিবাগী হইবে। নোটন কোনমতেই তাহাকে ফিরাইতে পারে নাই।

যাক—যাক—যাক।

—ওগো, নেশা করে—

—করুক, মরুক; উচ্ছনে যাক, চুলোয় যাক। যা বলবার বল্‌গা বড় বউকে।

—তিনি কথা বললে না।

—তবে ছোট বউকে বলগা।

—সেও বললে, জানি না।

—আমিও জানি না। বুঝলি! আমিও জানি না।

সেতাব আর কথা না শুনিয়া হনহন করিয়া চলিতে লাগিল।

ঘোঁতন ডাকিল, দাঁড়াও হে! দাঁড়াও।

সেতাব যেন ছুটিয়া পলাইতে চাহিতেছে। কোথায় সে তাহা জানে না।

মহাতাপ তখন প্রান্তরের মধ্যে একটা গাছতলায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নেশায় সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের বাড়িতেও সেই অবস্থা। বড় বউ তেমনি ভাবে উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। ছোট বউ আপনার ঘরে মানিককে লইয়া বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছে। শরতের আকাশ নীল, মেঘের দুই-একটা টুকরা মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া যাইতেছে। বৃষ্টির কোন লক্ষণ নাই।

অপরাহ্ণ গড়াইয়া আসিল। তবু বড় বউ উঠিল না, মানু বাহির হইল না, মহাতাপ ফিরিল না, সেতাবও সেই গিয়াছে—এখনও ফেরে নাই।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নির্মল নীল শরৎ আকাশের ষষ্ঠীর চাঁদের জ্যোৎস্না উঠানে ঘরের চালে গাছের শাখায় পল্লবে স্বপ্নলোকের শোভা জাগাইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে আলো যেন স্বপ্নে দেখা রহস্যপুরীর আলোর মত স্পষ্ট অথচ আবছা, আবছা অথচ স্পষ্ট। আকাশে ষষ্ঠীর চাঁদ, সন্ধ্যাতেই একেবারে সিকি আকাশ পার হইয়া ফুটিয়া উঠে। যেন আকাশের নীল সায়রের তলা থেকে মাথা তুলিয়া হাসিতে থাকে। চাঁদের আশেপাশে তারা ফুটিয়াছে। অসংখ্য—সংখ্যা নাই, সীমা নাই, এক তারা উকি-ঝুঁকি, দুই তারা ঝিকিমিকি, তিন তারা ঘোর নামে, চার তারা পাখি থামে, পাঁচ তারা পঞ্চদীপ, ছয় তারা শাঁখ বাজে, সাত তারা সাতভেয়ে, আট তারা অরুন্ধতী, ন তারা অন্ধকার, দশ তারাতে একাকার—গুনিতে গুনিতে দশ তারা ফুটিতেই অগুন্তি তারা ফুটিয়া উঠে, আর গণনা করা যায় না। তাই উঠিল। তবু মণ্ডলবাড়িতে কেহ উঠিল না, আলো জ্বলিল না, রান্না চড়াইল না, বাহির দুয়ার খোলা হাঁ-হাঁ করিতে লাগিল। ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবীর আবাহন অভিষেক হইয়া গেল, ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি বাজিয়া থামিয়া গেল। সতাব সেখানকার কাজ সারিয়া এতক্ষণে বাড়ি ঢুকিল। ষষ্ঠীর আবছা জ্যোৎস্নায় স্তব্ধ বাড়িখানা যেন শোকাতুরা সদ্য বিধবার মত বিষণ্ণ নির্বাক হইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া বসিয়া আছে। সেতাব ঘরে ঢুকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—এ কি।

কেহ উত্তর দিল না।

সেতাব আরও চটিয়া বলিল, বলি কাণ্ড-কারখানাটা কি? ঘরে আলো নাই! উনোন জ্বলে নাই, ষষ্ঠীকৃত্যের দিন। শুভদিন! সব মরেছে নাকি?

বড় বউ দাওয়ার উপর শুইয়া ছিল; সেতাব তাহাকে [illegible] ঠাওর করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—শুনতে পাও না?

কাদু ক্লান্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওগো আর আমি পারছি না। আমাকে তুমি মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও।

—ভাল। দেব। তাই দেব। ভাল করেই দেব। তাই হবে।

বলিয়া সে উপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

—একটা কথা বলি। যতক্ষণ আছি ততক্ষণ বলতে হবে।

কি?

মহাতাপ সেই দুপুরে না খেয়ে চলে গিয়েছে। সেই ফাটা মাথা নিয়ে। এখনও ফেরে নি।

—তার কথা আমি জানি না।

—তোমার মায়ের পেটের ছোট ভাই।

—আমার শত্রু; তা ছাড়া সে কচি খোকা নয়।

—জেনেশুনেও একথা বলছ তুমি?

—বলছি! বলছি! বলছি! সে আমার শত্রু, তুমি আমার শত্রু, ঘর দোর সব আমার বিষ। আগুন। শ্মশান।

বলিয়া সে চলিয়া গেল।

যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া বাহিরেব দরজাটা বন্ধ করিল এবং হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

মানদা আপনার বন্ধ ঘরের দরজার গায়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। বাঘিনীর মত চোখ দুইটা তাহার ক্রোধে জ্বলিতেছিল—এবং সে ক্রোধের সবটাই গিয়া পড়িতে চাহিতেছে ওই বড় জায়ের উপর। সেই তাহার অদৃষ্টকে ওই মহাতাপের মত পাগলের অদৃষ্টের সহিত জড়াইয়া দিয়াছে। গরীবের মেয়ে সে। সেই দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া তাহার পিতৃ-কুলের জাতিকন্যা হিসাবে হিতৈষিণী সাজিয়া স্বচ্ছল অবস্থার লোভ দেখাইয়া মহাতাপের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধে তাহার বাপকে রাজী করাইয়াছিল। প্রথম প্রথম বড় বউয়ের স্নেহ যত্ন, মহাতাপের সঙ্গে তাহাব অন্তরঙ্গতা মানদার ভালই লাগিত। ক্রমে ক্রমে চোখ খুলিয়া সে আজ দিব্য দৃষ্টি পাইয়াছে। বুকের ভিতর তাহার আগুন জ্বলিয়াছে। সেই আগুন চোখের দৃষ্টির মধ্যে দিয়া বাহির হইয়া সব কিছুকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া খাক করিয়া দিতে চাহিতেছে! আজ এই দুর্গাষষ্ঠীব দিন তাহার নাড়ী-ছেঁড়া ধন একটি সন্তান তাহার, তাহাকে মহাতাপ দান করিয়া দিল ওই বন্ধ্যা নারীকে! বন্ধ্যা নারীর দৃষ্টি-আকাজ্ঞা বড় প্রবল, আকর্ষণ দুর্নিবাব। ইহার জন্য যদি—

সে আর ভাবিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া মানিককে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, হে মা ষষ্ঠি! পাগল মানুষ মায়াবিনীর মায়ায় ভুলে বলেছে—দান করলাম ছেলে। আমি বলি নাই মা, আমি বলি নাই। হে মা! রক্ষা করো তুমি।

সে ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বালিশে মুখ গুঁজিল।

আপন ঘরে সেতাব উত্তেজিত মনে অন্ধকারের মধ্যে চালের কাঠের দিকে চাহিয়া জাগিয়া ঘুমন্তের মত পড়িয়া ছিল। মনে মনে তাহার অনেক আলোড়ন, অনেক চিন্তা, অনেক কল্পনা।

বাহিরের পথে চৌকিদারের হাঁক উঠিল। ও—ওই—

কয়েক মিনিট পর চৌকিদারটা বাড়ির দরজায় আসিয়া ডাকিল—বড় মোড়ল! বড় মোড়ল।

সেতাব হাঁকিল—হ্যাঁ, জেগেছি।

চৌকিদারটা বলিল, তোমাদের ছোট মোড়ল, ওই খিড়কির পুকুরের গাছের তলায় বসে কাঁদছে।

—কাঁদুক। তুই যা।

তবু সেতাব উঠিয়া বসিল।

কথাগুলা মানদাও শুনিয়াছিল। সেও উঠিয়া বসিল।

সিঁড়ি বাহিয়া নামিবার মুখেই শুনিল, একটা দরজা খুলিয়া গেল।

দরজা খুলিয়া সেতাব দাওয়ায় আসিয়া দেখিল, বাহিরের দরজাটা খোলা।

দরজা খুলিয়া বড় বউই বাহির হইয়াছে। কি করিবে সে? দুর্নিবার প্রাণের আকর্ষণ লঙ্ঘন করিতে সে পারিয়া উঠে নাই। সেই গভীর রাত্রে একাকিনী নারী অন্ধকার পথ অতিক্রম করিয়া পুকুরের ধারে গাছতলাটিতে আসিয়া মহাতাপের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, ওঠ।

মহাতাপ বলিল, না—না। আমাকে তোমার দরকার নাই। তোমার সব মিছে কথা।

—না—না। কোন মিছে কথা নয়। মিছে নয়—নয়—নয়। হল তো? ওঠ এখন।

—আমাকে ছুঁয়ো না। আমি নেশা করেছি। মদ খেয়েছি।

—শুনেছি। নোটন বলেছে আমাকে।

—আমাকে বকবে না?

—তোমার দোষ কি? সবই আমার অদৃষ্ট। ওঠ, আমার কাঁধ ধরে ওঠ।

মহাতাপকে সে ধরিয়া তুলিল। মহাতাপ তাহার কাঁধে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জান, আমি বিবাগী হয়ে চলে যেতাম। কিন্তু ফিরে এলাম—

বড় বউ অন্ধকারের মধ্যে একটু হাসিল!

পাগল বলিল, তোমার জন্যে ফিরে এলাম—

আর একপাশের অন্ধকার হইতে সেতাব বলিয়া উঠিল, তুমি আর আমার বাড়ি ঢুকো না, আমি বারণ করছি। ঠাঁই না থাকে তো গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে মর।

বড় বউ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং পর-মুহূর্তেই সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন সপ্তমীর সকাল।

সুখের রাত্রি সোনার নূপুর বাজাইয়া চঞ্চলা বিলাসিনীর মত অকস্মাৎ পোহাইয়া যায়। কেমন করিয়া কোন্ দিক দিয়া চলিয়া গেল বুঝা যায় না, ফুরাইয়া গেলে চমক ভাঙে। দুঃখের রাত্রিও দাঁড়াইয়া থাকে না; বিষণ্ণ ক্লান্তি অসহনীয় হইয়া উঠে, মনে হয় রাত্রির পার নাই, শেষ নাই; কিন্তু সেও এক সময় ফুরাইয়া যায়। রাত্রি শেষ হয়। সকাল হয়। মণ্ডলবাড়ির সেই দুঃখের ষষ্ঠীর রাত্রিও শেষ হইল। বড় বউ অচেতন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। জ্ঞান হইয়াছে এই সকালবেলা। 'বাড়ি ঢুকো না' এ কথা বলিয়াও সেতাব এই অবস্থায় তুলিয়া না আনিয়া পারে নাই। পথে পড়িয়া মরিতে দিবার মত অমানুষ সে নয়। অবশ্য পথে পড়িয়া মরিবার কথা নয়। মহাতাপ থাকিতে বড় বউ পথে পড়িয়া কখনও মরিবে না। মহাতাপকে সে কাহুকে তুলিয়া আনিতে দিবে না। কখনও না। একদিন সে বড় সাধ করিয়া ঘরে আনিয়াছিল। নিজেকে ভাগ্যবান ভাবিয়াছিল।

সকালবেলা চাঁপাডাঙার বউ চোখ মেলিয়া চাহিল।

মাথার শিয়রে সেতাব দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া ছিল রাখাল ও বিপিন মণ্ডল। জ্ঞান হইতেছে না দেখিয়া রাখাল এবং বিপিনকে সেতাবই ডাকিয়া আনিয়াছে। রাখাল ভাল হাত দেখিতে পারে, বাজনায় যেমন তাহার দক্ষতা, নাড়ীজ্ঞানও তাহার তেমনি সূক্ষ্ম। রাখাল তাহার হাতখানি দেখিতেছিল, চাঁপাডাঙার বউয়ের জ্ঞান হইতে দেখিয়া সে হাতখানি নামাইয়া দিল। বলিল—জ্ঞান হয়েছে, ভয় নাই। কি মা, চিনতে পারছ সব? মনে পড়ছে?

বড় বউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল।

রাখাল বলিল—এই দেখ। তবে নাড়ী বড় দুর্বল। যেন কদিন খায়-টায় নাই। বুয়েচ না? ভাল করে খেতে দাও। এক বাটি গরম দুধ করে দাও দেখি।

অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বড় বউ মৃদুস্বরে বলিল—মোড়ল জ্যেঠার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

—আমার কাছে? বিপিন মোড়ল এ কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

—আপনার কাছেই। হ্যাঁ।

—বল মা বল! কি বলছ বল!

—আমাকে একখানি গাড়ি ডেকে আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন।

—ক্যানে মা? এই পূজার দিন—

সেতাব আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল—যাবে যাবে; তার জন্যে মোড়ল জ্যাঠাকে ক্যানে? আমিই পাঠিয়ে দোব। হ্যাঁ, দোব। হবে। হবে।

বড় বউ সে কথা গ্রাহ্য করিল না। বলিল—আর আপনারা পাঁচজনে থেকে, ওই মহাতাপকে তার ভাগ বুঝিয়ে দেন। সে পাগল। বিষয়-আশয় হাতে পেলে হয়তো বুঝবে, ঘরে থাকবে, নইলে ও ঘরে থাকবে না। বিবাগী হয়ে যাবে।

সেতাব বলিল, হবে, তাও হবে। এই পূজোর ভেতরেই—চুল-চেরা করে ভাগ করে দোব। পঞ্চায়েৎ ডেকেছি!

বিপিন বলিল, আঃ সেতাব! ছিঃ, তুমিও কি পাগল হলে?

—হয়েছি। হয়েছি। আপনারা সব ভাগ করে দেন। নইলে গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে। বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাখাল ও বিপিন তাহার পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

দাওয়ার উপর তখন মহাতাপ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত দিনের মাথার আঘাতের ফলে এবং সারাদিন অনাচারের ফলে তাহার জ্বর হইয়াছে। এই দেহ লইয়াই কখন বড় বউয়ের চেতনা হইবে—এই প্রত্যাশায় সে দাওয়ায় বসিয়া ছিল। সেখানে বসিয়াই ঘরের কথাগুলি সব শুনিয়াছে। ক্রুদ্ধ উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সেতাব এবং বিপিন বাহির হইয়া আসিতেই সে বলিল—হ্যাঁ। আমার বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দাও। ভাগ করে দাও। ভাগ করে দাও।

সেতাব তাহার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিপিন সে দৃষ্টি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া সেতাবকে ডাকিল—! বাবা!

সেতাব মহাতাপকে বলিল, দোব। সেতাব না থাকলে পেতাপ মোড়লের জমিজেরাত সব দেনার দায়ে নীলেম হয়ে যেত। ভিক্ষা করে খেতে হত। তা হোক, আমার কর্তব্য আমি করেছি। তোর ন্যায্য ভাগ তুই পাবি।

—ঘোতন ঘোষের সঙ্গে সলা করে কত টাকার গয়না বাঁধা নিয়েছ—সে সব হিসেব আমাকে দিতে হবে।

—সে টাকার একটা পয়সা পেতাপ মোড়লের বিষয়ের টাকা নয়। সে আমার পরিবারের গয়না বিক্রি করা টাকা। গাঁয়ের পঞ্চায়েত জানে—বিয়ের সময় পাঁচশো টাকার অলঙ্কার দিয়েছিল শ্বশুর। সে গয়না বেচে দেনা শোধ

করেছি। তাকেই আমি বাড়িয়েছি। সে আমার বিয়ের যৌতুক। আমার নিজস্ব।

মহাতাপ বলিল, বড় বউ সে টাকা তোমাকে দেবে না।

মহাতাপ।—চিৎকার করিয়া উঠিল সেতাব।—বড় বউয়ের নাম তুই মুখে আনিস না। তোকে আমি বারণ করছি। তোকে আমি বারণ করছি।

সে হনহন করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার সঙ্গে বিপিন চলিয়া গেল। শুধু রাখাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল!

মহাতাপ সেতাবের শেষ কথাটায় খানিকটা দমিয়া গিয়াছিল; কেন সে বড় বউয়ের নাম মুখে আনিবে না? কেন? হঠাৎ সেই প্রশ্নটা তুলিয়া সে উঠানে নামিল—ক্যানে? ক্যানে শুনি? ক্যানে আমি বড় বউয়ের নাম মুখে আনতে পাব না, শুনি?

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া মানদা তাহার হাত ধরিল—না, যেতে পাবে না?

উপর হইতে বড় বউয়ের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—মহাতাপ, যেয়ো না, ঘরে গিয়ে শোও। আমার দিব্যি, আমার মরা মুখ দেখবে।

মহাতাপ দাঁড়াইয়া গেল।

এতক্ষণে রাখাল বলিল—ছোট বউমা, চাঁপাডাঙার বউকে একটু দুধ গরম করে দাও বাপু।

ছোট বউ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে মহাতাপের পায়ের কাছে প্রায় পাগলের মত হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল. মাথা খুঁড়ে মরব আমি।

রাখাল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া সে দেখিল. সেতাব বসিয়া পত্র লিখিতেছে। দাঁড়াইয়া আছে নোটন। চিঠিখানা শেষ করিয়া সে পড়িয়া লইল—

কল্যাণবরেষু,

শ্রীমাণলাল পাল অত্র পত্রের ব্যাপার জরুরী জানিবে। তুমি পত্রপাঠ লোক মারফত চলিয়া আসিবে। এখানে তোমার ভগ্নী কিছুতেই থাকিতে পারিতেছে না। আমরা ভায়ে ভায়ে পৃথকান্ন হইতেছি। এ সময় চাঁপাডাঙার বউকে ওখানে লইয়া না গেলে কোন মতেই চলিবে না। তুমি পত্র পাঠ আসিবে। অন্যথায় চাঁপাডাঙার বউকে হয়তো একাই পাঠাইয়া দিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে আমাকে দোষ দিলে চলিবে না। ইতি—

শ্রীসেতাবচন্দ্র পাল

পড়িয়া দেখিয়া চিঠিখানি মুড়িয়া নোটনের হাতে দিয়া বলিল, চলে যা। কাল মণিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। খবরদার, কোন কথা ভাঙবি না।

নোটন চিঠিখানা লইতে হাত বাড়াইল।

রাখাল বলিল, সেতাব!

—ফ্যাচফ্যাচ করিস না রাখাল। পিছু ডাকিস না। বাড়ি যা।

—ওহে, চাপাডাঙাব বউমাকে—

—রাখাল, তু বাড়ি যা।

রাখাল থামিয়া গেল। ভয় পাইল।

সেতাব চিঠিখানি নোটনের হাতে দিয়া বলিল—তু সব বলবি। যা ঘটেছে মুখে বলবি। বুঝলি?

রাখাল চলিয়া গেল এবার।

সেতাব আবার বলিল—যাবার পথে ঘোঁতনকে—ঘোঁতনকে বলবি, আমি ডেকেছি। আমি ডেকেছি।

নোটন তবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেতাব বলিল—কি? দাঁড়িয়ে রইলি যে?

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে সানাই ঢোল ঢাক বাজিয়া উঠিল। সপ্তমী পূজার ঘট আনিবার সময় হইয়াছে।

সেতাব আবার বলিল, নোটন!

এবারে নোটন বলিল, ওই শোন, পূজার ঢাক বাজছে। ঘট আসছে মোড়ল। সে সব বুঝিয়াছে।

সেতাব রূঢ়কণ্ঠে বলিল, নোটন!

নোটন পুরানো লোক, এই ঘরের সুখদুঃখের সঙ্গে তাহার জীবনটা জড়াইয়া গিয়াছে শত পাকে সহস্র বন্ধনে। সে বলিল, যা করবে পূজার পর কোরো। মোড়ল, আজ সপ্তমী পূজোর দিন, ঠাকুরুনের ঘট আসবে, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী পাতবে, আজ ঘর ভাঙার ধুয়ো তুলো না। বেসজ্জনের বাজনা বাজিও না।

সেতাব তাহার হাতের চিঠিটা লইতে উদ্যত হইল। বলিল, তুই যাবি কি না বল?

নোটন তাহার ছাতাখানা সরাইয়া লইয়া বলিল, যাব। তুমি মনিব। কথা শুনতে হবে আমাকে। চললাম আমি। কিন্তু মাঠে ধান মরছে, সোঁ সোঁ ডাক ধরেছে মাটিতে। জল নাই। জল হবে না। আকাশের জল হবে না। এ আমি বললাম তোমাকে। যা হয় কোরো!

সে চলিয়া গেল।

পথে একটি বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া তখন বহুবল্লর্ব বাউল একতারা এবং বাঁয়া বাজাইয়া গান ধরিয়াছিল—

কমল-মুখ শুকায়ে গেছে, আয় মা আয় মুছায়ে দি,
মায়ের কোলে শয়ন কর মা, শীতলপাটী বিছায়ে দি॥

বল বল মা কানে কানে
কি দুঃখ পেলি কোমল প্রাণে
শ্মশান তাপে জ্বলছে দেহ,
আঁচল-বায়ে ঘুচায়ে দি।
আয় মা মুখ মুছায়ে দি।

আগমনী গানের বাৎসল্য রস অনাবৃষ্টি-শুষ্ক শরতের আকাশের উত্তপ্ত নীলিমাকে সকরুণ করিয়া তুলিয়াছিল।

বড় বউয়ের কানে ওই গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। এ গান যেন দূর চাঁপাডাঙায় বসিয়া তাহারই মা গাহিতেছে। সে তো যাইবে। এ বাড়ির মেয়াদ তাহার ফুরাইয়াছে। সে কথা সে জানিয়াছে। তাহার নিজের চিত্তের সকল মায়া সব মমতাই কাটিয়াছে। তাহার স্বামীরও কাটিয়াছে। সব ভালবাসা মায়ানদীর মত শুকাইয়া গিয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেই মরুভূমির বুকের মধ্যে সেতাবের অন্তরের রূপটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে চায় নূতন ঘর, নূতন সংসার, নূতন—

হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহার মুখে। তাহার প্রতি এই কদর্য সন্দেহ একান্ত ভাবেই মিথ্যা। এতকাল এইভাবেই তো ঘর করিয়া আসিল সে। এমনি ভাবেই তো সে মহাতাপকে স্নেহ করিয়াছে, এমনিভাবেই তো মহাতাপ আবদার করিয়াছে! কই এতকালের মধ্যে এমন সন্দেহ হয় নাই। হঠাৎ আজ, আজ কেন হইল? ওই তাহার নূতন গোপন সাধটা তাহার চোখে ঠুলি পরাইয়া দিয়া সংসারটাকে কালো করিয়া দেখাইয়া তাহাকে জোর দিতেছে।

ঠিক এই সময়েই কে ডাকিল, বউমা!

চমকিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ। সে সবিস্ময়ে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল।

সিঁড়ির নীচে হইতে আগন্তুক কথা বলিল, আমি মা, রাখাল।

চাঁপাডাঙার বউ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

রাখাল উঠিয়া আসিল; সে একা নয়, তাহার সঙ্গে একটি আট-ন বছরের মেয়ে। তাহার হাতে এক বাটি দুধ। রাখাল বলিল, তোমার জন্যে

দুধটুকু নিয়ে এলাম মা। খাও তুমি। দে মা খেঁদী, খুড়ীমাকে দুধের বাটিটা দে।

চাঁপাডাঙার বউ মাথার ঘোমটাটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, পূজার ঘট আসছে। আমাকে লক্ষ্মী পাততে হবে তার আগে তো খাব না।

—মা, এই দেহে তুমি মাথা ঘুরে আবার পড়ে যাবে।

—না। পারব আমি। খুব পারব।

সে ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া উঠিল দাঁড়াইল। বলিল, তুই রাখ্ খেঁদী, আমি লক্ষ্মী পেতে এসে খাব।

রাখাল বলিল, খেঁদী, তুই সঙ্গে যা। বুঝলি, সঙ্গে যা।

ওদিকে ঢাক ঢোল সানাই কাঁসির শব্দ উচ্চ হইয়া উঠিল। চণ্ডীমণ্ডপে ঘট আসিল। শাঁখ বাজিল, উলু পড়িল।

চণ্ডীমণ্ডপে এবার পূজার আয়োজন সবই হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ নাই, সমারোহ জমিয়া উঠিতেছে না। সব যেন বিষণ্ণ চিন্তাভারক্লিষ্ট। আকাশে জল নাই, চাষীর দৃষ্টি আকাশের দূর-দিগন্তে চিত্ত উদ্বেগকাতর। তাহার উপর সেতাবদের এই কলহটাও একটা বেদনাতুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ছেলেরা শুধু ছুটছুটি করিতেছে। তাহার মধ্যে মানিকও বসিয়াছে। তাহাকে আনিয়াছে গোবিন্দ। খালি গা, জামাও কেহ একটা পরাইয়া দেয় নাই। সে একটা নবীন বাঁশি লইয়াই খুশী আছে। সেইটাই সে বাজাইতেছে—পুঁ। পুঁ-পুঁ। বাজাইতেছে আর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মণ্ডলেরা বসিয়া আছে, তামাক টানিতেছে, কিন্তু আসর ঝিমাইয়া গিয়াছে। কেহ বড় একটা কথা বলে না। চেঁচাইতেছে শুধু টিকুরীর খুড়ী।

অবিশ্বেস অনাচার, অবিচার—বলি এর চেয়ে পাপ আরকি হবে? বলি ইয়েতে কি ধর্ম থাকে, না দেবতা তুষ্ট হয়। মোড়লেরা কি সব ধর্মজ্ঞান চিবিয়ে খেয়েছে না কি? বলি পূজা করা কেনে?

বিপিন মণ্ডল সোজা হইয়া বসিল। বলিল—টিকুরীর বউ, তুমি এমন করে চেঁচাও কানে গো? বলি এমন করে চেঁচাও কানে গো?

—চেঁচাবে না? বলি মোড়লেরা যে চোখের মাথা খেয়েছে। বলি সেতাবের বাড়ি থেকে এখনও পুজো এল না, সেদিকে নজর আছে?

পাঁচ আনার অংশীদার সেতাব চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে রাস্তার উপর ঘোঁতনের সঙ্গে কথা বলিতেছিল।

বিপিন মণ্ডল বিস্মিত এবং ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রতি বৎসর পূজায় চাঁপাডাঙার বউ ষষ্ঠীর সন্ধ্যা হইতে দশমী পর্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপে সারাক্ষণ হাজির

থাকিয়া সকল অনুষ্ঠান নিখুঁত করিয়া নির্বাহ করিয়া দেয়। সেতাবের দৃষ্টিও এদিকে খুব প্রখর। ভাগের ব্যাপারে সে সকল ভাগীর পূজা বুঝিয়া লয়, নিক্তির ওজনে মাপিয়া বুঝিয়া লইয়া ছাড়ে। একুশ সের আতপের নৈবেদ্য বরাদ্দ আছে। সেতাব চণ্ডীমণ্ডপে মাপের সের হাতে করিয়া বসিয়া থাকে। সর্বাগ্রে চাঁপাডাঙার বউ তাহাদের একের তিন অংশের সাত সের আতপ, সোয়া পাঁচ গণ্ডা রম্ভার ভাগ সাতটা রম্ভা, সোয়া পাঁচ পো চিনির সাত ছটাক চিনি, তাহার সঙ্গে আনুষাঙ্গিক পূজার জিনিসগুলি একটি ডালায় গুছাইয়া সাজাইয়া লইয়া আসিয়া নামাইয়া দেয়। সেতাব সব বুঝিয়া লইয়া হাঁকাহাঁকি করে—কই সব, কই গো! ভাগীদাররা সব ঘুমুচ্ছে না কি?

এবার তাহাদের বাড়িতে একটা আকস্মিক কলহ বাধিয়া উঠিয়াছে, তবু পূজা আসিবে না—এ কথা কল্পনা করিতে পারে নাই। চাঁপাডাঙার বউয়ের অবস্থাও বিপিন নিজে দেখিয়া আসিয়াছে; সেতাবও কথা'র মধ্যে অনেক কিছু বলিয়াছে, তাহার অবশ্য আজ বাহির হইবার কথা নয়, সামর্থ্যও নাই। কিন্তু সেতাব আছে, ছোটবউ আছে।

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল—সেতাব!

রাস্তার উপর হইতে সেতাব উত্তর দিল—যাই।

—যাই নয়। বাড়ি যাও। পূজার সামিগ্যিরি আসে নাই। পাঠিয়ে দাও।

টিকুরীর খুড়ী হাঁকিয়া বলিল—তোমাদের ছোট বউকে পাঠিয়ে দিও বুঝলে বাবা! বড় বউকে পাঠিও না!

ঠিক সেই মুহূর্তেই চণ্ডীমণ্ডপের পিছন দিক দিয়া প্রবেশ করিল পুটি ও বড় বউ। পুটি স্নান করিয়াছে, বড় বউও স্নান করিয়াছে। পুটির হাতে পূজার সামগ্রীর ডালা। সে আসিয়া ডালা নামাইয়া দিল।

পুটিকে তাহার মা পাঠাইয়া দিয়াছে। পাঠাইয়াছে গুজবের কথাটা বলিতে। বলিয়াছে, লজ্জা করলে চলবে না। বলবি। কাদু আমার পেটের মেয়ের অধিক। কিন্তু কাদুর অবস্থা দেখিয়া পুটি সেকথা বলিতে পারে নাই। বলিয়াছে পূজো দেখতে এলাম দিদি তোমার বাড়ি। কাদু পূজা সামগ্রীর ডালাটা তাহার হাতেই দিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

বড় বউকে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। এত বড় ঘটনা গ্রামে চাপা থাকিবার কথা নয়, সেতাব নিজেই চেঁচামেচি করিয়াছে। ইহার পরও বড় বউ আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবে, এ কথা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই।

পুটি পূজার ডালাটা নামাইয়া দিল। বড় বউ গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল!

সমস্ত চণ্ডীমণ্ডপটা কয়েক মুহূর্তের জন্য এমন হইয়া রহিল যে সূচ পড়িলেও শুনা যায়।

প্রণাম সারিয়া উঠিয়া বড় বউই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বলিল—আমাদের পুজোর সামগ্রী। দেখে নাও, কে দেখছ?

এবার টিকুরীর খুড়ী মুখ খুলিল। সে বলিল, আমি দেখে নিচ্ছি, তা—। ডালাটার দিকে একবার তাকাইয়া আবার পুটির দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাঁপাডাঙার বউকে ছুঁয়েছিস না কি পুটি?

বড় বউ দাঁড়াইয়া বলিল—মোড়ল-বাড়ির ভাঁড়ার এখনও আমার হাতে টিকুরীর খুড়ী। সেখানে লক্ষ্মী পেতে নিজে হাতে সামগ্রী বার করে সাজিয়ে নিজেই নিয়ে আসছিলাম। পুটি হঠাৎ এসে পড়ল। তুলে নাও। তোমাদের 'না' বলায় হবে না। 'না' বলতে হয় বলবেন ওই দেবতা। বলিয়া নিজেই সমস্ত সামগ্রী প্রতিমার সামনে নামাইয়া দিয়া বলিল—'না' বলতে হয় তুমি বল মা। আর কারুর কথা আমি শুনব না। আমার হাতের পুজো অশুদ্ধ যদি হয় তবে বজ্রাঘাত কর আমার মাথায়, না হয় সর্পাঘাত হোক আমার। না হয় নিজের হাতের খাঁড়াটা দিয়ে আমার বুকে মার। সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। শুধু বিপিন চিৎকার করিয়া উঠিল—বউ মা। বউ মা। বউ মা।

বড় বউ কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া পুটিকে বলিল—চল্ পুটি। তাহারা দুইজনে চলিয়া গেল।

টিকুরীর খুড়ী বলিল—গঙ্গাজলের ঘটিটা কই? অ-ইন্দেশের বউ।

সেতাব রাস্তার উপর হইতে উঠিয়া আসিয়া বিপিনকে বলিল—আজ সন্ধ্যেবেলা তা হলে আমার ভাগের কাজটা সেরে দেন।

—আজ? সেতাব—

—না জ্যেঠা, আজই। আজই। আজই। এ কেলেঙ্কারি আমি আর সইতে পারছি না।

তাহাই হইল।

পঞ্চায়েত বসিয়া সেতাবের বিষয় ভাগ করিয়া দিল। সেতাবের হিসাবের কাজ বড় পরিষ্কার, কাগজপত্রে খুঁত ছিল না; এবং জমিগুলির মধ্যে কোন্ জমি কেমন ইহাও মোড়লদের কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। জমি পুকুর ভাগ কাগজ লইয়া বসিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই হইয়া গেল।

শেষের দিন বাসন-কোসন ভাগ হইল এবং বাড়ির উঠানে দড়ি ধরিয়া মাপিয়া ঘর ভাগ করিয়া দিল পঞ্চায়েত মণ্ডল। পঞ্চায়েতেরা বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল সেতাব মহাতাপ দুই জনে দুই দিকে দাঁড়াইল। মানিক বাঁশিটা বাজাইয়া ফিরিতেছে—পু-পু-পু। বউয়েরা দুজনেই ঘরের ভিতর।

ভাগের ব্যাপারে সেতাব কথা বলিল না। গোড়াতেই সে বলিয়াছে—আগে ওই বেছে নিক। শেষে আমি ঠকিয়েছি—এ কথা শুনব না।

উঠানে দড়ি ধরিয়াছিল একদিকে রামকেষ্ট অন্যদিকে আর একজন। বিপিন বলিল—বল এখন কে কোন্ দিক নিবে? এ দিকের ঘরখানা ভাল. তেমনি ওদিকে রান্নাঘর করে নিতে হবে। সেতাব—?

মহাতাপ উঠিয়া আসিয়া বলিল—ভাল ঘর আমি নোব।

সেতাব হাসিয়া বলিল—তাই নেক। আমি পুরোনো ঘরই নিলাম।

মহাতাপ নূতন ঘরের দাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিয়া বলিল—বাস।

সেতাব বলিল আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি কাঁচা ইট রাজমজুর ঠিক করে রেখেছি। মাটির দেওয়াল দিতে দেরি হবে। ইটের গাঁথনি আজই দেবে। —আয় রে! ওরে! শুনছিস!

কয়েকজন মজুর আসিয়া ঢুকিল। সেতাব বলিল—ওর মুখ আর আমি দেখব না।

মহাতাপ হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া বলিল—গয়না যা বাঁধা নিয়েছ তার হিসেব কই? বিপিন জেঠা!

সেতাব বলিল—সে তো আমার বিয়ের যৌতুক।

—সে তো বড় বউয়ের গয়না। বড় বউকে তো নেবে না।

—সে আমি বুঝব। তা নিয়ে তোর ওকালতি করতে হবে না।

—আলবাত হবে।

বিপিন বলিল—মহাতাপ, তুমি মিছে চেঁচামেচি কোরো না।

ঠিক এই সময়েই বড় বউয়ের ভাই মণিলাল আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। মহাতাপ চিৎকার করিয়া বলিল—ওই ওই বড় বউয়ের ভাই এসেছে. নোটন আনতে গিয়েছিল।

মণিলাল আসিয়া সেতাবকে প্রণাম করিল। বয়সে বড় বউ অপেক্ষা বছর তিনেকের ছোট। বেশ স্বাস্থ্যবান। চাষীর ছেলে। প্রণাম করিয়া বলিল—এ সব কি বললে নোটন, জামাই-দাদা?

—তোমার ভগ্নীকে নিয়ে আমার ঘর করা অসম্ভব মণিলাল।

বিপিন আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল—সেতাব, এ কাজ তুমি হঠাৎ কোরো না। সেতাব?

—না। সে আর হয় না জ্যেঠা। মণিলাল, তুমি তোমার ভগ্নীকে নিয়ে যাও। গাড়ি আমি ঠিক করে রেখেছি।

মহাতাপ ঘাড় নাড়িয়া বিজ্ঞের মত বেশ উল্লাসের সঙ্গেই বলিল—আমিও রেখেছি, গাড়ি ঠিক করে আমিও রেখেছি। হাঁ আমিও মহাতাপ। হাঁ।

সে বেশ অহঙ্কারের সঙ্গেই, যাহাকে বলে দর্পভরে পদক্ষেপ, তেমনি পদক্ষেপে কর্মরত মজুরওয়ালার কাটা দেওয়ালের ভিতরটার চারিদিকে বেড়াইয়া আসিল। যেন লাঠি খেলোয়াড় পাঁয়তারা ভাজিতেছে। সেই ভাজিবার মুখে তাহার চোখে পড়িল মানদা কখন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া এক ভাগ লইয়া গুছাইতেছে। মহাতাপ থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর বলিল—নেহি নেহি নেহি।

মানদা থমকিয়া গেল। তারপর ঘোমটা টানিয়া চাপা গলায় বলিল—কোনটা আমাদের?

ওইটাই। ওইটাই মহাতাপ নিচ্ছে।—বলিল বিপিন।

কেন?

মহাতাপ কাছে আসিয়া বলিল,—তোকে ছুঁতে হবে না আমার ভাগ তুই তোর কাপড় চোপড় গুছিয়ে নে। হাঁ। গাড়ি ঠিক করে রেখেছি আমি। তোর সঙ্গে আমার ঘর করা নেহি চলেগা। হাঁ।

মানদার হাত হইতে বাসন কয়েকখানা পড়িয়া গেল।

সকলেই চমকিয়া উঠিল। বিপিন বলিল, ওরে মুখ্যু, আধ পাগল, বলছিস কি। ক্ষেপলি না কি?

—অন্যায় কি বললাম? ক্ষেপব কেন?

—তবে এসব কি বলছিস? নিজের পরিবারকে কি বিনা — ?

—ও নেবে না ক্যানে? ও পাঠিয়ে দেবে ক্যানে?

সকলে অবাক হইয়া গেল।

মহাতাপ বলিল, ওকে পাঠিয়ে দেব আমি। দিয়ে সেই গাড়ীতে বড় বউকে নিয়ে আসব আমি। আর নইলে শিবকেষ্ট রামকেষ্টদের টিকুরীর খুড়ী ইন্দেশের খুড়ীর মত বড় বউকে ভাগ করে দাও তোমরা। বড় বউয়ের সঙ্গে ওর বনে না, আমার ছোট বউয়ের সঙ্গে বনে না। ছোট বউ ওর ভাগে যাক, বড় বউ আমার ঘরে থাকবে।

বিপিন বলিল, ছি-ছি-ছি! মহাতাপ তুই চুপ কর্। আর কেলেঙ্কারি বাড়াস নে। বাড়াস নে।

মহাতাপ চিৎকার করিয়া উঠিল—না-না-না, বড় বউকে আমি যেতে দোব না। বড় বউ ছাড়া আমার চলবে না!

সেতাব এক টুকরো ভাঙা ইট লইয়া সজোরে ছুঁড়িল।

মহাতাপকে লক্ষ করিয়া নয়। ছুঁড়িল বড় বউকে লক্ষ করিয়া। বড় বউ কখন আসিয়া সিঁড়ির দরজার মুখে দাঁড়াইয়াছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই। সেতাব দেখিয়াছিল। কাঁচা ইটের টুকরোটা বড় বউয়ের পাশে দেওয়ালে লাগিয়া চুরমার হইয়া গেল। বিপিন সেতাবের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, এস বাইরে, এস। তাহাকে টানিয়া সে লইয়া গেল। খামার-বাড়িতে আসিয়া সেতাব বলিল, আমি নূতন করে সংসার করব। আবার বিয়ে করব আমি।

—করবে। আর আপত্তি আমি করব না।

—ঘোঁতনের বোন পুঁটির কথা আমি ঘোঁতনকে বলেছি।

নবম পরিচ্ছেদ

নবমীর রাত্রিকাল। মণ্ডলবাড়ির সম্পত্তি ঘর দুয়ার আজ দিনের বেলা ভাগ হইয়া গিয়াছে।

বাড়ির বাহিরে টাপর দেওয়া গোরুর গাড়ি সাজানো রহিয়াছে। সকালেই বড় বউ চাঁপাডাঙা যাইবে—চিরকালের মত হয়তো যাইবে।

বাড়ির উঠানে এক কোমর উঁচু কাঁচা ইটের দেওয়াল গাঁথা হইয়া গিয়াছে। ভারা বাঁধা রহিয়াছে। কাল বাকিটা শেষ হইবে।

সেতাব সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছে তাহার সন্তান চাই। সে আবার বিবাহ করিবে। ঘোঁতন যদি পুঁটির সঙ্গে বিবাহ দেয় তবে সে আনন্দের সঙ্গে বিবাহ করিবে। তবু তাহার বুকে যেন আগুন জ্বলিতেছে। কাদম্বিনী উপর একটা কঠিন আক্রোশ বুকের মধ্যে আগুনের মত জ্বলিতেছে।

রাত্রি প্রথম প্রহর পার হইয়াছে. জ্যোৎস্না ঝলমল করিতেছে। আকাশে আজ মেঘ দেখা দিয়াছে

শুইবার ঘরে বড় বউ শুইয়া ছিল। সেতাবও শুইয়া ছিল, কিন্তু ঘুম তাহার আসে নাই। বড় বউকে বিদায় দিব, বিদায় দিব বলিয়া কয়দিন মাতিয়া উঠিয়াছিল; কাল বড় বউ চলিয়া যাইবে, আজ রাত্রে তাহার অন্তর কেমন অধীর অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ক্রোধ, ক্ষোভ, জ্বালা, বেদনা, দুঃখ—সে যেন সব কিছুর একটা সংমিশ্রণ! যেন আগ্নেয়গিরির

গর্ভে ফুটন্ত বহু ধাতুর আলোড়ন। সে হঠাৎ উঠিয়া বসিল, কতদিন থেকে তুমি আমার চোখে এইভাবে ধুলো দিয়ে আসছ, বলতে পার? কতদিন?

বড় বউ উত্তর দিল না। সেতাব ঘরের মধ্যে একবার পায়চারি করিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বলিল, আমার মুখে ক্যানে এমন করে চুনকালি মাখালে, ক্যানে? বলিয়াই দ্রুতপদে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি তো বিষ খাইয়ে আমাকে মেরে যা খুশি তাই করতে পারতে। তারপরই বলিল, গয়না, ওই গয়না কটা দিয়ে বিপন্ন বাঁচিয়ে তুমি আমায় ঠকিয়েছ। আমি কানা আমি অন্ধ। তোমাকে তার একটি পয়সা আমি দোব না।

সে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া কাছে গিয়া বসিল, বলিল, তোমাকে যেতে আমি দোব না। তোমার গলা টিপে মেরে ফেলব আমি।

বলিতে বলিতেই সে অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, জবাবও তুমি দেবে না। চাঁপাডাঙার বউ।

এতক্ষণে চাঁপাডাঙার বউ বলিল—বল।

—আমার পা ছুঁয়ে বল তুমি।

—কি?

—যা দেখেছি তা ভুল। যা বুঝেছি তা ভুল। বল, আমার পা ছুঁয়ে বল ওগো।

সে বড় বউয়ের হাত ধরিল না, আকর্ষণে টানিয়া তুলিল এবং নিজের পা-খানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল আমার পা ছুঁয়ে বল?

বড় বউ তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, না। তারপর উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল বাহিরের আসিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িল।

সামনে জ্যোৎস্না-ঝলমল পৃথিবী আকাশে জ্যোৎস্না গাছের পল্লবে জ্যোৎস্না। কিন্তু তাহার উপর একটু যেন ছায়া পড়িয়াছে। পূর্ব দিকে দিগন্তে মেঘ উঠিয়াছে, এক কোণে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না-আলোকিত পৃথিবীর উপর। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সে চমক চকিত স্বল্প অস্পষ্ট। ইঙ্গিত—স্পষ্ট প্রকাশ নয়।

শুইয়া শুইয়া কত কথাই তাহার মনে উঠিল। একবার মনে হইল সেতাবের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া পা দুইটাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে—তুমি সত্যিই অন্ধ তুমি সত্যিই অন্ধ। এই কথাটাই তোমার পা ছুঁয়ে আমি তোমাকে বলছি। আর শেষ মিনতি করছি, মেরেই ফেল

আমাকে। মেরেই ফেল। কি করে এই মুখ নিয়ে চাঁপাডাঙায় গিয়ে দাঁড়াব আমি?

সেতাব ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছিল। চিন্তায় সে অধীর অস্থির। চাঁপাডাঙার বউয়ের উপর নিষ্ঠুর আক্রোশ যেন মুক্ত প্রবাহে বাহির হইবার পথ পাইতেছে না। কোথায় যেন বাধা পাইয়া নিজের বুকে ফিরিয়া আসিয়া ধাক্কা মারিতেছে। কোন মতেই সে অপরাধের পাহাড়টা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না। বড় বউ উপুড় হইয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়া পিষিয়া যাইতেছে না। সে জলের ঘটি হইতে জল দিয়া মাথা ধুইয়া ফেলিল। তারপর শুইয়া পড়িল।

সব স্তব্ধ। রাত্রি শন-শন করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। অসংখ্য কোটি কীটপতঙ্গ অবিরাম এক বিচিত্র ঐকতান বাজাইয়া চলিয়াছে। বাহিরে এক সময় একটা প্যাঁচা ডাকিয়া উঠিল। সেতাব চমকিয়া উঠিল। কান পাতিয়া কিছু শুনিবার চেষ্টা করিল। কই বড় বউয়ের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায় কই? সে সন্তর্পণে বিছানা ছাড়িয়া বারান্দার দিকে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল।

আকাশের জ্যোৎস্নায় আভাস আসিয়া পড়িয়াছে। বারান্দার ভিতরে বারান্দার রেলিংয়ের খানিকটা পাশ পর্যন্ত জ্যোৎস্নাই রহিয়াছে। সেখানে রেলিংয়ে ছায়া পড়িয়াছে। ভিতরটায় আবছা আলো-আঁধারি, তাহারই মধ্যে সাদা কাপড় ঢাকা বড় বউ নিথর হইয়া পড়িয়া আছে।

সে আবার আসিয়া বিছানায় শুইল। আবার উঠিল, একটি বালিশ তুলিয়া জানালার ধারে রাখিয়া শুইয়া পড়িল। বাহিরে দিগন্তে মেঘ ঘন হইতেছে। বাতাস উঠিতেছে মৃদুমন্দ। সেই বাতাসে তাহার তন্দ্রা আসিল।

হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। পায়ে যেন কিছুর স্পর্শ অনুভব করিতেছে সে। দেখিল, পায়ের তলার দিক হইতে চাঁপাডাঙার বউ সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া পা বাড়াইয়াছে। বারান্দায় দরজাটা ঠিক পায়ের কাছেই। বারান্দা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে বড় বউ। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়াছে। সেতাব চঞ্চল হইল না। সে স্থির হইয়া ঘুমন্তের মত পড়িয়া রহিল। বড় বউ নামিয়া গেল সে উঠিয়া কান পাতিয়া রহিল। সিঁড়ির দরজাটা খুলিয়া গেল। এবার সে উঠিল, ঘরের এক কোণে কয়েকটা জিনিসের সঙ্গে ছিল একখানা দা। সে দাখানা লইয়া নামিয়া গেল।

বড় বউ মহাতাপের ঘরের দিকে যাইতেছে।

মহাতাপ বাহিরের বারান্দায় পড়িয়া আছে। শুইবার আগে মানদাকে বলিয়াছে, শাসাইয়াছে—না, না। আমার ঘরে কাজ নাই। নে, তুই ঘর নে, দোর নে, বিষয় নে, আমি চাই না। এই বাইরে থাকছি রাতটার মত। কাল চলে যাব। নিশ্চয় চলে যাব।

বড় বউ সত্যই মহাতাপের বাড়ির দিকেই গেল। মাঝখানে উঠানে পাঁচিল পড়িয়াছে। প্রায় হাত দুয়েক উঁচু পর্যন্ত গাঁথা হইয়া গিয়াছে! বড় বউ সন্তর্পণে পাঁচিল পার হইয়া ওপারে দাওয়ার ধারে দাঁড়াইল। মহাতাপ বারান্দাতেই শুইয়া আছে। বারান্দার গায়ে খোলা দরজার ভিতর মিটমিটে লণ্ঠনের স্বল্পালোকিত ঘরে মানদা মানিককে লইয়া শুইয়া আছে, দেখা যাইতেছে। বড় বউ দাওয়ায় উঠিল। মহাতাপের মাথার কাছে একটি ছোট পুটলি নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে বারান্দার ওই প্রান্তে খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

মহাতাপও ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। বড় বউয়ের দরজা খোলার শব্দে সে জাগিয়া উঠিল, তাকাইয়া দেখিল—একটি মূর্তি বাহির হইয়া গেল। অস্ফুটস্বরে সে সবিস্ময়ে বলিল, বড় বউ? সে হাতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল। দেহে তাহার জ্বর রহিয়াছে। হাতে একটা কি ঠেকিল। সে সেটা লইয়া টিপিয়া দেখিল। এ কি? টাকা? গয়না? বড় বউয়ের দ্রুত অনুসরণ করিল। সে বুঝিয়াছে, সে বুঝিয়াছে। বড় বউয়ের মতলব সে বুঝিয়াছে।

সে বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মানদাও বাহির হইয়া আসিল বারান্দায়। খোলা খিড়কির দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল সে। একটু হাসিল, তারপর সে অনুসরণ করিল।

এবার উঠানে নামিয়া আসিল সেতাব। তাহার হাতের খানা জ্যোৎস্নায় ঝলকিয়া উঠিল।

মহাতাপ খিড়কির দরজার বাহির হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কয়টা গাছের তলায় অন্ধকার, তাহার ওপারে জ্যোৎস্নালোকিত পৃথিবী। ভরা পুকুরটা জ্যোৎস্নায় ঝকমক করিতেছে। চাঁদ পুকুরের জলে চাঁদমালা হইয়া কাঁপিতেছে।

পুকুরের ঘাটে দাঁড়াইয়া বড় বউ।

বড় বউ বসিল। কাপড়ে আঁচলের ফালি ছিঁড়িয়া ফেলিল। সে মরিবার জন্য আসিয়াছে। সে জলে ডুবিয়া মরিবে। কাপড়ের ফালি দিয়া

পা দুইটিকে বাঁধিবে। বুকের কাপড়ে একখানা ইট। শুইয়া শুইয়া সে অনেক ভাবিয়াছে। ছি! ছি! কোন্ মুখে সে চাঁপাডাঙায় ফিরিয়া যাইবে? লোকে শুধাইলে কি বলিবে?

সে সঙ্কল্প করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় তাহার গায়ের গহনা কয়খান, এবং গোপন সঞ্চয় শ দুয়েক টাকা পুঁটলি বাঁধিয়া মহাতাপের মাথার শিয়রে নামাইয়া দিয়া আসিয়াছে। তাহার ছিল অনেক। সবই স্বামিত্বের দাবিতে সেতাব লইয়াছে। সে একটি কথাও বলে নাই। এই সামান্যটুকু সে মহাতাপকেই দিয়া যাইবে। মহাতাপকে বঞ্চিত করিয়াছে সেতাব।

বড় বউ পায়ে বাঁধন দিতেছিল।

গাছের তলার ছায়া হইতে মহাতাপ আসিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল—বড় বউ

চাঁপাডাঙার বউ চমকিয়া উঠিল। তাহার দিকে তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, মহাতাপ!

মহাতাপ বলিল, তুমি জলে ডুবতে এসেছ বড় বউ?

বড় বউ অবোধকে ছলনা করিতে চাহিল—কে বললে? আমি ঘাটে এসেছি ভাই। শরীরটা বড় জ্বলছে। চান করব।

—না। ঘাড় নাড়িয়া মহাতাপ বলিল, আজ তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না। পায়ে তুমি দড়ি বাঁধছ! আমার মাথার শিয়রে তুমি গয়না টাকা ফেলে দিয়ে এলে। আমি তখুনি বুঝেছি।

বড় বউ বলিল, আমি এই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে চাঁপাডাঙায় কোন মুখে ফিরে যাব ভাই? তুমি কেন এই সময় সামনে এসে দাঁড়ালে মহাতাপ?

—আমি চলে যাচ্ছি। আমি কিছু বলব না। তুমি তাই মর। ওরা যে এমন ভাবে, তা আমি বুঝতে পারতাম না। তোমার গয়না টাকা তুমি নাও। আঁচলে হাত না বেঁধেই ডুবেই মর তুমি। যার পাওনা সে নেবে।

সে ফিরিতে উদ্যত হইল।

—মহাতাপ! শোন!

মহাতাপ ফিরিল। বড় বউ বলিল, ও তোমার পাওনা। তোমার দাদা তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে।

—আমি নিয়ে কি করব? তুমি ডুবে মর। আমিও চলে যাব ঘর থেকে। তুমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পথ ধরতাম।

—না, না। ও কথা বলতে নেই। মানুর কি হবে? মানিকের কি হবে।

—সে ওই জানে। —হাতখানা উপরের দিকে তুলিয়া দিল।—তুমি যে ঘরে থাকবে না, সে ঘরে আমি থাকব না।

বড় বউ নিজেও আজ সচকিত হইয়া উঠিল। বিরক্ত হইল। ছি-ছি ছি-ছি। কঠিন কণ্ঠেই বলিল, কিন্তু ক্যানে? ক্যানে তুমি আমার জন্তে ঘর ছাড়বে মহাতাপ? তোমার বউ, তোমার ছেলে, তোমার ঘর, তোমার বিষয়—

—আঃ! তুমিও তাই বলছ? হা-হা-হারে। সে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল তারপর আবার বলিল—শুধু বউ বেটা বিষয় নিয়ে ঘর হয়? মা না থাকলে, মা থাকতে তাকে ছেড়ে বউ-বেটা নিয়ে ঘর? আমার মা বলে গিয়েছে, বড় ভাজ তোর মা। ছেলাবেলায় খেলাঘরে তুমি মা হতে আমি ছেলে হতাম—মনে নাই? বলে নাই লক্ষ্মণের কথা, সীতার কথা?

সে ছবি মুহূর্তে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল, সে কি ভুলিবার?

মনে হইল, সেই সেকালের যুগেই যেন ফিরিয়া গিয়াছে।

মহাতাপ আবার বলিল, মরণকালে মা তোমাকে বলে নাই—বউমা, মহাতাপ আমার পাগল, ও মা ছাড়া থাকতে পারে না—তুমি ওর মা হয়ো; তোমার ছেলে-পুলে হোক, কিন্তু ঐ তোমার বড় ছেলে। বলে নাই? মনে নাই?

—আছে ভাই।

মনে আছে কেন, এই মুহূর্তে চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

শুধু তাহারই নয়, শুধু মহাতাপেরই না, সেতাবের চোখের সম্মুখেও ভাসিতেছে। সে যে তাহার সাক্ষী। মায়ের মৃত্যুকালে মা যখন কথাগুলি বলে তখন সেও যে দাঁড়াইয়া ছিল সেখানে।

একটা গাছের তলায় দা হাতে সেতাব দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল; থরথর করিয়া সে কাঁপিয়া উঠিল। মনে পড়িল সব-শেষে মা তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—তুমি আমার বটবৃক্ষ। ঝড় বাজ অনেক সহ্য করে পোড়ো মণ্ডল-বাড়িকে খাড়া করেছ। তোমার ছায়ার তলায় এই দুটিকে দিয়ে গেলাম। মহাতাপ পাগলাটে, তাকে বউমা দেখবে। তুমি বড় বউমাকে দেখ। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আমার। ওর পয়েই সব। ওর অপমান কোরো না কখনও। ও আমার বড় অভিমানী।

এই নিশীথে গাছের ছায়ার মধ্যে সেই ছবি যেন স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল।

ওদিকে আকাশে শন-শন করিয়া মেঘ উঠিতেছিল, কখন মেঘ জমিয়াছে—পাক খাইয়াছে; গুমোট ধরিয়াছে—তাহার পর মৃদু বাতাস উঠিয়াছে, মৃদু বাতাস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মেঘ ধাবমান হইয়াছে—আকাশ ঢাকিয়া অসীম বিস্তারে প্রসারিত হইতেছে। মেঘে মেঘে সংঘর্ষ

বাধিয়াছে। বিদ্যুৎ চমকাইয়া একটা মেঘগর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। গম্ভীর গুরুগুরু দীর্ঘায়িত মনোহর মেঘধ্বনি।

মহাতাপ বড় বউকে বলিল, তুমি তাই মর মা; মা-ই বলছি আজো। তুমি মর আমিও চলে যাচ্ছি—এই পথেই যাব। একেবারে গঙ্গাসাগর।

বড় বউ বলিল, মহাতাপ। না—সে কোরো না ভাই!

—না নয়! আমি ঠিক করে রেখেছি। তুমিই কি কম দুঃখ দিলে আমাকে? আমাকে নিয়ে তো ছেলের সাধ মেটে নাই তোমার! কত কবচ পরলে, কত উপোস করলে! গঙ্গাসাগরে ডুবে মরব আমি। যেন আসছে জন্মে তোমার কোলেই জন্মাই আমি।

বড় বউ চিৎকার করিয়া উঠিল, আমার মাদুলি আমি ছিঁড়ে জলে ফেলে দিয়েছি।

একবারে বাধাবন্ধনহীন চিৎকার—ওই মেঘের ডাকের মত।

সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে শিশুকণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইল—ব-মা! ব-মা!

বড় বউ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মানিক।

ওদিকে একটি গাছের ছায়ায় তলা হইতে মানদা চিৎকার করিয়া উঠিল, মানিক!

মানিককে যে সে ঘরে একলা রাখিয়া আসিয়াছে! বাড়ির দরজাগুলো যে খোলা হাট হইয়াছে! মানিক!—বড় বউ উঠিতে গেল। কিন্তু পায়ের বাঁধনের জন্য পারিল না, পড়িয়া গেল। সে বলিল, মহাতাপ, মানিককে দেখ। মহাতাপ! আঃ, আমার পায়ের বাঁধনটা, আঃ!

দা হাতে গাছতলা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল সেতাব।

মহাতাপ চিৎকার করিয়া উঠিল, না—না—

সেতাব বলিল, তোর পায়ে পড়ি মহাতাপ। তোর পায়ে পড়ি। কেলেঙ্কারি বাড়াস নে। যা মানিককে দেখ! ওরে ছোট বউমা আমারই মত বাগানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। মানিক একলা ছিল। দেখ। আমি ওর পায়ের বাঁধন কেটে নিয়ে যাচ্ছি যা।

সে বড় বউয়ের পায়ের বাঁধন কাটিয়া দিতে বসিল। বলিল, ছি-ছি-ছি!

ওদিকে বাড়ির ভিতর হইতে মানদার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—মানিক! মানিক!

একা মানিক ঘরে শুইয়া ছিল। বিদ্যুতের আলোয় মেঘের ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে মাকে ঘরে পায় নাই। বাহিরে আসিয়াও

কাহাকেও পায় নাই। দরজা খোলা হাট। অল্প ছিলকে মেঘ অবশ্য আকাশময়ই কুয়াশার মত দাগিয়া উঠিয়াছে। তাহাতে জ্যোৎস্না ঢাকা পড়ে নাই, ম্লানও ঠিক হয় নাই, একটু রহস্যালোকের চেহারা পাইয়াছে। সে সেই আলোয় খোলা দরজাও বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ বড় বউয়ের উচ্চকণ্ঠের 'মহাতাপ, ডাকের মধ্যে বড়মায়ের সাড়া পাইয়া 'বড়মা' বলিয়া ডাক দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় বড়মা! সকলেই তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মানদা ঘরে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, মানিক!

কিন্তু কই মানিক?

সে দিশাহারা হইয়া ওই বাগানের খিড়কির পথেই বাহির হইয়া ডাকিল, মানিক!

মহাতাপ ছুটিয়া আসিল—কই মানকে? জানি না—মানদা কাতর ভাবে স্বামীর দিকে চাহিল।

মহাতাপ দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল, কথা শুনতে গিয়েছিলে, ছেলেকে একা রেখে?

মানদা একবার ডাকিল, দিদি।

বাগানের ভিতর হইতে বড় বউ সাড়া দিল—মানু! মানিক!

বাড়িতে নাই।—সে কাঁদিয়া উঠিল।

বড় বউ আসিয়া দাঁড়াইল। সে হাঁপাইতেছিল। তাহার পিছনে সেতাব। বড় বউ চিৎকার করিয়া ডাকিল—মানিক!

সেই মুহূর্তের ঘন কালো ঈশান কোণের মেঘ চাঁদ ঢাকিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল বাতাস—একটা দমকা বাতাস। বাতাসের প্রথম ঝটকাটা চলিয়া গেল। তাহার পর সমান বেগ লইয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল। সেই বাতাসের মধ্যে শোনা গেল একটা রঙীন বাঁশির ক্ষীণ আওয়াজ—পু-পু!

বড় বউ বলিল, সদর রাস্তায়। ওই মানিকের বাঁশি।

সদর রাস্তাতেই বাহির হইয়াছিল মানিক। তাহার শিশুমনে চণ্ডীমণ্ডপে পূজাসমারোহের স্মৃতি! ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া সকলে পূজা দেখিতে গিয়াছে। সেই পথেই তাহার বাঁশিটি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছিল—পু-পু-পু-পু!

অকস্মাৎ জ্যোৎস্না ঢাকিয়া অন্ধকার হইয়া গেল।

মানিক ছুটিতে শুরু করিল।

সেও শুনিতে পাইতেছে বড়মা ডাকিতেছে, বাবা ডাকিতেছে, জ্যেঠা ডাকিতেছে, মা ডাকিতেছে—মানিক! মানিক! মানিক! মানিক!

চণ্ডীমণ্ডপ হইতেই তাহারা ডাকিতেছে তাহাতে তাহার সন্দেহ নাই। সে ছুটিতে ছুটিতে পথের বাঁকে দাঁড়ায়, রাস্তাটা চিনিয়া লয়, আবার চলিতে শুরু করে, একবার দুইবার হাতের বাঁশিটা বাজাইয়া লয়।

চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্তে সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চণ্ডীমণ্ডপে বড় বউ তখন মাথা ঠুকিতেছে।—আমার মানিককে ফিরে দাও। আমার মানিককে ফিরে দাও।

মানিক উল্লাসের সঙ্গে বাঁশিতে ফুঁ দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বড় মায়ের কাছে দাঁড়াইল।

ওদিকে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

পরদিন সূর্য উঠিলেন মনোহররূপে।

বর্ষণসিক্ত রাত্রির শেষে কাটা-কাটা মেঘের ফাঁকে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া পূর্বাকাশে লালে লাল করিয়া পশ্চিম আকাশে রামধনু আঁকিয়া পৃথিবীকে বরবর্ণিনীর মত সাজাইয়া দিয়া দিনের ঠাকুর হাসিতে হাসিতে আবির্ভূত হইলেন।

মণ্ডলবাড়ির সামনে তখন মণিলাল বিদায় লইতেছে।

যে টোপর দেওয়া গাড়িখানায় বড় বউয়ের যাইবার কথা, সেই গাড়িখানাতেই মণিলাল একা বাড়ি ফিরিতেছিল।

সেতাব তামাক খাইতেছিল। মণিলাল হাসিয়া বলিল, মাকে কি বলব? শুধাবে তো কি হল? কাদু এল না ক্যানে?

সেতাব বলিল, বলবে! একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, তেনার জামাইকে ভূতে পেয়েছিল। আর কি বলবে? ভূত ছেড়ে গেল। পাঠালে না।

বড বউ বাড়ির ভিতর হইতে মানিককে কোলে করিয়া আসিয়া বলিল, যাব রে যাব। বলবি মাকে, এই কোজাগারী লক্ষ্মীপুজোর পরই যাব; আমি, তোর জামাইদাদা দুজনাতেই যাব। ল-সম্বন্ধ করতে যাব। তোর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যাব। বলবি, কনে খুব ভাল। বেশ ডাগর। মায়ের সইয়ের মেয়ে। পুটি! তোর জামাইদাদা তো পাগল—

সেতাব বলিল, এই দেখ! এই দেখ! রাধে-রাধে-রাধে! কি যে বল!

বড় বউ হাসিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে মহাতাপ আসিয়া হাজির হইল। তাহার সর্বাঙ্গে কাদা। মাথাব ব্যাণ্ডেজ ভিজা, চুল ভিজা, কাঁধে কোদাল। সে ইহার মধ্যে কখন মাঠে গিয়াছিল। সে নিজে মাঠের আল ভাঙিয়া দিয়াছিল; সেই কথা মনে পড়িয়া সে স্থির থাকিতে পারে নাই।

"কর্কট ছরকট, সিংহে শুকা, কন্যা কানে কান,
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথায় রাখবি ধান।"

কর্কট অর্থাৎ শ্রাবণে জলে জল ছরকট করিয়া দিলে, সিংহ অর্থাৎ ভাদ্রে শুকা—রৌদ্র হইলে, কন্যা অর্থাৎ আশ্বিনে আল ভরিয়া কানায় জল থাকিলে ও তুলা অর্থাৎ কার্তিকে বিনা বাতাসে বর্ষণ হইলে ধান রাখিবার জায়গা কুলায় না খামারে। আশ্বিনে জমির আল কাটা থাকিলে চলে?

ওই খনার বচনটাই চাষীরা এমন দিনে গানের সুরে গাহিয়া বলে—

"কর্কট ছরকট, সিংহে শুকা, কন্যা কানে কান,
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথায় রাখবি ধান,
বউ কনে যতন করে নিকাও অঙনখান।"

ছ-ফুট লম্বা একটি মানুষ। হয়তো ইঞ্চি দুয়েক বেশীই হবে। দৈর্ঘ্যের অনুপাতে মনে হয় দেহ যেন কিছু শীর্ণ, কিন্তু দুর্বল বা রোগজীর্ণ নয়। কালো রঙ, বাংলাদেশের কালো রঙ; মজা কালো। প্রশস্ত ললাট, লম্বাটে, মুখখানির মধ্যে বড়ো বড়ো দুটি বিষণ্ণদৃষ্টি চোখ। বিষণ্ণতা ছাড়াও কিছু আছে, যা দেখে মনে হয়, লোকটির মন বাইরে থাকলে অনেক দূরে আছে, ভিতরে থাকলে অন্তরের গভীরতম গভীরে মগ্ন।

পাগলা পাদরী। এই নামেই ব্যক্তিটি পরিচিত এ-অঞ্চলে। অঞ্চলের লোকের দোষ নেই, এর চেয়ে ভালোভাবে লোকটির স্বরূপ ব্যক্ত করা বোধ হয় যায় না। পরনে পাদরীর পোশাক, কিন্তু সে পোশাক গেরুয়ায় ছোপানো, যা ভারতবর্ষের বৈরাগ্য ধর্মের চিরন্তন প্রতীক। এ-অঞ্চলের কোনো গির্জার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট নন। কোনো ধর্মও প্রচার করেন না। শুধু চিকিৎসা করে বেড়ান। পাগলা পাদরী খুব ভালো ডাক্তার। বাইসিক্লে চেপে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে রোগী খুঁজে বেড়ান। পথের দু-পাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করেন 'কী মহাশয়গণ, কেমন আছ গো সব? ভালো তো?' সঙ্গে সঙ্গে মুখভরা মিষ্টি হাসি উপছে পড়ে।

'হাঁ বাবা, ভালো আছি।'

'আচ্ছা! আচ্ছা! খুব ভালো। ভালো থাকো। মানুষ ভালো থাকলেই ভগবান ভালো থাকেন গো। জয় ভগবান!' বলেই এগুতে থাকেন। লম্বা মানুষের পা-দুখানাই বেশী লম্বা; কথা বলবার সময় বাইসিক্ল থেকে নামেন না—পা-দুখানা প্যাডেল থেকে নামিয়ে দেন মাটির উপর; চলবার সময় মাটি থেকে তুলে প্যাডেলে রেখে একটু ঝোঁক দিয়ে চাপ দেন—চলতে থাকে বাইসিক্ল। যে-কোনো লোকের বাড়িতে কেউ অসুস্থ থাকলে সে পাগলা পাদরীর প্রতীক্ষাতে দাঁড়িয়েই থাকে। কতক্ষণে কখন শোনা যাবে বাইসিক্লের ঘণ্টা, কখন দেখা যাবে সাইক্লের উপর গেরুয়া-পোশাক-পরা পাদরীকে। দেখলেই হাত তুলে আগে থেকেই বলে, 'বাবাসাহেব!'

ছ-ফুট লম্বা মানুষটি বাইসিক্ল থেকে মাটির উপর পা নামিয়ে দেন। নামতে হয় না। 'কী খবর? কার কী হল?'

'জ্বর।'

'কার?'

'আমার ছেলের।'

'চলো ; দেখি কি হয়েছে। জ্বরটা কেমন, বাঁকা না সোজা? কি মনে লাগছে বল দেখি?'

রোগী দেখেন, দেখে শুনে বাইসিক্লের পিছনে বাঁধা ওষুধের বাক্স থেকে ওষুধ দেন। কিংবা বলেন, 'আমার ওখানে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে এসো।' না হয় বলেন—'ইটা বাবু দোকান থেকে আনতে হবেক। আমার ভাড়ারে নাই।' লিখে দেন কাগজে।

বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে যে-রাস্তাটা—পুরীর পথ বলে খ্যাত—বিষ্ণুপুরের কোল ঘেঁষে মেদিনীপুর হয়ে চলে গেছে সমুদ্রতট পর্যন্ত, যার সঙ্গে এদিক-ওদিক থেকে কয়েকটা রাস্তাই মিলেছে, তারই ধারে তাঁর মিশন : না, মিশন নয়—আশ্রম।

শালবন আর গেরুয়া মাটির দেশ। মধ্যে মধ্যে পাহাড়িয়া নদী। বীরাবতী-শিলাবতী-দারুকেশ্বর, বীরাই-শিলাই-দারকা। মধ্যে মধ্যে লালচে পাথর, নুড়ি ছড়ানো অনুর্বর প্রান্তর খানিকটা। এই ধরনের ভূ-প্রকৃতি একটা ঢল নামার মতো নেমে ছড়িয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আবার এরই দু-ধারে বাঙলার কোমল ভূমির প্রসার। সেখানে জনসমৃদ্ধ গ্রাম, শস্যক্ষেত্র।

উত্তর ও মধ্যভারতের পার্বত্য ও অরণ্য-ভূমের রেশ উড়িষ্যা ও বিহারের প্রান্তভাগ থেকে বিচিত্র আঁকাবাঁকা ফালির মতো ছড়িয়ে পড়ে শেষ হয়েছে ক্রমশ। মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গল মহলগুলি ইতিহাস বিখ্যাত। পাথুরে কাঁকুরে এই আঁকাবাঁকা শালজঙ্গল-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যে গ্রাম গুলি, সেগুলিতে প্রাচীন আমলের সেই মানুষদের বংশধরেরা বাস করে। বাউড়ি বাগ্দী, মেটে, মাল, খয়রা, সাঁওতাল। এদের মধ্যে সামন্তযুগে প্রধান হয়ে বসেছিল উত্তর ভারতের ছত্রীরা। সিংহ, রায় প্রভৃতিরা কয়েকখানা গ্রামের পরে পরে এমনিই এক-একটি পরিবার আজ এক-একটি বিবদমান গোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছে। লেগেই আছে মামলা-মকদ্দমা, দেওয়ানী ফৌজদারী। ঘোর কালো রঙের পীতচক্ষু অভাবশীর্ণ অর্ধনগ্ন মূক মানুষগুলির মধ্যে উজ্জলবর্ণ দীর্ঘাকৃতি উগ্র প্রকৃতির মানুষগুলি বিচিত্রভাবে মিশে রয়েছে। এক-একটি ছত্রীবাড়ির নাম আজও রাজবাড়ি। এ-রাজবাড়ির ভাঙা দেওয়াল, মাটির উঠান, জীর্ণ খড়ের চাল ; রাজার পরনে ময়লা জীর্ণ কাপড় খোলা গা ; বসে বিড়ি খান, অথবা হুকো টানেন ; পরস্পরের সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে কটু ভাষায় কলহ করেন। রানী-রাজকন্যা নিজেদের হাতেই রান্নাবান্না করেন, নিজেরাই কাঁখে বয়ে জল আনেন, ধান মেলে দেন পায়ে-পায়ে। উঠান নিকানো, বাসন মাজা, এ-সব এখনও ওই কালো রঙের মানুষদের বাড়ির মেয়েরা করে। পুরুষেরা জমি চষে,

গোরু চরায়, জঙ্গল থেকে কাঠ কাটে। কচিৎ কদাচিৎ এক-আধ ঘর দলপতি বা লায়েক-বাগ্দীর বাস আজও আছে। দলপতি লায়েক এদের উপাধি। এরা এককালে ছত্রী সামন্তদের অধীনে ছিল যোদ্ধা সর্দার। সামন্তদের দেওয়া নিষ্কর জঙ্গল-মহলে জঙ্গলে-ঘেরা গ্রামের মধ্যে আপনার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী এবং অনুচরদের নিয়ে মদ্যে মাংসে, মোটা লাল চালের ভাতে, দুর্দান্ত সাহসে, শিকারে আর সন্ধ্যায় মাদলের সঙ্গে নাচে-গানে জীবন যাপন করত। পাঠান-মোগলের যুদ্ধের কাল থেকে এদের কথা আর প্রবাদ বা কাহিনী নয়, ইতিহাস। মোগলদের শেষ আমলে, মারাঠা অভিযানের সময় এরা রীতিমতো লড়াই করেছে। বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে গাছের উপর চড়ে তীর ছুঁড়েছে। রাত্রির অন্ধকারে পিছন থেকে এসে ছোঁ মেরেছে। তাড়া খেয়ে বাস-বসতি ফেলে নিবিড় জঙ্গলে লুকিয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গেও খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে। সামন্ত রাজারা আনুগত্য স্বীকার করার পরও এরা, এই সর্দারেরা, লড়াই করেছে।

বাগ্দী-সর্দার গোবর্ধন দলপতি যে লড়াই করেছিল কোম্পানীর দপ্তরে তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা আছে। গোবর্ধন দলপতি নিজের অধিকারের সীমানা রক্ষা করেই ক্ষান্ত থাকে নি, কোম্পানীর সীমানা কেড়ে নিয়ে দখল করেছিল। তার বাইরে এসেও দিন-দুপুরে গ্রামের পর গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে, গ্রামের রাস্তায় মানুষের মাথা কেটে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

এদেরই এক-আধ ঘরের দেখা আজও মেলে।

সমতলভূমে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-নবশাক-প্রধান গ্রামগুলি এদের থেকে একটু দূরে। ওসব গ্রামেও বাগ্দী, বাউড়ী, মেটে, মাল আছে, তাদের চেহারা যেন কিছু আলাদা। রক্তের উত্তাপ এবং ঘনত্বেও বোধ হয় তফাৎ আছে।

শালবনে ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য এদের আজও হাতছানি দিয়ে ডাকে। শালের সঙ্গে আছে পলাশ আর মহুয়া। পলাশফুলের গুঁড়ো দিয়ে আজও কাপড় রঙ করে এরা; মহুয়া থেকে মদ চোলাই করে। মধ্যে মধ্যে আবগারী পুলিস হানা দেয়—কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ধরতে পারে না; বিস্তীর্ণ শালবনের মধ্যে কোথায় যে ঘাঁটি সে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। ধরা কচিৎ পড়ে। ধরা পড়ে জেল খাটে, কিন্তু সে ওদের কাছে বিশেষ কিছু না। মধ্যে মধ্যে শিকারে বের হয়। অবশ্য সাঁওতালেরা এ-ক্ষেত্রে বেশী। কিন্তু এরাও বের হয়ে পড়ে। ময়ূর, বনমোরগ, তিতির, খরগোশ, হরিণ, বরা, ভল্লুক মেরে পায় বিপুল উল্লাস। বিশেষ করে বরা-ভালুকের উৎপাত হলে মেতে ওঠে এরা। কখনও কখনও বাঘও আসে। তার সঙ্গে লড়াই দেবার মতো সাহসের সে

দুর্দান্তপনা আজ আর বোধ হয় নেই। বাঘ এলে স্থানীয় বন্দুকওয়ালা শিকারীদের খবর দেয়। থানা মারফত বিষ্ণুপুর শহরে কর্তৃপক্ষের কাছেও খবর পাঠায়। প্রায় দুশো বৎসর ধরে নিরন্তর শাসনে এবং সুকৌশল শোষণে এদের জীবনে সব গর্বই প্রায় চলে গেছে, এবং সাহস-উল্লাস কিছুটা খর্ব হয়েছে। কারণ বরা ভালুক মারবার সাহস থাকলেও বাঘ এলে তার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য আজ টাঙ্গি বল্লাম-ধনুক-কাঁড় নিয়ে উন্মত্ত আনন্দে আর বেরিয়ে পড়তে চায় না। শুধু রোগের হাতে আত্মসমর্পণে এদের ভয় নেই। রোগ হলে কপালে হাত দেয়। যা করে কপাল। ডাকে শুধু—হে ভগবান।

এদের মধ্যেই থাকেন এই পাগলা পাদরী। আজ কয়েক বছর আগে হঠাৎ এখানে আসেন, এসে থেকে গেছেন। এসেছিলেন যেবার, সেবার এখানে অনাবৃষ্টিতে জল ছিল না। শস্য ছিল না—দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার উপর হয়েছিল মহামারীর প্রাদুর্ভাব। এখানকার মিশনারী সাহেবরা কাগজে দয়ালু পবহিত ব্রতী চিকিৎসকের সাহায্য চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন--তারই উত্তরে তিনি একদিন একটা ব্যাগ আর বিছানা দুই হাতে নিজেই বয়ে এনে হাজির হয়েছিলেন। এবং থেকেই গেছেন সেই অবধি। লোকে বিশ্বাস করে—ভগবান পাঠিয়েছেন।

শালবনের ধারে লালমাটির উপর একখানি ছোটো গ্রাম। পাশ দিয়েই চলে গেছে পুরীর পাকা সড়ক। মাইলখানেক উত্তর-পশ্চিমে মোরার গ্রামে ওয়েসলিয়েন চার্চের দোতলা বাড়িটা। নিতান্তই ছোটো নগণ্য একখানি গ্রাম। শালবন এখানটায় বিশীর্ণ এবং বিক্ষিপ্ত। গ্রামখানারও বাইরে—শালবন যেখান থেকে জমাট বেঁধেছে, সেইখানে—ছোটো একখানি বাঙলো বাড়ি ; খানতিনেক ঘর। এইটেই তাঁর আস্তানা। সঙ্গীর মধ্যে কয়েকটা পাখি, দুটি গোরু এবং একটি দম্পতি। যোসেফ আর সিন্ধু। যোসেফরা অনেককাল আগে ক্রিশ্চান হয়েছে। যোসেফলাল সিং। সিন্ধু মাঝিদের মেয়ে। সে ক্রিশ্চান নয়। বিবাহও ওদের হয় নি। দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন সমাজ থেকে চলে এসেছে। আশ্রয় নিয়েছে পাগলা পাদরীর কাছে। যোসেফ খানিকটা ইংরাজী জানে ; পাগলা পাদরী তাকে কম্পাউণ্ডারী শিখিয়েছেন, সে কম্পাউণ্ডারী করে আর ছেলেদের পাঠশালায় পণ্ডিতি করে। সিন্ধু পাখিগুলির পরিচর্যা করে এবং বাঙলোরও গৃহিণী সে, রান্নাবান্না ভাঁড়ার তারই হাতে। আরও একটি সাঁওতাল মেয়ে আছে, নাম ঝুমকি মেঝ্যান। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের আশ্চর্য স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। এমন সরল দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না।

পাগলা পাদরী ওকে অনেক কষ্টে রক্ষা করেছেন মৃত্যুর মুখ থেকে। ঝুমকির বিয়ে হয়েছিল তিনবার। তিন স্বামীই অল্প দিনের মধ্যে মারা যায়। তারপর সকলের সন্দেহ হয় ঝুমকি ডাইনি। সাঁওতালদের সমাজপতিরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল ওকে। পাগলা পাদরী খবর পেয়ে বাইসিক্ল চড়ে ঝড়ের বেগে সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে ওকে উদ্ধার করে এনেছেন। ওই গ্রামের সাঁওতাল কর্তাকে তিনি চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছিলেন। আরও অনেকেরই চিকিৎসা করেছেন। পাগলা পাদরীর কথা তারা ঠেলতে পারে নি। পাগলা পাদরী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর কখনও ঝুমকি কোনো সাঁওতাল গ্রামে যাবে না। সে তাঁর বাড়িতে থাকবে; গোরুর সেবা করবে, গাছপালা লাগাবে।

'উকে কেরেস্তান করবি না তো বাবাসাহেব?'

'না'।' তারপর হেসে বলেছিলেন, 'আমি কি কিরিস্তান মাঝি?'

বৃদ্ধ সাঁওতাল সর্দার বলেছিল, 'কে জানে? ই বুলে তু কিরিস্তান বটিস; আবার কিরিস্তানরা বুলে—কিরিস্তান লয়; তুর জাতই নাইক। তু জানিস তু কী বটিস।'

পাগলা পাদরী হা-হা করে হেসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'উরা বলে মাঝি, জাত আমার নাই। তবে মানুষ তো বটি। তুইও মানুষ আমিও মানুষ। ওই মেয়েটাও মানুষ।'

'তু মানুষ বটে। উ লয়। উ ডাইনি বটে।'

'আমি তো চিকিৎসা করে তোর এত বড়ো ভূতে-পাওয়া ব্যামোটা সারালাম,—তু বল! উকেও আমি ডাইনি থেকে সারাব রে।'

'লারবি। তবে তু বলছিস লিয়ে যাবি, লিয়ে যা।'

সেই অবধি ঝুমকিও থাকে এখানে। গোরুর সেবা করে, বাঙলোতে গাছপালা লাগায়। রাস্তায় ঘাটে বাঙলোর সীমানার বাইরে কদাচিৎ বের হয়। সাঁওতাল পুরুষ-মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে ছুটে গিয়ে লুকোয়, যেখানে হোক। তারা যদি আবার বলে, সে তাদের খেয়েছে।

পাগলা পাদরীর ঘরেই হয়তো ঢুকে পড়ে। পাগল মানুষটি চোখ বন্ধ করে ঝোলা ডেক-চেয়ারে বসে থাকে কি ভাবে, সন্তর্পিত পদক্ষেপের শব্দ কানে আসতেই প্রশ্ন করে, 'কে?'

ফিসফিস করে শঙ্কিত ভঙ্গিতে সে অন্ধকার কোণ থেকে বা আলমারির পাশ থেকে উত্তর দেয়, 'মেন এয়াং—বাবাসাহেব। ঝুমকি!'

বাবাসাহেব মুখ তুলে তার দিকে তাকান, কৃষ্ণাঙ্গী অরণ্যনারীর সাদা জলজলে চোখের দিকে তাকিয়ে, স্বচ্ছ জলতলে নাড়াখাওয়া শ্যাওলার দলের

মতো ওই দৃষ্টির মধ্যে ওর ভয়ে-কাঁপা অন্তরকে দেখতে পান। প্রশ্ন করেন, 'ভয় পেয়েছিস? বাইরে মাঝিরা এসেছে বুঝি?'

সে তার দীর্ঘ সরল হাতখানি অন্য এক দিকে বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলে, 'অঁ-হুঁ, আন-পরম্।' অর্থাৎ না-না, এই দিকে। এই দিকে।

বাইরে আসে নি, ওই দিকে তারা যাচ্ছে।

বাবাসাহেব অভয় দিয়ে বাইরে আসেন। যারা যায় তাদের সঙ্গে ডেকে আলাপ করেন তাদেরই ভাষায়। অনর্গল বলে যান।

সাধারণত এই জেলার চলিত বাঙলাতেই কথা বলেন। কেউ বুঝতে পারে না যে তিনি এখানকার লোক নন। তারা কেউ-কেউ প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁ বাবাসাহেব, আমাদের কথাবার্তা বাকবাচালি এমন কবে কী করে শিখলেন গো আপুনি?'

সাহেব প্রসন্ন প্রাণখোলা হাসিতে উতলা বাতাসে শালগাছের মতো দুলে ওঠেন; বলেন, 'তুমাদিগকে যি ভালোবাসলম হে। সেই মন্তর শিখে লিলম। হুঁ!'

তারপর আবার বলেন, 'তুমি বল ক্যানে, যাকে তুমি ভালোবাস, তার মুখটি দেখে তুমি তার পরানের সুখ-দুটি বুঝতে পার কি না? পার তো। ভালোবাসলে পরানের কথাটি মুখ দেখে বোঝা যায়, আর মুখের কথা কানে শুনে শিখা যাবেক, ইটা আর বেশী কথা কী হে? আঁ? না—কি? তুমিই বলনা হে মহাশয়।'

একেবারে সুর স্বর উচ্চারণ সব যেন একতারে বাঁধা।

প্রশ্নকর্তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। তার সারা অন্তর উপলব্ধিতে আপ্লুত হয়ে যায়, আপন মনেই সে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, ঠিক কথা। ঠিক কথা! হুঁ! হুঁ।

তবে তাঁর ইংরেজী শুনে ভদ্রসমাজের অনেকে সন্দেহ করবেন, হয়তো লোকটির কয়েক পুরুষ ধরেই ইংরেজী ভাষা বলে আসছে—হয়তো কয়েক পুরুষ ধরেই কৃশ্চান। হয়তো বা মাদ্রাজী, কারণ নাম রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী।

চেহারাতেও দক্ষিণের মানুষের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ছ-ফুট লম্বা, মোটা মোটা হাড়, মেদবর্জিত দেহ, কালো মাজা রঙ, ঘন কালো মোটা ধরনের চুল। দক্ষিণের লোকদের মতোই বড়ো বড়ো চোখ।

দৃষ্টি কিন্তু বড় বিচিত্র, বলতে হয় আশ্চর্য অপার্থিব। বিষণ্ণ অথচ প্রসন্ন। বর্ষণক্লান্ত স্বল্পমেঘাবৃত শান্ত স্নিগ্ধ আকাশের মতো। ভিতরের নীলাভা মেঘের পাতলা আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসার মতোই লাগে মানুষটির হাসি।

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর গোঁফের আবরণের মধ্য থেকে যখন সুগঠিত দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে হাসির প্রসন্নতার, তখন আশপাশের মানুষগুলির মনের ভিতর-টাতেও যেন সেই প্রসন্নতার ছটা গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

॥ দুই ॥

পাগলা পাদরী এখানে এসেছে আজ বছর আষ্টেক। ১৯৩৬ সালে। সেবার এখানে দুর্ভিক্ষ মহামারী হয়েছিল। এটা উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে। পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চরম পর্যায়ে উঠেছে।

মহাযুদ্ধের দুর্যোগ একটা সাইক্লোনের মতো পৃথিবীর সঙ্গে ভাগ্যাহত বাংলা দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। দেশ সমাজ ঘর ভেঙেচুরে পড়ে গেল। দুর্ভিক্ষে মহামারীতে মানুষ মরছে—ঝড়ে ঝটকা-খাওয়া পশুপক্ষীর মতো। হাহাকার উঠেছে চারিদিকে। হাহাকার! হাহাকার আর হাহাকার! দেশ-জোড়া স্বাধীনতা আন্দোলনও সাময়িকভাবে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ইংরেজ ও আমেরিকার যুদ্ধোদ্যম বাংলাদেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম-ফেণী-গৌহাটি-ডিগবয়-ডিমাপুর-কোহিমার পরে উখরা-পানাগড়-পিয়ারাডোবা-বাসুদেবপুর-খড়্গপুর-মেদিনীপুর নিয়ে যুদ্ধের ঘাঁটির সে এক বিচিত্র বেষ্টনী। পিচঢালা সুগঠিত পথের একটার সঙ্গে অন্যটার যোগাযোগে একটা বিস্তীর্ণ বিরাট ভূখণ্ডব্যাপী মাকড়শার জাল।

গ্রামে গ্রামে অন্নাভাবে হাহাকার. শহরে শহরে ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার ভিক্ষুদের সকরুণ কাতর প্রার্থনা, 'একটু ফ্যান! একমুটো এটোকাঁটা। মা গো! মা।'

দোকানে চালের বদলে খুদ। তার সঙ্গে বালি ধুলো কাঁক৹

এরই মধ্যে চলে মিলিটারি কনভয়। জীপ-ট্যাঙ্ক-ওয়েপনকেরিয়ার, আরও হরেক রকমের বিচিত্রগঠন অটোমোবিল। মাথার উপরে ওড়ে ইংরেজ আর আমেরিকানদের যুদ্ধের প্লেন। গাড়িগুলোতে বোঝাই হয়ে চলে ইংরেজ এবং আমেরিকার পল্টন। তার সঙ্গে নিগ্রো কাফ্রী। যাবার সময় পথের ধারে মাঠে নেমে পড়ে এ-দেশের দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ক্ষাধার্তদের উপর কমলালেবুর খোসা, চিবানো কোয়া ছুঁড়ে দিয়ে যায়। চিৎকার করে ডেকেও যায়. হে—। হাতছানি দিয়েও ডাকে।

হি-হি করে হাসে।

কেউ কেউ আবার টাকা আধুলি ছুঁড়ে দেয়। ওরা দল বেঁধে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুলোর উপর। শুকনো মাটির ধুলো ওড়ে। ওদের সর্বাঙ্গে লাগে।

ওদিকে বিদেশী সৈনিকদের ক্যামেরা ক্লিক-ক্লিক শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। তাদের মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসি। ঘৃণা অনুকম্পা কৌতুক সব কিছু আছে সে-হাসির মধ্যে।

মধ্যে মধ্যে দেখা যায় দল বেঁধে শ্বেতাঙ্গ সেপাইরা জীপে চড়ে চলেছে। সমস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে, অথবা প্রমত্ত কলরব তুলেছে। এবং তাদের ঠিক মাঝখানে শহর-থেকে সংগ্রহ-করা একটা কি দুটো নিম্নশ্রেণীর দেহ-ব্যবসায়িনী, তাদের সকল আনন্দের উৎস, কড়া বিলাতী মদের নেশায় স্খলিতবসনা, অবশদেহ, টলছে বা ঢুলছে, ওদেরই অট্টহাসির সঙ্গে প্রমত্ত উল্লাসে হেসে সুর মেলাতে চাচ্ছে। পথে-ঘাটে যুবতী মেয়ের দেখা পেলেই ডাক—হ্যালো হনি! মাই হনি! হনি হতভাগিনীরা ভয়ে শুকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। দু'চারজন, স্বৈরিণী যারা তারা দাঁড়িয়ে নির্লজ্জার মত দাঁত মেলে হাসে।

পিয়ারাডোবায় একটা এরোপ্লেনের আড্ডা তৈরি হয়েছে। কয়েক মাইল দূরে বাসুদেবপুরে ছোটো একটা। মোরারে ওয়েসলিয়ান চার্চের বাঙলোটার সামনে পুরীর রাস্তা আর স্থানীয় একটা রাস্তার মিশবার জায়গাটার পাশেই শালজঙ্গলের কোল ঘেঁষে প্রান্তরটা খুঁড়ে বড়ো বড়ো পেট্রল-ট্যাঙ্ক বসেছে। এখান থেকে পাইপ-লাইন চলে গেছে বাসুদেবপুরে পিয়ারাডোবা পর্যন্ত। বুলডোজার চালিয়ে মাটি কেটে বন কেটে জঙ্গলে কয়েকদিনের মধ্যে গড়ে তুলেছে বিচিত্র সামরিক ঘাঁটি। ময়দানবের হাতের মায়াপুরীর মতো। পিয়ারাডোবা স্টেশন থেকে সাইডিং এসেছে। বড়ো বড়ো ট্রেন এসে থামে। ট্রেন থেকে নামে প্রমত্ত বিদেশী সৈনিকের দল। মার্কিন সৈন্যদের পকেটে নোটের তাড়া। সঙ্গে প্রচুর টিনবন্দী খাদ্য। বিস্কুট রুটি সাইডিং-এর পাশে, স্টেশনের রেল লাইনের পাশে টিনের ছড়াছড়ি নয়—টিনের গাদা।

হতভাগ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত অর্ধনগ্ন মানুষেরা টিন কুড়িয়ে নিয়ে যায়, চেটে চেটে খায়। দিনরাত আকাশ মুখরিত করে বম্বার ফাইটারগুলো মাথার উপর ঘুরছে। কোনোটা নামছে, কোনোটা উঠছে।

সন্ধ্যের পর ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে ওঠে। ঠুঙি পরানো, কিন্তু তবু তার ছটা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ওদের আড্ডাঘরে বাজনা বাজে, নাচ হয়! হো-হো শব্দে উল্লাসধ্বনি ওঠে। ঝিল্লিমুখর শালবনের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার চমকে ওঠে। মাঝে মাঝে ঝিল্লিরাও বোধ হয় স্তব্ধ হয়ে যায়। বোধ করি প্রায় দুশো বছর আগের সামন্ত রাজাদের আমলে পাইকদের মশালের আলো, মাদলের বাজনা, হা-রা-রা ধ্বনি-তাণ্ডবের পর বনভূমির অন্ধকার এইভাবে আর

চমকায় নি, ঝিঁঝিরাও হঠাৎ থামে নি। বর্গীদের আমলের পর বনভূমির মধ্যে ছড়ানো গ্রামগুলি এমনভাবে আর সভয়ে আলো নিভিয়ে অন্ধকারের আবরণে ঘুমিয়ে পড়ে নি। এসব গ্রামগুলি পাকা রাস্তা থেকে দূরে-দূরে। বনের ভিতরের দিকে। সেখানে তারা অন্ধকারের মধ্যেই শোনে, পাকা রাস্তার উপর ঘর্ঘর শব্দ তুলে মোটর চলছেই, চলছেই। কখনও কখনও পল্টনের হৈ হৈ শব্দ। তারই মধ্যে মেয়ের গলায় খিল্‌খিল হাসি শুনে তারা অন্ধকারের মধ্যেই চোখ বড় করে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবে—এ মেয়েরা কারা? কোন দেশের? কোন জাতের?

*　　*　　*　　*

পাগলা পাদরী সরে গিয়ে আস্তানা গেড়েছেন। পাকা রাস্তা থেকে আরও দূরে জঙ্গলের মধ্যে। তিনি যে গ্রামখানায় ছিলেন, সেই গ্রামখানাকেই সরে যেতে হয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে। অবশ্য টাকা তারা অনেক পেয়েছে।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী জঙ্গলের ভিতরের পায়ে-চলা পথ ধরে বাইসিক্লে চড়ে এসে ওঠেন পাকা রাস্তায়। মোরারের মোড় থেকে অনেকটা তফাতে, বিষ্ণুপুরের দিকে এগিয়ে এসে বুধবার শনিবার তিনি ওন্দায় যান। ওখানকার লেপার অ্যাসাইলামে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা করেন। পুরী থেকে এই অঞ্চলটায় কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। কুষ্ঠ-অন্ধত্ব এ-অঞ্চলের অভিশাপের মতো। সপ্তাহে দু-দিন রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী ভোরবেলা উঠে যান, ফেরেন বিকেলবেলা। সেদিন আষাঢ়ের প্রথম। কৃষ্ণস্বামী বিকেলবেলা ফিরছিলেন। তাঁর বিচিত্র পরিচ্ছদের উপর মাথায় একটা দেশী টোকা, চোখে একটা গগ্‌লস। বৃষ্টি তখনও নামে নি। আষাঢ়ের দিন—দীর্ঘতম দিন এবং সব থেকে বেশী উত্তাপ; পৃথিবীর নিকটতম সূর্যের তাপে পৃথিবী যেন ঝলসাচ্ছিল। চষা মাঠের উপর গরম বাতাসে ধুলো উড়ছিল।

বাবাসাহেব তাঁর অভ্যস্ত গতিতে বাইসিক্ল চালিয়ে চলেছেন। গোটা রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে একপাশ ধরেই চলছেন তিনি। প্রচণ্ড জোরে আসে মিলিটারী ট্রাকগুলি, মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় অথবা হিসেবের ভুল প্রচণ্ড জোরে গিয়ে ধাক্কা মারে পথের পাশের গুঁড়িতে। ভেঙে উল্‌টে যায় গাড়ি; চালক আরোহীর আর্তনাদ শোনা যায়। কখনও পথ ছেড়ে গিয়ে পড়ে মাঠের উপর। দু-চারখানা উল্‌টে যায়, আরোহীরা ছিটকে পড়ে। আঘাত কম হলে উঠে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে হো-হো করে হাসে। দু-চারখানার চালক আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে স্টীয়ারিং ধরে চষা মাঠের উপর দিয়ে কিছু-দূর চালিয়ে গিয়ে গতিবেগ সম্বরণ করে

ব্রেক কষে। গাড়ি থেকে নেমে নিজের ভাষায় একটা অশ্লীলতম গালাগালি উচ্চারণ করে। অকারণে। আশ্চর্য, ঈশ্বরের নাম করে না।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী ভাবতে ভাবতেই চলেছিলেন। বর্গীর, হাঙ্গামার সময় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধের কালে, পাইক-বিদ্রোহের সময় কি এমনই হয়েছিল দেশের অবস্থা? মানুষ কি এমনি করেই দেউলে হয়ে গিয়েছিল? অন্তরের সঞ্চয় তার এত ক্ষীণ এবং ক্ষণজীবী?

হায় বুদ্ধ! হায় ক্রাইস্ট! হায় ঈশ্বরের পুত্র! হায় শচীনন্দন গৌরাঙ্গ!

এ-দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত হৃতসর্বস্ব শিক্ষায়-বঞ্চিত এই মানুষগুলির তবু তো দোহাই আছে। হয়তো ভগবানের কাছে রেহাইও আছে। কিন্তু ওই বিদেশী সৈনিকগুলি! এদের চেয়েও ওরা হতভাগ্য। মৃত্যু-ভয়ে অধীর। অসহায়। অহরহ দুরন্ত ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ওরা আকণ্ঠ মদ্যপান করে জীবন নিয়ে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, গাছে ধাক্কা খেয়ে মরছে। গাড়ি উল্‌টে পড়ে চেপটে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে পথের মধ্যে যা পাচ্ছে ভোগ করবার, তা-ই ভোগ করে যাচ্ছে। কোথায় শিক্ষা, কোথায় সভ্যতা, কোথায় জীবন-গৌরব?

হায় ক্রাইস্ট!

ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে তোমার মৃত্যুই সত্য। রেসারেকশন কল্পনা। মানুষের রচনা করা মিথ্যা আশ্বাস!

হায় বুদ্ধ! হায় চৈতন্য!

চৈতন্যদেব এই পথে পুরী থেকে গয়া গিয়েছিলেন। খোলে করতালে ঈশ্বরের নামে মুখরিত হয়েছিল এ-সব অঞ্চলের আকাশ-বাতাস।

বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব দেবতারও মিথ্যা। পারলে না রক্ষা করতে মানুষকে। রাজা গোপালদেবের বেগার মিথ্যে। নাম করায় কোনো ফল হয়নি। আত্মরক্ষার শক্তি না থাক, ওদের প্রচণ্ড বর্বর শক্তিকে ঠেকাবার মতো শক্তি মানুষের না থাক, আত্মাকে রক্ষা করার শক্তিও তারা পেলে না। জপের মালার ঝুলিটা নেহাতই ছেঁড়া নেকড়ার ঝুলি।

সামনেই লেবেল ক্রসিং। বাইসিক্ল থেকে কৃষ্ণস্বামী নামিয়ে দিলেন তাঁর পা দুটো। ছ-ফুট লম্বা মানুষটির পক্ষে ওই যথেষ্ট। ক্রসিঙের পাশেই গেমট্যানের বাসা।

কৃষ্ণস্বামীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। বাস্তবে ফিরে এলেন। এ-ই জীবন। এ-জীবন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ নিজের কাজ করতে হবে।

'বংশী! বংশী হে—!'

খুলে গেল গেটম্যানের ঘরের দরজা। বেরিয়ে এল গেটম্যান রামচরণ।

'বাবাসাহেব!

'হুঁ। বংশী কই হে?'

বংশী রামচরণের ছেলে। বংশীর কুষ্ঠ হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থা। কৃষ্ণস্বামীই যাওয়া-আসার পথে ছেলেটির মুখের চেহারা দেখে ধরেছেন। এবং অনেক বুঝিয়ে চিকিৎসা করাতে রাজী করিয়েছেন। এ-রোগের ইনজেকশানে বড়ো যন্ত্রণা হয়। বংশী অধিকাংশ দিন পালায়। কৃষ্ণস্বামী বংশীকে প্রলুব্ধ করবার জন্য কিছু-না কিছু নিয়ে আসেন। কোনোদিন একটা পুতুল। কোনোদিন একটা ছবি। কোনোদিন কিছু খাবার। কোদিন অন্য কিছু। আজও বংশী পালিয়েছে। রামচরণ চারিদিকে তাকিয়ে দেখেও ছেলের সন্ধান পেলে না। সে তারস্বরে ডেকে উঠল—'ব—বং—শী রে—। বং—শী—ঈ—।'

কৃষ্ণস্বামী বাইসিক্লটি গেটম্যানের ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে, দাওয়ার উপর উঠে দাঁড়ালেন। রামচরণের স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে একটা মোড়া পেতে দিলে কৃষ্ণস্বামী মোড়ায় বসে তাঁর আলখাল্লার মতো জামাটার পকেট থেকে বের করলেন একটি বাঁশি। বললেন, 'এইটো বাজিয়ে ডাকো হে। হুঁ। বাঁশির ডাক শুনলে কাছে-পিঠে থাকলে আখুনি বেঁরায়ে আসবেক।

তার আগেই কিন্তু সামনে রাস্তার ধারের একটা আমগাছের উপর থেকে ঝপ করে বংশী লাফিয়ে পড়ল। 'আসছেক গ, আসছেক গ! সেই গ বাবা, সেই বটেক গ!'

কৌতুহলের তীব্রতায় তার ঈষৎস্ফীত মুখখানা যেন থমথম করছে। চোখ দুটো জলজ্বল করছে।

'কে? কে আসছেক হে বংশীবদন?' হেসে প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণস্বামী। 'আমি তুমার লেগ্যা কেমন বাঁশি এনেছি দেখো হে?' বংশীবদন লেগ্যা বংশী।'

বংশীর মন কিন্তু বাঁশিতে ভুলল না। তার স্থির জলজলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সামনের রাস্তার দিকে। দূরে একটা বাঁক, সেই বাঁকের মাথায়। সে বোধ হয় বাবাকেই বললে, 'সেই মেয়াছেল্যাটা গ। সেই মাথায় টকটকে রাঙা ফেটা বাঁধা! গাছের শিরডগাল থেকে আমি দেখ্যাছি। ঝড়ের পারা গাড়িটা আসছেক, আর রাঙা ফেটা বাঁধা সি বসে রইছেক। রোদ লেগ্যা ঝকমকো করছেক। হুঁ। উই—উই—উই।'

দূরে বাঁকের মাথায় জীপের গর্জন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সত্যই একখানা জীপ আসছে। সত্যই পিছনের পড়ন্ত রোদে কারও মাথার গাঢ় লাল টুপি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

রামচরণ বললে, 'দেখলাম অনেক বাবাসাহেব। কিন্তুক এমন মেয়েছেল্যা আমারা দেখি নাই বাবার কালে। মেমসাহেব গো!'

হাসলেন কৃষ্ণস্বামী। ধুতি-চাদর আর চটির দেশের শুধু ধুতি সম্বল দরিদ্র রামচরণ এবং বালক বংশীবদনের মন কোনো বিচিত্রবাসিনী বিদেশিনীকে দেখে বিস্ময়ে আভভূত হয়ে গেছে। জীপখানা সত্যই ঝড়ের বেগেই আসছে। মেয়েটা —হ্যাঁ, এরা বলেছে ওটি মেয়ে—লাল-টুপি পরা মেয়েটি যেন ঢুলছে টলছে। এপাশ থেকে ওপাশ। জীপের সামনে চালকের পাশেই বসে টলছে। মনে হচ্ছে শ্বেতাঙ্গিনী। পাশে চালক একজন বলিষ্ঠদেহ শ্বেতাঙ্গ। গায়ে শুধু গেঞ্জি, মাথায় টুপিটা আছে, অফিসারের টুপি। স্পীড কমিয়ে বাঁক নিয়ে লেবেল ক্রসিংটা পার হয়ে চলে গেল গাড়িটা। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ব্রেক কষে দাঁড়াল। তার ঝাঁকিতে মেয়েটা টলে পড়ে যেতে যেতে রয়ে গেল। সামনের ড্যাশ-বোর্ডে উপুড় হয়ে পড়ে কোনোক্রমে আঁকড়ে ধরল একটা রড। আবার পিছু হটতে লাগল গাড়িটা। এসে দাঁড়াল রামচরণের বাড়ির সামনে। শ্বেতাঙ্গটি নামল।

তার ট্রাউজারের কাপড়ের চিক্কণতা দেখে কৃষ্ণস্বামী বুঝতে পারলেন আমেরিকান অফিসার।

হে—ম্যান! ওযাটার ওয়াটার! পানি!

জড়িত কণ্ঠে, আদেশের স্বরে মেয়েটিও বললে, 'পানি লাও! ই—উ ইউ? শুনতা নেহি!'

কৃষ্ণস্বামী উঠে দাঁড়ালেন। চোখের গগ্‌লসটা খুলে দাওয়া থেকে নেমে এসে জীপের কাছে দাঁড়ালেন। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলেন। বিচিত্রবেশিনীই বটে। পরনে পাশ্চাত্ত্যের আধুনিকতম ফ্যাশনের লালরঙের লম্বা পেন্টালুন বা শ্ল্যাক্‌স, গায়ে হাফ হাতা টেনিস-কলার মিহি সিল্কের ব্লাউস, মাথায় রাঙা টকটকে সিল্কের কাপড়ের লম্বা ফালির শিরোভূষণ। আশ্চর্যভাবে লালসা-উদ্রেক করা মোহিনী বেশ। তেমনি যেন নির্লজ্জ!

আমেরিকানটি তাঁর সামনে এসে পেন্টালুনের পকেট থেকে একখানা নোট বের করে সামনে ধরে বললে, 'ডোণ্ট যু আণ্ডারস্টাণ্ড, ম্যান? ওয়াটার, পানি—পানি—'

মেয়েটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ইউ সোয়াইন!'

আমেরিকানটি আবার ধমক দিয়ে উঠল, 'ইউ বিচ, স্টপ, আই সে—ইউ স্টপ! কীপ সাইলেণ্ট!'

কৃষ্ণস্বামী হেসে পরিষ্কার ইংরিজীতে বললেন, প্লীজ, প্লীজ ডোণ্ট অ্যাবিউজ হার লাইক ছাট, শী হুজ ইল!'

'নাথিং। ইউ ডোণ্ট নো ম্যাম, একটা পুরো বোতল মদ ওই কুত্তিটা ঢক-ঢক করে গিলেছে। মাতাল হয়েছে। জল দাও। ভেবেছিলাম রাস্তার ধারে পুকুর পেলে ওকে চুবিয়ে ওর নেশা ছুটিয়ে দেব। তোমাদের বাড়ি দেখে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাবে। নেশা, কেবল নেশা।'

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'অফিসার, আমি একজন ডাক্তার! আমি দেখতে পাচ্ছি, ও অসুস্থ। আমি বলছি তুমি ওকে নামাও। ওর এক্ষুনি শুশ্রূষার দরকার। আমার কল-ব্যাগে ওষুধ আছে। এক দাগ ওষুধও দিতে চাই। বিশ্বাস করো আমাকে, আমি মেডিক্যাল কলেজের পাস-করা ডাক্তার।'

বলতে বলতে ওদিকে মেয়েটি ঢলে পড়ে গেল গদির উপর।

কৃষ্ণস্বামী গিয়ে তাঁর দীর্ঘ দুটি বাহু প্রসারিত করে তাকে তুলে নিলেন। বললেন, 'রামচরণ, তোমার খাটিয়াটা পেড়ে দাও।'

'স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললেন, 'অফিসার, প্লীজ ওর মাথার বাঁধনটা, কাপড়ের ফালিটা, খুলে দাও।'

হাত বাড়িয়ে একটু ঝাঁকি দিয়েই মাথার কাপড়ের ফালিটা টেনে খুলে ফেলে দিল অফিসারটি। আশ্চর্য ঘন কালো একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়ল।

কৃষ্ণস্বামী সযত্নে তাকে শুইয়ে দিলেন খাটিয়ার উপর।

অনেক শুশ্রূষার পর মেয়েটির চেতনা হল। একদাগ ওষুধও তাকে খাইয়েছিলেন কৃষ্ণস্বামী। চেতনা হবার আগে হড়হড় করে বেশ খানিকটা বমি করলে মেয়েটি। তার গায়ের জামাটা ভেসে গেল। খানিকটা কৃষ্ণস্বামীর হাতে জামায় লাগল। দুর্গন্ধে জায়গাটার বায়ুস্তরও যেন দূষিত হয়ে উঠল। কৃষ্ণস্বামী সযত্নে সব ধুয়ে মুছিয়ে দিলেন। অফিসারটি নির্লিপ্তের মতো বসে বসে দেখলে, আর সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে গেল। মধ্যে দু-চারটে কথা বলছিল। সবই প্রশ্ন। যেন থেকে থেকে হঠাৎ মা উঠেছিল। পারম্পর্যহীন। একটা প্রশ্নের সঙ্গে আর একটার কোনো সম্পর্ক নেই।

চৈতন্যহীন মেয়েটি অসাড় হয়ে পড়ে ছিল; তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইজ্ন্ট্ শী বিউটিফুল? ফাইন আইজ অ্যাণ্ড আইলিডস—ইজ ন্ট্ ইট্? হে, হোয়াট ডু য়ু সে?'

কৃষ্ণস্বামী শুশ্রূষা করতে করতেই বললেন, 'ইয়েস, শী হ্যাজ গট এ সুইট ফেস।'

সত্য, মেয়েটির রূপ আছে, এবং রূপে আশ্চর্য মোহও আছে। বিশেষ করে মাথার চুল কালো আর অপরূপ সুন্দর চোখ ও চোখের পাতা। চোখের পাতার লোমগুলি সুদীর্ঘ। সুন্দর আ'ত চোখ দুটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

আবার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'ইজ ইট এনিথিং ভেরি সীরিয়াস ?'

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'হতে পারত। নেশার উপরে এই গরমে হীট্ স্ট্রোক হতে পারত। অবশ্য এখনও আশঙ্কা যায় নি!'

আবার কয়েক মিনিট পর প্রশ্ন হল, 'তুমি বললে, তুমি একজন ডক্টর। কোয়ালিফায়েড মেডিক্যাল ম্যান। মনেও হচ্ছে তাই। কিন্তু এ-রকম পোশাক কেন তোমার ?

'আমি একজন সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদের নানান রকম পোশাক আছে। কিন্তু এই রঙটা হল সবার রঙ।'

'ক্যান ইউ টেল ফরচুন ?'

'নো।'

'শুধু ডাক্তার ?'

'হ্যাঁ, আর সন্ন্যাসী!

'একি তোমার গলায় ও কি ? ক্রুশ ?'

'হ্যাঁ ক্রুশ। আমি ভারতীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী!'

'ভারতীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী! ইয়ু আর এ রেভারেণ্ড!'

কৃষ্ণস্বামী উত্তর দিলেন না। মেয়েটির সেবায় মন দিলেন। মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জ্যামিতির দুটি কোণ সমান দুটি ত্রিভুজ যেমন মিলে যায় তেমনি দুটি মুখ মিলে যাচ্ছে।

আবার কিছুক্ষণ পর অফিসারটি বললে, 'বলতে পার এই ধরনের মেয়ে তোমাদের দেশে কত আছে ? স্ট্রেঞ্জ গার্ল!' আপন মনেই বলতে লাগল, 'ওর সঙ্গে আমার দেখা পুরীতে। অন দ্য সী-বীচ। স্ট্রেঞ্জ গার্ল! এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। আশ্চর্য বন্য! কী হাসতে পারে! কী প্রচণ্ড রাগে! কী মদ খায়।' সিগারেট একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আবার বললে, 'সেই থেকে আমার সঙ্গে ঘুরছে।' আবার বললে, 'শী ইজ এ স্পোর্ট—কিন্তু বড়ো ওয়াইল্ড্।

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'জ্ঞান হচ্ছে। তোমার কাছে আর একটু মদ আছে ? শী নীডস—'

মেয়েটি মদ খেয়ে মুখ একটু বিকৃত করে বললে, 'ওয়াটার—প্লীজ! ওয়াটার—টাণ্ডা জল!'

মুখে জল দিলেন কৃষ্ণস্বামী। মেয়েটি আবার হাঁ করলে, আবার জল দিলেন কৃষ্ণস্বামী। তারপর চোখের নীচে আঙুল রেখে হেসে বললেন, 'লেট মি লুক অ্যাট ইওর আইজ। লুক অ্যাট মাই ফেস।'

মেয়েটির ভুরু কুঁচকে উঠল, তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল দৃষ্টি।

আমেরিকান অফিসারটি বললে, 'হে—ডোণ্ট—; ও সব কোরো না ডু-ই হীয়ার?' তারপরে বললে হঠাৎ চিৎকার করে, হঠাৎ চড় মেরে বসে। 'শী ইজ হিস্টিরিক।'

ততক্ষণে কিন্তু মেয়েটা ধড়মড় করে উঠে বসেছে। তীব্র দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, ইউ ব্লাকি—লীভ মি— ; ছেড়ে দাও আমাকে— কালা আদমী কোথাকার।'

অফিসারটি চিৎকার করে উঠল, 'শাট আপ, ইউ বিচ! শাট আপ, আই সে।'

কৃষ্ণস্বামী হেসে প্রসন্নকণ্ঠে মেয়েটির কপালে ভিজে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি অসুস্থ। আমি ডাক্তার। আমার কথা তোমার শোনা উচিত। আর একটুক্ষণ শুয়ে থাকো তুমি। সুস্থ হয়ে উঠবে। তোমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে আমি জানি। তুমি এই বড়িটা খেয়ে ফেলো। প্লীজ! পীস অ্যাণ্ড বি স্টিল।'

মেয়েটি যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাঁর দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কৃষ্ণস্বামী ব্যাগটা খুলতে খুলতে আবৃত্তির সুর এনে বলেই চলেছিলেন, 'পেশেন্স ইউ ইয়ং রোজ-লিপ্‌ড্‌ মেড—পেশেন্স প্লীজ.—'

সেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের অংশ আবৃত্তি করেছিলেন। এক্ষেত্রে খেটে গেছে।

অফিসারটি হেসে উঠল; 'হে ডক্—ইউ আর এ পোয়েট—আঁ—দ্যাটস্ ফাইন।'

মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে শুয়েছে এরই মধ্যে। বি স্তৃণ ললাটে কয়েকটি রেখা বিস্ময়ের বা প্রশ্নের কুঞ্চনে পুষ্ট হয়ে জেগে উঠেছে। চোখের কোণে কালো দাগ জীবনে অমিতাচারের রথের চাকার দাগের মত।

'নাও, খেয়ে ফেলো!'—একটা পিল বের করে কৃষ্ণস্বামী ডাকলেন।

বড়িটা খেয়ে মেয়েটি উঠে বসল। বললে, নো। নেভার। সে হতে পার না তুমি। নো।' তারপর হাত বাড়িয়ে অফিসারকে বললে—'এ স্মোক প্লিজ! নেল-পালিশ-লাগানো আঙুলের ডগায় নিকোটিনের দাগ। অফিসারটি সোৎসাহে বলে উঠল; 'নাউ শী ইজ ও-কে। টেক-ইট। গেট আপ মাই হনি। হিয়ার ইজ ফায়ার।' সে সিগারেট দিল মেয়েটিকে। এবং লাইটারটা জেলে ধরিয়ে দিল সিগারেটটা।

তারপর কৃষ্ণস্বামীর দিকে চেয়ে বললে, 'ও ঠিক হয়ে গেছে, ডক, ও-কে। আমরা এবার যাব। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে এই নাও।'

খান দুয়েক দশ টাকার নোট বের করে ধরলে।

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু মাপ করো আমাকে। এই আমার ধর্ম। এই আমার ঈশ্বরোপাসনা। ক্রায়েস্টের নামে তোমাকে অনুরোধ করছি।'

মেয়েটি স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এবং অক্লান্ত ভাবে সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে।

মুখ ফিরিয়ে নিলেন কৃষ্ণস্বামী।

জীবনের বন্ধ-করা ঘরে যেন ভিতর থেকে ঘা পড়ছে। কে যেন মাথা ঠুকছে।

গাড়িখানা গর্জন করে উঠে চলে গেল। বংশী বললে—'মেয়্যাটা তাকায়ে বইছে দেখ বাবা। বাবাসাহেব উয়ার নেশাটো ছুঁটায়ে দিলেক কিনা। বেগেছে!'

॥ তিন ॥

কৃষ্ণস্বামী তাঁর আশ্রমে ফিরে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসেছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক।

ঝুমকি এসে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে লাল সিং আর সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'সিং, বাবাসাহেবের কী হইছে।'

লাল সিং আকাশের দিকে তাকিয়ে কোন দূরে গর্জমান উড়ো জাহাজের সন্ধান করছিল। ঝুমকির কথায় সে ফিরে তাকালে, 'কী হয়েছে?'

'বিড়বিড় করে কী বলছে, মন্তর-টন্তর বুলছে শুনলাম আমি। ভয়ে পালিয়ে এলাম। চা দিতে লারলাম। তুরা দে গে যা। বাবা রে?'

মন্ত্র-টন্ত্রের মতো কিছু শুনলে ঝুমকির ভয় করে। মনে হয় হয়তো তাকেই ডাইনি ভেবে মন্ত্র আওড়াচ্ছে। দিনের বেলা হলে সে পালিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। চুপ করে বসে থাকে ঝোপের ভিতরে খরগোশ-শজারুর মতো। অনেকক্ষণ কেটে গেলে ভয়টা ধীরে ধীরে কমে আসে। তখন গুনগুনিয়ে গান করে, তারপর উঠে আসে।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে লাল সিং কৃষ্ণস্বামীর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সে জানে, মধ্যে মধ্যে বাবাসাহেব বাইবেলের সার্মন আপন মনে বলে যান। সে আপনার কপালে গায়ে প্রথা মতো আঙুল ঠেকিয়ে 'আমেন' বলে।

সত্যই বাবাসাহেব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আপন মনে বাইবেল বলে যাচ্ছেন। বাইবেল নয়, কৃষ্ণস্বামী আবৃত্তি করছিলেন,

It is the cause—it is the cause my soul—

Let me not name it to you, you chaste stars—

It is the cause.

Yet I'll not shed her blood.

Nor scar that whiter skin of her's than snow.

শেক্সপীয়রের ওথেলো থেকে আবৃত্তি করেছেন কৃষ্ণস্বামী। আজ রামচরণের বাসা থেকেই ওথেলো মনে পড়ে গেছে। ওই মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে তিনি ওথেলোর কথা কত ব্যবহার করেছেন।

'লেট মি লুক অ্যাট ইওর আইজ। লুক অ্যাট মাই ফেস। পীস অ্যাণ্ড বী ষ্টীল।'

ওই সবই ওথেলো নাটকের সংলাপ।

'পেশেন্স, ইউ ইয়ং রোজ-লিপ্‌ড্‌ মেড—'

এরও অনেকটা অংশ তাই। আমেরিকান অফিসারটির এসব বুঝবার কথা নয়। শাক মদ্য নারী-হুল্লোড়-যুদ্ধাস্ত্র এ ছাড়া এ-সব বুঝলে যুদ্ধ চলে না। অবশ্য কিছু কিছু উচ্চস্তরের লোক আছে হয়তো অনেক কবি কলম ছেড়ে কোমরে রিভলভার ঝুলিয়ে রাইফেল কাঁধে এসেছে, কিন্তু তারা ক-জন? তারা অন্তত এমনিভাবে মেয়েটিকে ঘাড়ে নিয়ে বেড়াত না। বেড়ালে বুঝতে হবে—তাদের জীবন-সত্য 'হেসে নাও দু'দিন বইত নয়' ছাড়া আর কিছুই নয়। বাকী সব তারা মুছে দিয়েছে। হয়তো বা ভুলেই গেছে। রিনা ব্রাউনেরও তাই হয়েছে। অতীত বোধ হয় মুছে গেছে। নইলে এমন কি করে হল? সেই রিনা ব্রাউন! আশ্চর্য—ওথেলোর সেই অবিস্মরণীয় শব্দগুলি কানে ঢুকল কিন্তু তবু স্মৃতির ঘরের দরজা খুলল না? আশ্চর্য।

না। আশ্চর্যই বা কিসে? মদের নেশায় প্রমত্ত রিনা ব্রাউনই—সকল বিস্ময়ের সীমা শেষ। মদের প্রভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার স্মৃতি, বুদ্ধি—বোধ হয় সমস্ত সত্তাকে।

চায়ের কাপটি নামিয়ে দিয়ে লাল সিং সসম্ভ্রমে সশ্রদ্ধ পদক্ষেপে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ফাদার ঈশ্বরকে ডাকছেন।

রিনা ব্রাউনের মূল্যের তুলনায় একদিন ঈশ্বরের মূল্যও তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণস্বামীর কাছে। তখন তিনি কৃষ্ণস্বামী ছিলেন না। তখন তিনি ছিলেন কালাচাঁদ গুপ্ত। অবশ্য তখন কালাচাঁদ ঠিক ঈশ্বর মানত না। এবং কালাচাঁদ

নাম পালটে সভ্য তখন সে কৃষ্ণ ইন্দু কৃষ্ণেন্দু হয়েছে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

কালাচাঁদ কৃষ্ণেন্দুর প্রথম নাম। পাহাড়ী নদীর মত বন্য। কালাচাঁদ ঈশ্বরে অবিশ্বাস করত না কিন্তু বিশ্বাস করত নিজের প্রাণশক্তিকে। বন্য পাহাড়ী নদীর মতো শুধু প্রাণচঞ্চল বেগবানই নয়—খানিকটা বর্বরও বটে। মেডিকেল কলেজে ঢুকবারও আগে।

পল্লীগ্রামের ছেলে। কালো হিলহিলে লম্বা, বড়ো বড়ো চোখ, কপাল পর্যন্ত পুরু ঘন চুল, মুখে চোখে পল্লীর সারল্য। পল্লীর কর্কশতায় ঈষৎ মলিন। কিন্তু আশ্চর্য প্রাণবন্ত, বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ। পল্লীগ্রামের নামকরা কামারের গড়া খাঁটি ইস্পাতের দায়ের মতো। ধারালো তীক্ষ্ণ অনমনীয় দৃঢ়; কিন্তু শান-যন্ত্রে ঘষা-মজা পালিশ-করা ঝকঝকে নয়, একটু ময়লা।

পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা বৈদ্যবংশের সন্তান। কিন্তু সে-খ্যাতি তখন অস্তোন্মুখ। প্রপিতামহ এবং তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন প্রসিদ্ধ ভিষগাচার্য। আয়ুর্বেদের প্রসার কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার উৎসাহ কমে গিয়েছিল। তিনি আয়ুর্বেদে মন না দিয়ে মন দিয়েছিলেন চাষবাস ও ধর্মে কর্মে। একমাত্র ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবেন এই বাসনা। গ্রাম্য ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করে কালাচাঁদ আই. এস. সি. পড়তে এল কলকাতার সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে। আই. এস. সি. পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকবে। সামান্য কৌতুকে হা-হা করে হাসে, দুড়দুড় করে সিঁড়ি ভেঙে নামে, ক্লাসের আশিটি ছেলের মাথার উপরে হিলহিলে লম্বা কালাচাঁদের মাথাটা প্রায় ছ ইঞ্চি উঁচু হয়ে উঠে থাকে। অশুদ্ধ গ্রাম্য-উচ্চারণে অসংকোচে কথা বলে। অফুরন্ত কৌতূহল। অহরহই প্রশ্ন—কী? কী? ক্যানে? ক্যানে? তার সঙ্গে সুরের টান। শহরের ছেলেরা হাসে। সে-সব কালাচাঁদ গ্রাহ্য করে না। সেও হাসে। কখনও কখনও গ্রামে-বসে-শেখা পুরনো ব্যঙ্গ কথা বলে শোধ নিতে চেষ্টা করে।

বলে, 'তোমরা যে আমাকে ভাব বল হে! তাহলে মামাকে কী বল?' বলে অট্টহাসি হাসে।

হঠাৎ কালাচাঁদ বিখ্যাত হয়ে গেল। তখন সেণ্টজেভিয়ার্সের পুরনো বাড়ি! কলেজের দক্ষিণে প্রশস্ত খেলার মাঠ। সে-মাঠে টিফিনের সময় কলেজের ছেলেরা ফুটবল খেলে। সবই কলকাতার ইস্কুলের ছেলে। মফস্বলের ছেলেরা দাঁড়িয়ে দেখে। অন্তত গ্রাম থেকে সদ্য-আগত ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেরা নামতে সাহস করে না। খেলোয়াড়দের সংখ্যা বাইশে আবদ্ধ থাকে না। বাইশ

ছাড়িয়ে যায়। কয়েকদিন দেখে, বোধ করি মাস দেড়েক পর, আগস্ট মাস তখন, কালাচাঁদ বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে গ্রাউণ্ডের ধারে দাঁড়াল। গোল লাইনের ধারে। টিপিটিপি বৃষ্টিতে পিছল মাঠ। খেলোয়াড়রা বল মারতে গিয়ে পিছলে পড়ে পাঁকাল মাছের মতো চলে যাচ্ছে। হো-হো শব্দে হাসিতে ভেঙে পড়ছে দর্শক ছেলেরা। একটা সিক্সইয়ার্ড শট। গোল-কীপার বলটি ঠিক জায়গায় রেখে সরে এল। ফুলব্যাক্ বল মারতে গিয়ে পা তুলে পিছলে পড়ে চলে গেল খানিকটা দূর। মুহূর্তে কালাচাঁদ পায়ের জুতো খুলে ফেলে ছুটে গিয়ে বলটা কিক্ করে দিল। নিপুণ খেলোয়াড়ের শক্তিশালী শট, বলটা উঁচু হয়ে পড়ল সেণ্টার লাইন পার হয়ে ওধারের হাফ-ব্যাক্ লাইনের সামনে।

'কে হে ছেলেটা? কে হে? খোঁজ পড়ে গেল। কলেজ টিমের ক্যাপ্টেন থার্ড ইয়ারের আশু দাস এগিয়ে এলেন। 'কী নাম? কোথায় খেলেছ? কোন পজিশনে খেল? ম্যাচ খেলেছ?'

'হ্যাঁ, অনেক ম্যাচ খেলেছি। 'এতগুলন' মেডেল পেয়েছি। সিউড়ি, বর্ধমান, কাঞ্চনতলা, শান্তিনিকেতন ম্যাচ খেলেছি। পাঁচখানা বেস্ট প্লেয়ারস মেডেল আছে। লেফট আউটে 'খেলাই'। কর্নার কিকে বল গোলে ঢুকিয়ে দোব। ফুলব্যাকেও খেলতে পারি। লেফট ব্যাক। সেণ্টারেও 'খেলিয়েছি'। গোলে পারি। দেন ক্যানে একটা কর্নার কিক্ করে দেখিয়ে দি। দেবেন?'

'খেলাই' মানে খেলি—'খেলিয়েছি' মানে খেলেছি—ক্যানে মানে কেন—। লোকে শুনে হাসে কিন্তু কালাচাঁদ একবিন্দু লজ্জা পায় না।

'আনো তো হে বলটা। আনো তো!'

বলেছিলেন ক্যাপ্টেন। এবং কালাচাঁদকে কর্নার কিক্ ক[illegible]তে দিয়েছিলেন। কর্নার কিকে সত্যই বলটা গোলে ঢুকে গেল। একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে বলটা গোলের সামনে সিক্সইয়ার্ড সীমার ভিতরে এসে বেঁকে গিয়ে একেবারে কোণ ঘেঁসে গোলে ঢুকে গেল। সচরাচর এমনটি দেখা যায় না। এটা কালাচাঁদের পা আবিষ্কার করেছিল। সেণ্টজেভিয়ার্সের ক্যাপ্টেন অন্তত দেখেন নি। সঙ্গে সঙ্গে কালাচাঁদ টিমের প্লেয়ার হয়ে গিয়েছিল।

কালাচাঁদকে লেফট আউটে খেলতেও দেওয়া হল। হিলহিলে লম্বা কালাচাঁদ পায়ে বল নিয়ে ছুটল। সে-ছোটা তীরের মতো। একে বারে ওপারে লাইনের ধার থেকে বল মারলে। পড়ল গোলের সামনে। নিজে পা পিছলে পড়লও কয়েক বার। লোকে হাসলে। কিন্তু কালাচাঁদ সে শুনতেই পেলে

না। হঠাৎ এক সময় রেগে এসে সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে বললে, 'একটা গোলে ঢোকাতে পারলেন না? আমাকে খেলতে দেবেন সেণ্টারে?'

কালাচাঁদ সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে এসেই বল ধরে একটু উপরে তুলে গোলকীপারের হাতে যেন ফেলে দিলে। গোলকীপার বল ধরার জন্য হাত বাড়াল, কালাচাঁদ লাফ দিয়ে বল মাথায় নিয়ে পড়ল গোলকীপারের উপর। পড়ল দু'জনেই। কালাচাঁদের হেডে বল গোলে ঢুকে গেল।

দ্বিতীয়বারে গোলকীপার তাকে মারলে। নাক থেকে রক্ত পড়ে জামাটা ভেসে গেল।

মিনিট কয়েক মুহ্যমান হয়ে রইল, তার পরই উঠে দাঁড়াল। মাথার চুলগুলো রক্ত এবং কাদামাখা হাতেই সরিয়ে দিয়ে গ্রাউণ্ডের ভিতর নেমে গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেন দাস তাকে হাতে ধরে বললেন, 'না' আজ আর নয়। ঘরে ঘরে মারামারি করে না।' কালাচাঁদ আশ্চর্য ছেলে। সে হেসে ফেললে। বললে, 'কী করে জানলেন আমি মারামারি করব? ওঃ খুব বুদ্ধি আপনার।'

হেসে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমরাও তো খেলি।'

কালাচাঁদ বললে, 'তা বটে। আমাকে মারলে আমি না-মেরে ছাড়ি না।'

কালাচাঁদ বিখ্যাত হয়ে গেল কলেজে সেই দিনই। কিন্তু ওখানেই তার খ্যাতির শেষ নেই। দিন দিন খ্যাতি তার বাড়তে লাগল। কিছুদিন, বোধ-হয় মাসখানেক পরেই, বাঙলার অধ্যাপক ক্লাসে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বাঙালী অধ্যাপক, সাহিত্যরসিক, ক্লাসের মধ্যে কে উচ্চকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করছে। সদ্য-খ্যাতি-পাওয়া কালাচাঁদ আদুরে দুর্দান্ত ছেলের মতো ঢুই ক্লাসের মধ্যে অধ্যাপকের ডায়াসে উঠে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে দিয়েছে। পিছনে একটু কথা ছিল। ক্লাসের রোল নম্বর ওয়ান, মৌলালীর কোন মুসলমান নেতার ছেলে—হালিম, ক্লাসে দুর্দান্তপনা করে দু'টি পিরিয়ডের মাঝখানে উঠে ডায়াসের উপর উঠে দাঁড়ায়। অধ্যাপকদের নকল করে ভেঙায়। যা খুশি তাই বকে। বোর্ডে খড়ি দিয়ে কার্টুন আঁকতে চেষ্টা করে। একটা ক্লাউনের মতো। ছেলেরা হাসে। হঠাৎ সেদিন বাঙলার ক্লাসে হালিম নেই, সে বাঙলা পড়ে না। কালাচাঁদ বাংলা কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিল,

'আজি এ প্রভাতে—প্রভাত বিহগ—
কী গান গাইল রে।
অতিদূর—দূর আকাশ হইতে—
ভাসিয়া আইল রে।'

তারপর বললে, শোনো বন্ধুগণ, বয়েজ—বয়েজ—মাই ফ্রেণ্ডস্—কমরেডস !'

কমরেড শব্দটা তখন এসেছে। উনিশশো আটত্রিশ-উনত্রিশ সন।

'আমি কবিতা আবৃত্তি করছি শোনো। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।'

কণ্ঠস্বর তার ভাল ছিল না। তার উপর বয়সের গাঢ়তা কণ্ঠস্বরে তখন সদ্য সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। গলাটা তখন ভাঙা-ভাঙা, খানিকটা চেরা-চেরা। কিন্তু সে-সব তার খেয়ালও নেই, গ্রাহ্যও করে না। সব কিছুতে একটা বিশেষ শক্তিতে সে নিজেকে ঢেলে দিতে পারে, ওই সঞ্চিত জলরাশির নিম্নগতিবেগের মতো, প্রতিটি জলবিন্দুর শক্তি সংযোগের মতো ওর দেহমন দুয়েরই প্রতি অণু-পরমাণু যে-কর্ম সে করে তাতেই তন্ময় হয়ে যায়। থরথর-করে গলার স্বর কাঁপতে লাগল। বিদ্যুৎ-শক্তির মতো সকল শ্রোতার মনে সঞ্চারিত হল সে-আবেগ।

'আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর।'

কণ্ঠস্বর তার উচ্চ হতে লাগল। আবেগ যেন পুঞ্জীভূত মেঘের মতো আবর্তিত হয়ে চলল। আগাগোড়া মুখস্থ কবিতাটি আবৃত্তি করে শেষ স্তবকে এল।

'কী জানি কী হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে
চারিদিকে মোর
এ কি কারাগার ঘোর—
ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা আঘাতে আঘাত কর।'

বলেই সে লাফিয়ে ডায়াস থেকে নেমে এসে ক্লাসের বন্ধ দরজায় দুম-দুম শব্দে কিল-ঘুষি মারতে শুরু করে দিল। ছেলেরাও হাইবেঞ্চে চাপড় মারতে শুরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অধ্যাপক ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন, 'দ্যাটস নট দি ওয়ে, দ্যাটস নট দি ওয়ে, মাই ফ্রেণ্ডস। ঝরনার জলের কারাগার ভাঙার ধারা আর মানব-হৃদয়ের পক্ষে রুদ্ধ পথের বাধা ভাঙার ধারা এক নয়। কিন্তু তুমি তো আবৃত্তি ভালো কর কালাচাঁদ ?'

কালাচাঁদ আর একদফা খ্যাতি লাভ করলে।

সেবার ইণ্টার-কলেজিয়েট আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তাকে পাঠানোও হল। বাঙলা এবং সংস্কৃত প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি করলে। প্রাইজ পেলে না, কিন্তু

সংস্কৃত আবৃত্তিতে সে প্রশংসা অর্জন করলে। কণ্ঠস্বর তার সবচেয়ে বড় বাধা হয়েছিল, নইলে হয়তো পেত। উচ্চারণের জন্যও তার নম্বর কম হয়ে গেল।

খেলার মাঠ থেকে কলেজ পর্যন্ত, ওদিকে নামজাদা রেস্টুরেন্ট থেকে হোস্টেল পর্যন্ত কালাচাঁদের কণ্ঠস্বরে, গতিবেগে বায়ুস্তর চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল হল। ও বললে, অন্য কলেজে চলে যাবে। কলেজ টিমের ক্যাপ্টেন রেকটরকে বলে ওকে প্রমোশন দেওয়ালেন। রেকটর ডেকে বললেন, 'তোমাকে সাবধান হতে হবে কালাচাঁদ। তুমি তো 'ডাল' ছেলে নও। ইউ আর শার্প।'

সেদিন কালাচাঁদের মনে পড়েছিল তার বাবাকে এবং মাকে।

স্বল্পবাক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ তার বাবা। পূজা আর অর্চনা নিয়ে থাকেন। মুখে-চোখে, আচারে-আচরণে একটি কী যেন আছে। যাতে তাঁর কাছে গেলেই বিমর্ষ হয়ে যেতে হয়। বোধ হয় একটি প্রচ্ছন্ন লজ্জার অনুশোচনা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। মুখে কিছু বলেন না। শুধু গৃহদেবতার দোরে প্রণাম করার সময় আশে-পাশে কেউ না থাকলে বলেন। 'আমার অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা করো প্রভু! তোমার ভোগ কমাতে হয়েছে—এ দুঃখ আমি তোমাকে ছাড়া কাকে বলব?'

মা তার প্রসন্নময়ী। মা তার কল্পতরু। সে যখন যা চেয়েছে, তাই তিনি তাকে যুগিয়েছেন। যে যা চায়, সে তা পাবেই, সে-বিশ্বাস তার মা তাকে দিয়েছেন। অফুরন্ত দুধ ছিল তাঁর স্তনভাণ্ডে, অফুরন্ত স্নেহ ছিল তাঁর বুকে, আর ছিল মনে অফুরন্ত আশা। অবাধ এবং অগাধ ছিল তাঁর প্রশ্রয়।

তার মা তাকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন। তিনি নিজে সাঁতার জানতেন। যে-পুকুরে স্নান করতেন সে-পুকুরে পদ্ম ফুটত। সে রোজ আবদার ধরত ফুলের জন্য। মা তুলে এনে দিতেন। কিছুদিন পর বলেছিলেন, 'তুই সাঁতার শেখ, শিখে তুলে আন, আমি পারব না।' সাঁতার শেখার আতঙ্কে কয়েকদিন সে আর পদ্মের কথা তোলে নি। দিন কয়েক পর মা নিজেই একদিন গাছ-কোমর বেঁধে ঘড়াটা ভাসিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'আয়, পদ্ম তুলবি।'

সে গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। আসবার সময় বারকয়েক ঘড়াটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা ধর।'

তারপর সে-ই তাঁকে নিত্য দিত পদ্মফুল, গৃহদেবতার পূজার জন্য।

মা তার কাছে শুয়ে গল্প করতেন ভবিষ্যতের। 'মস্ত বড় ডাক্তার হবি। বিলেত যাবি, জার্মান যাবি। মস্ত বাড়ি করবি, গাড়ি কিনবি! দাসদাসী।

ঐশ্বর্যের গল্প করে যেতেন। অত্যন্ত সহজ মানুষ ছিলেন। দান-ধ্যান-দয়া-স্বার্থত্যাগ এসব ছিল তাঁর কাছে নিজের ভোগের পরে। নিজে রোজগার করে আগে নিজে খাব, তারপর অন্যের কথা।

সে বলত, 'বিলেত গেলে জাত যাবে না?'

'আজকাল আর সেদিন নেই। তবে যায় যাবে। জাত নিয়ে কি তোর বাবার মতো ধুয়ে ধুয়ে খাবি?'

'বাবা মত দেবে না।'

'তুই চলে যাবি। আমরা না হয় আলাদাই থাকব। বৃন্দাবন-টন চলে যাব। তুই তো বড় হবি!'

ফেল হয়ে তবে সেদিন তাঁদের কথা মনে পড়েছিল।

এবং সে মনে পড়াটা ভোলে নি সে। অন্তত আই. এস-সি পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত ভোলে নি সে। ফার্স্ট ডিভিশনে আই এস-সি পাশ করেছিল সে।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল।

এখানে সে কালাচাঁদ গুপ্ত নয়, কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত। আই এস-সি পরীক্ষা দেবার আগেই কোর্টে এফিডেভিট করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করে নাম পালটে নিয়েছিল সে।

সেণ্টজেভিয়ার্সের ফাদার রেক্টর তার পড়াশোনায় উন্নতিতে তার উপর খুশীই ছিলেন। হেসে বলেছিলেন, 'হোয়াটস ইন এ নেম—কালাচাঁদ?'

কালাচাঁদ হেসে বলেছিল, 'কালাচাঁদ ইজ ব্ল্যাক মুন, অ্যাণ্ড কৃষ্ণেন্দু মীনস্ দি সেম—দি ব্ল্যাক মুন। আই হ্যাভ চেঞ্জড দি ওয়ার্ড অনলি, নট দি মিনিঙ। আই অ্যাম দি সেম ওল্ড ব্ল্যাক মুন, ফাদার।'

বাবাকে, মাকেও তাই লিখে উত্তর দিল। লিখলে—'কালাচাঁদ সোনার চাঁদের চেয়েও খারাপ। আমার লজ্জা করে।

বাবা উত্তর দেন নি, মা উত্তর দিয়েছিলেন 'বেশ করিয়াছ; তাহাতে আমরা মনে কিছু করি নাই।

কিন্তু কলেজে কলেজে তার কালাচাঁদ নাম তখন তার নিজের মতোই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাতে সে দমে নি। কেউ কালাচাঁদ বলে ডাকলেই বলত 'নট কালাচাঁদ—আই অ্যাম কৃষ্ণেন্দু, কল মী কৃষ্ণেন্দু প্লীজ।

এইখানেই রিনা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচয়। সেও ওই কালাচাঁদ নাম নিয়ে। রিনা ব্রাউন কলেজের নার্স মেট্রন পলি ব্রাউনের সৎ মেয়ে। পলির স্বামী জিমি ব্রাউনের প্রথম পক্ষের মেয়ে। কলেজের স্টাফ কোয়ার্টার্সের মধ্যে মিসেস ব্রাউনের বাসা। রিনার বয়স তখন পনেরো-ষোল। দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি তখনও

কিশোরী। কিন্তু তখন থেকেই অপরূপ মোহময়ী। গায়ের রঙ সাদা হলেও বাঙলাদেশের একটি শ্যামলিমার আভাস তাতে স্পষ্ট। সবচেয়ে মোহকর মেয়েটার চুল। ছোটো কপাল ঢেকে এমন অপর্যাপ্ত পুরু ঘন কালো চুল দেখা যায় না। তৈলহীন রুক্ষতার মধ্যেও তার কালো-শোভা ক্ষুণ্ণ হত না, ধূসরতার আভাস ফুটত না। কপালের উপর ঘন কালো চুলের সম্ভারের সঙ্গে এখানকার লালপ্রান্তরের প্রান্তে ঘন শালবনের শোভার যেন মিল আছে। কৃষ্ণকুন্তলার চেয়ে অরণ্য কুন্তলার মতো বললেই যেন ওর উপমা শোভনতর করে বলা হয়। তেমনি দুটি মোটা কালো ভুরু—কপালের মধ্যস্থল থেকে যেন আকর্ণবিস্তৃত। কাঁচা বাঁশের মোটা ধনুকের মতো। অপরূপ সুন্দর আয়ত দুটি চোখ—তাকে সুন্দরতর করেছে তার চোখের পাতার দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ পক্ষরাজি। ফুলের কেশরের মতো দীর্ঘ। মনে হয় জন্ম থেকেই চোখের পাতার কাজল-রেখা আর স্বপ্নালুতা মেখে নিয়ে মেয়েটি জন্মেছে। রিনাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওদের ফ্ল্যাটের বারান্দায় দেখা যেত। সে সময়টাতে তখনকার দিনের মিলিটারী মেডিক্যাল স্টুডেন্টদের সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসত, ঠিক তার কিছুক্ষণ পর, বোধ হয় দশ মিনিট পর মিলিটারী ছেলের দল প্রায় সব বেরিয়ে চলে যেত। থাকত শুধু ক্লেটন, মিলিটারী স্টুডেন্টদের সেণ্টার হাফ। মারপিটে সিদ্ধহস্ত জনি গুণ্ডা। রিনা এবং জনি—কথা বলত হাসত রঙীন হাসি। জানত সবাই।

জন ক্লেটন যুদ্ধবিভাগের নামকরা আই. এম. এস. অফিসারের ছেলে। চার্লস ক্লেটনের গল্প সর্বজনবিদিত অন্তত অফিসার মহলে। কৃষ্ণেন্দুও পরে এসব জেনেছিল ওদের কাছ থেকেই। দুঁদে অফিসার, দুর্দান্ত মাতাল, নামকরা শিকারী, ভালো নাচিয়ে, মারা-মারিতে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি ছিলেন চার্লস ক্লেটন। পলি ব্রাউন বলেছিল, যেখানে চার্লস ক্লেটন থাকত, সে-ক্যাণ্টনমেণ্টে অফিসারেরা সন্ত্রস্ত থাকত। ঝড়ের মতো পরের ঘরসংসার ভেঙে দিয়েই ছিল তার উল্লাস। তার এই দুর্দান্তপনা মেয়েদের পক্ষে ছিল একটা আকর্ষণ। এই আকর্ষণে একদা নাকি পলি ব্রাউনও—তখন মিস পলি মরিসন—পড়েছিল। কিন্তু ক্লেটন তখন বিবাহিত। স্ত্রী ছিল ইংলণ্ডে, জন তখন শিশু। কিছুদিন মাখামাখির পর পলি মরিসন ভগ্নহৃদয়ে মিলিটারী বিভাগের কাজ ছেড়ে এসে কাজ নিয়েছিল কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। ক্লেটন সাহেব দুর্দান্ত হলেও পাষণ্ড ছিল না। কলকাতায় কাজ পেতে সে তাকে সাহায্য করেছিল। কয়েকটা বড়ো হাসপাতাল, যেগুলি ইউরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলি ঘুরে সে মেডিক্যাল কলেজে এসে কাজ নিয়েছিল। তখন সে মিস পলি। এখানে থাকতেই সে

মিসেস ব্রাউন হয়েছে। জেমস ব্রাউনকে যখন সে বিয়ে করে রিনা তখন দশ বছরের মেয়ে। জেমস আর রিনাকে নিয়ে পলি ব্রাউন সংসারে ডুবে ক্লেটনকে একেবারেই প্রায় ভুলে গিয়েছিল।

কৃষ্ণেন্দু যে-বছর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল—তার আগের বছর জন ক্লেটন এসে ভর্তি হয়েছিল মেডিক্যাল কলেজে। মিসেস পলি ব্রাউনের কাছে এসে একখানা চিঠি দিয়ে বলেছিল, 'মেজর চার্লস ক্লেটন অব দি কিংস ওন রেজিমেন্ট, আপনার কি তাঁকে মনে আছে?'

'মেজর চার্লস ক্লেটন, ডিয়ার চার্লি?'

জন হেসে বলেছিল, 'আমি তাঁর ছেলে?'

'তুমি তার ছেলে?'

'হ্যাঁ, এখানে মেডিক্যাল কলেজে পড়ব বলে এসেছি।'

বিস্মিত হয়েছিল পলি ব্রাউন। মেজর চার্লস ক্লেটনের ছেলে হোমে না পড়ে এখানে পড়বে ডাক্তারি! আই. এম. ডি. হবে? চার বছরে চিকিৎসা-শাস্ত্র শেষ! নরুন চালিয়ে এদেশের হাতুড়েরা ফোড়া কাটে। ওরা ছুরি চালিয়ে তার চেয়ে ভালো কাটতে পারে না। আই. এম. ডি.-র ব্যবহারের জন্য ধারালো ছুরির বদলে ভোঁতা ছুরির ব্যবস্থা। কে জানে কখন ধারালো ছুরিতে বেশী কেটে ফেলে! ওদের ব্রিটিশ-আইরিশ রেজিমেন্টে চাকরি হবে না। কালা সিপাহী রেজিমেন্টের মেডিক্যাল অফিসার হবে।

বিস্ময়ের অবধি ছিল না পলি ব্রাউনের। কিন্তু চিঠিখানা পড়ে পলি ব্রাউন নিজেই বলেছিল, 'স্ট্রেঞ্জ! স্ট্রেঞ্জ লাক! কী বলব লাক ছাড়া?'

মেজর ক্লেটনের জীবনে বিপর্যয় ঘটে গেছে। বিচিত্র অদৃষ্ট বটে। পাঁচ বছর আগের কথা। ক্লেটন ছিল সি-পিতে একটা বড়ো ক্যান্টনমেন্টে। তখন তার স্ত্রী-পুত্র এখানে এসেছে। ক্লেটন ক্যাপ্টেন থেকে মেজর হয়েছে। স্ত্রী আসার জন্য অফিসারদের সমাজে ঘোরা ফেরায় পদক্ষেপ সংযত করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। ক্লেটনের স্ত্রী মার্গারেটও ছিল শক্ত মেয়ে। সাহসে দৈহিক শক্তিতে ডইয়েই ছিল ক্লেটনের উপযুক্ত স্ত্রী। ক্লেটন সমাজ ছেড়ে মধ্যভারতের জঙ্গলে ঘুরতে শুরু করেছিল শিকারের সন্ধানে। শিকারের সন্ধানে বনে ঘুরবার সময় আরণ্য জাতির নারীদের উপভোগের পথটা বেছে নিয়েছিল সে। কিছুদিনের মধ্যে মার্গারেট তার আভাস পেল। সেও একটা রাইফেল নিয়ে শিকারে তার সঙ্গিনী হল। শেষবার ঘটল বিচিত্র ঘটনা।

ক্লেটন সেই ধরনের লোক, যারা কোনো কথা রেখে ঢেকে বলে না। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে নয়, জীবনের কোনো ঘটনাই তার কাছে

লজ্জার হেতু নয়। পলি ব্রাউনকে লিখেছে, 'পলি, ঘটনাটা আশ্চর্য। আমার মন আমাকে ঠকালে, না এটা নিয়তির খেলা, কি আমার কর্মফলের পরিণতি, আজও ভেবে পাই না। সে এক গভীর বনে একটা গ্রাম। মার্গো সঙ্গে। সেখানে এক বিচিত্র বাঘিনীর আড্ডা। সে মারত কেবল মেয়েদের। লোকে বলত প্রেতিনী বাঘিনী। তাকে মারতে গ্রামে এসে একটি আশ্চর্য বুনো যুবতীকে দেখলাম। মন আমার বাঘিনীর চেয়ে ওর দিকেই বেশি ঝুঁকল। কিন্তু মার্গারেট সঙ্গে। যাই হোক, মাচা বেঁধে দ্বিতীয় দিন রাত্রে বাঘ মারলাম। কিন্তু বাঘিনীটা নয়। মরল যেটা সেটা বাঘ। কোথায় বাঘিনীটা! তিন দিন আর পেলাম না তাকে। কিন্তু তার পায়ের ছাপ আশ্চর্যভাবে চারিদিকে দেখলাম। যেন সামনেব দিকে না এসে পিছনের দিকে সে ঘুরেছে ফিরেছে। গ্রামের সর্দার বললে, 'ফিরে যাও সাহেব, এ বাঘিনী ভয়ঙ্কর। এ তোমার পিছু নিয়েছে।' দিনেব বেলা কথা হচ্ছিল। গ্রামেব লোকেরা জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে কিন্তু সেই বুনো আশ্চর্য মাদকতাময়ী মেয়েটি। সকলকে লুকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। তুমি সে-কালের চার্লিকে ভোলনি। এ-বিষয়ে সে ছিল নিপুণ শিল্পী। চার্লস ক্লেটন কি বাঘিনী পিছু নিয়েছে বলে ওই বুনো মদিরা পান না করে আসতে পারে? মার্গারেট ঠিক বোঝে নি, কিন্তু তবু সে বলেছিল, 'ফিরে চলো।' আমি বলেছিলাম, 'আজকের দিনটা দেখে যাব।' ঠিক এই সময়টিতেই বাঘিনী ঠিক গ্রাম-প্রান্তে দেখা দিয়ে একটা গর্জনে আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম ছুটে। কিন্তু কোথায়? না-পেয়ে ফিরে আসছি হঠাৎ দেখা মেয়েটার সঙ্গে। ইশারায় নিমন্ত্রণ জানালে হেসে। আমি তাকে বললাম, 'রাত্রে আজ শিকারে যাব না, গভীর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে তার ইশারা পেলে আসব।' মার্গারেটকে বললাম, 'শরীর খারাপ, মাচায় যাওয়া আজ ঠিক হবে না।' থাকলাম আড্ডায়। আড্ডা বুনোদেরই প্রধানের একখানা ঘর। মদ খেয়েছিলাম। মার্গারেটকেও খাইয়েছিলাম। তাকে ঘুম পাড়াতে হবে। সে ঘুমিয়েও ছিল। হঠাৎ খুটখুট শব্দ শুনলাম। কান পেতে শুনলাম। আমি শিকারী। আমি জানোয়ারদের পায়ের শব্দ চিনি। আমি চার্লি ক্লেটন, আমি অভিসারিকার পায়ের শব্দও জানি। এ পায়ের শব্দ সেই বুনো মেয়ের। দরজা খুললাম সন্তর্পণে। ফাঁক করে দেখলাম। চাঁদ ছিল আকাশে। বনের মধ্যে জ্যোৎস্না। আশ্চর্য তার রূপ। ঘন সবুজের ঘেরের মধ্যে সে-শুভ্রতার তুলনা খুঁজে পায় না। তার মধ্যে দেখলাম সে মেয়েকে। ভুল আমি দেখিনি। বুকের ভিতর রক্ত ছলাত করে উঠল। আমি বেরিয়ে

গেলাম। শিস দিলাম। সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোথায় সে? ঠিক এই মুহূর্তে বাঘের গর্জনে কেঁপে উঠল বনভূমি। পিছন থেকে বাঘিনী লাফ দিয়ে পড়ল আমার উপর। একটু সরতে পেরেছিলাম, তবু সে আমার ডান কাঁধের উপর পড়ল। সেই মুহূর্তে শুনলাম মার্গারেটের চিৎকার। তার পর-মুহূর্তে শুনলাম বন্দুকের শব্দ। পর পর দুটো শব্দ। আবার বাঘের গর্জন। তারপর মনে নেই, জ্ঞান হল হাসপাতালে দীর্ঘদিন পর। ডান হাত-খানা কেটে ফেলতে হয়েছে। ডান কানটা নেই। ডান পায়ে ফ্রাকচার হয়েছিল। তাতেও জোর নেই। বাঘিনী মার্গারেটকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে মরেছিল। দুটো গুলিই লেগেছিল তার বুকে পেটে। মরবার সময় গড়াগড়ি খেয়ে এসে পড়েছিল আমার উপরেই। আলিঙ্গন করেছিল। আরও মজার কথা কী জান? সেই বুনো গ্রামে ওই মেয়েটার সন্ধান কেউ আমাকে দিতে পারে নি। আমি খোঁজ করেছিলাম। তারা বলে, 'কই' এমন মেয়ে তো গাঁয়ে নেই!' আজও আমি ভাবি কি জান? ওই মেয়েটা কি প্রথম থেকেই আমার মত্তবিহ্বল মস্তিষ্ক এবং আমার নারীলোলুপ চিত্তের ভ্রান্তি? অলীক কল্পনা? যাই হোক, আজ আমি বিকলাঙ্গ অসহায়, সামান্য পেনসনের উপর নির্ভরশীল সামান্য শক্তি। জনিকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে পড়াবার সামর্থ্য নেই। ও কলকাতায় পড়তে যাচ্ছে। আমি জানি তুমি ওখানকার মেট্রন। জনিকে একটু দেখো।'

ভগবানের নাম উচ্চারণ করে পলি ব্রাউন গায়ে ক্রশচিহ্ন এঁকেছিল। 'হে ভগবান! পুয়োর চার্লি শয়তানের হাতে পড়েছিল। কিন্তু তুমি বসো জন। তুমি মেজর চার্লস ক্লেটনের ছেলে। মেজর ক্লেটন এক সময়ে আমার বস ছিলেন, বন্ধু ছিলেন! আমার বাড়ির দরজা তোমার কাছে অবারিত রইল। যখন খুশি আসবে।'

আলাপ করিয়ে দিয়েছিল স্বামী জেমস ব্রাউনের সঙ্গে। জেমস ব্রাউন এক সময় মেদিনীপুর অঞ্চলে থাকত। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ জমিদারি কোম্পানিতে কাজ করতেন জেমসের বাবা। সেখানে পাহাড় জঙ্গল কিনে ব্যবসা করতেন। জেমস ব্রাউনও সেই ব্যবসা করত। ব্যবসা ফেল পড়ার পর ইনসলভেন্সি নিয়ে কলকাতায় এসেছে মেয়ে রিনাকে নিয়ে। তারপর দেখা হল পলি মরিসনের সঙ্গে। সে আজ চার বছরের কথা।

'রিনা বড়ো ভালো মেয়ে।'

ডবল বেণী ঝুলিয়ে রিনা বসে মিষ্টি হাসি হেসেছিল।

'ওর বাবা ঠিক করেছিল, ওকে কনভেন্টে রেখে শেষ পর্যন্ত 'নান' করে

তুলবে। জিমির ধর্মকর্ম বাতিল। কনভেণ্টে রেখেও ছিল। আমি নিয়ে এসেছি জোর করে। দেখ তো কী মিষ্টি স্বভাব মিষ্টি চেহারা।'

জন ক্লেটনের সঙ্গে রিনার প্রেমের কথা কলেজে কিছু দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। জন ক্লেটনের সঙ্গে ফুটবলের মাঠে কৃষ্ণেন্দুর হল একদিন মারপিট। সেই সূত্র ধরে নয়—সেই সূত্রের টানেই যেন রিনা এসে দাঁড়াল কৃষ্ণেন্দুর সামনে।

মিষ্টি স্বভাবের রিনা ব্রাউন ক্ষিপ্ত হয়ে সেদিন কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল, 'ইউ ব্লাকি কালাচাণ্ড! ইউ হিদেন!'

কৃষ্ণেন্দু কলেজের ভিতর খেলার মাঠে মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে বিজয়ী বীরের মতো এসে সবে নেমেছে, ছেলেরা তাকে উল্লাস-কলরবে অভিনন্দন জানাচ্ছে। রিনা ব্রাউন ওদের ফ্ল্যাট থেকে রাগে ফুলতে ফুলতে নেমে এসে গ্রাউণ্ডের ভিতরেও খানিকটা ঢুকে চিৎকার করে ডেকেছিল, 'ইউ ব্ল্যাকি কালাচাণ্ড! ইউ হিদেন!'

ওর পিছনে পিছনে এসেছিল ওর আয়া। একটা এদেশী মেয়ে। মাথার চুলগুলি পেকে গিয়েছে। মোটা ভুরু! অদ্ভুত লাগত তাকে দেখে। তার অদ্ভুত ছিল চোখের দৃষ্টি। সর্বদাই যেন আতঙ্কে বিস্ফারিত এবং পলক পড়ত না! সে পিছন থেকে চিৎকার করছিল—'রিনা, রিনা, রিনা, রিনা! নহি। নহি!'

রিনা থামে নি। সে পা ঠুকে বলেছিল, 'ইউ, শুনতে পাও না তুমি?'

কালাচাঁদ তার কাছ এসে বলেছিল, 'বর্ষায় ভিজে কাদার উপর এমন করে পা ঠুকো না। তোমার এমন স্কার্টটা কাদার ছিটেতে ভরে গেল।

সত্যিই তাই গিয়েছিল। ছেলেরা হেসে উঠেছিল। রিনার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল সে-হাসির প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে। কথার উত্তর খুঁজেও পায় নি, সরাসরি সে অভিযোগ করে বলেছিল, 'কেন তুমি জনিকে এমন করে মেরেছ? হোয়াই? ইউ ব্রুট!'

সে উত্তর দেবার আগেই কলেজ টীমের ফুলব্যাক বসন্ত বলেছিল, 'ওর মাথার ব্যাণ্ডেজটা দেখছ না? জনিই মেরেছিল ওকে আগে।'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমার বাগদত্তা নেই মিস ব্রাউন, থাকলেও সে এসে জনিকে এ-প্রশ্ন করত না। সে জানে লড়াই আরম্ভ হলে যার জোর বেশী, তার আঘাতটা জোরালো হবেই। কীচকেরা চিরকাল ভীমের হাতে মরে।' ছেলেরা হো-হো করে হেসে উঠেছিল।

ওই আয়া মেয়েটি হঠাৎ হাত জোড় করে কৃষ্ণেন্দুকে পরিষ্কার বাংলায় বলেছিল, 'হে বাবা। দয়-(দোহাই) তুমার পিতিপুরুষের, হেই ভালোমানুষের

ছেল্যা, আমি হাত জোড় করছি। ঘাট মানছি। উকে কিছু বল নাই। হেই বাবা!'

মেয়েটা বাঙালী! সেই বিস্ময়েই সকল ছেলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিনা এই অবসরে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। চিৎকার করে বলেছিল, 'ইউ উইল বি পানিশ্‌ড, গড উইল পানিশ্‌ড ইউ।'

* * *

ঘটনাটা সব মনে পড়ছে। সে খেলা ঐতিহাসিক খেলা। খেলা নয় যুদ্ধ।

কলেজের ভিতরের খেলার মাঠে খেলার অধিকার নিয়ে সাধারণ ছাত্র আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মিলিটারী ছাত্রদের ঝগড়া, মারপিট-ভরা সে-যুদ্ধের কথা কলেজের ইতিহাসে লেখা আছে। সেই যুদ্ধ চলেছে তখনও। যুদ্ধের সেই খেলা সেদিন চলেছিল খেলার মাঠে। তার আগের দিন দুই দলের ম্যাচে জনিই একা করেছিল মাপরিট। সেদিন শোধ নেবার জন্যে শপথ নিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। জনিকে সে মারবে। বুটের সুযোগ তো ওদের চিরদিনের, তার উপরে জনি মারপিটে সিদ্ধহস্ত। জনি শুনে হেসেছিল। বেচারা জনি, কৃষ্ণেন্দুকে ঠিক জানত না! কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর ছ-ফুট-লম্বা চেহারাখানা দেখে একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া গত দু-বছরে কালাচাঁদের খেলার খ্যাতির উপরেও শ্রদ্ধা করে মারবার আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল। প্রথমেই সেণ্টার হাফ জনি বুটের লাথি মেরে জখম করছিল এদের সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে। বেচারা ডান হাঁটুর নীচে কাপ জখম হয়। উঠল বটে, কিন্তু ছুটবার ক্ষমতা গিয়েছে। তার পরই এদের সেণ্টার হাফের পায়ের বুড়ো আঙুল ফাটিয়ে দিলে। রেফারি তাকে সাবধান করে দিলেন। জনি সবে এসে রেফারিকে গাল দিলে 'সন অফ এ বিচ' বলে। কথাটা কানে গেল কৃষ্ণেন্দুর। সেণ্টার ফ যার্ডকে নিজের জায়গায় দিয়ে সে এল সেণ্টার ফরওয়ার্ডে, দাঁড়াল জনির মুখোমুখি।

জনি হেসে বলল, 'You are কালাচাণ্ড? ছাটস্ অলরাইট। বহুট আচ্ছা ব্ল্যাকি। কাম অন।'

কথাটা শেষ হতে না হতে বল এসে পড়ল দুজনের মধ্যে। জনি বুট ঝাড়লে ওর হাঁটু লক্ষ্য করে। কালাচাঁদ সুকৌশলে হাঁটু বাঁচিয়ে জনির উৎক্ষিপ্ত পাখনার তলার দিকে ঝাড়লে একখানি কিক। ছ-ফুট-লম্বা মানুষের শক্ত বাঁশের মতো পায়ের সে কিকে চিত হয়ে পড়ে গেল জনি। এবং হাঁটু বিনা রক্তপাতে জখম হল। ক্রুদ্ধতর হয়ে উঠল জনি। এবং কিছুক্ষণ পরই জনি মারলে ওর মাথায়। কৃষ্ণেন্দুর মাথাটা ফেটে গেল। রক্তমাখা বড়ো চুলগুলো পিছনের দিকে ঠেলে

দিয়ে কৃষ্ণেন্দু মিনিট দুয়েক পরেই ছুটল বল ধরতে। জনি প্রাণপণে ছুটে এসে রুখলে। বল তখন কৃষ্ণেন্দু ইন্সম্যানকে দিয়ে সামনে ছুটেছে। উঁচু বল এসে পড়েছে। জনি কৃষ্ণেন্দু সামনাসামনি, দুজনেই হেড দিতে লাফাল। কৃষ্ণেন্দু হেড দিলে মর্মান্তিক আর্তনাদ করে জনি পড়ল মাটির উপর কাত হয়ে পেট চেপে ধরে, অজ্ঞান হয়ে গেল। ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যেতে হল তাকে। পেটের অন্ত্রে আঘাত লেগেছে। এর পর কৃষ্ণেন্দু করলে হ্যাটট্রিক।

দেশী ছেলেদের কাঁধে চড়ে কৃষ্ণেন্দু চিৎকার করে গান ধরেছে—

দিন আগত ঐ—ভারত তবু কই—

সে কি রহিবে লুপ্ত আজি সবজন পশ্চাতে ?

প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে—জাগ্রত ভগবান হে।

জয় ভৈরব !

এই মুহূর্তেই রিনা ব্রাউন এল—ইউ ব্ল্যাকি কালাচাঁও। এবং শেষ পর্যন্ত বললে, 'গড উইল পানিশ ইউ।'

কৃষ্ণেন্দু তারও উত্তর দিয়েছিল, উত্তর দিতে একটু দেরি হয়েছিল ওই আয়াটির মুখের আকুতিভরা বাঙলা কথা শুনে। বিস্মিত হয়ে আধ মিনিট দেরি হয়েছিল, চিৎকার করেই সে বলেছিল, 'হ্যালো মিস্, হ্যালো। দেন আস্ক ইওর গড—তোমার ভগবানকে বলো—আমার সামনে আবির্ভূত হতে। কিংবা আমাকে তার সামনে হাজির করাতে। জান, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না। আমার একটা পরম লাভ হবে। আমি তাঁকে দেখতে পাব। তার জন্যে দরকার হয় তো বলো, তোমার জনিকে আবার গুঁতো মারব!'

*　　　　*　　　　*

রিনা ব্রাউন! আমার ব্যঙ্গ ব্যর্থ করে তোমার ঈশ্বর আমাকে ধন্য করেছেন। তোমার ঈশ্বরকে আমি দেখছি রিনা ব্রাউন! কিন্তু আশ্চর্য! ডাইনী অপরাধে অপরাধিনী আদিম আরণ্য নারী ওই ঝুমকির মধ্যে তাঁকে দেখেছি। সিন্ধু, লাল সিং, এদের মধ্যেও তাঁকে পেয়েছি। তোমার সঙ্গী ওই মরণ-ভয়-তাড়িত মদ্যপানবিভোর আমেরিকান অফিসারটির মধ্যে তাঁকে দেখলাম, তিনি রয়েছেন। যুদ্ধে যে প্রাণ নেবে তার মধ্যে নয়, যুদ্ধে যে প্রাণ দেবে বলে এতদূর এসেছে তার মধ্যে যে তাঁকে আমি দেখলাম। কিন্তু তোমার মধ্যে থেকে তিনি কোথা অন্তর্হিত হলেন, রিনা ব্রাউন! হে ঈশ্বর, সেই মেয়েটিকে তুমি কেন পরিত্যাগ করলে! এ রিনা ব্রাউন ঈশ্বর-পরিত্যক্ত রিনা ব্রাউন। কৃষ্ণস্বামী মনে মনেই কথা ক'টি বললেন।

'বাবাসাহেব!' সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল সিন্ধু।

'কে? সিন্ধু?'

'হাঁ বাবাসাহেব। চা দিয়ে গেল, খেলে নাই। রাত কত হইছেক—খিদ্যা কি তুমার লাগে না বাবাসাহেব?'

'আমার রুটি ঢাকা দিয়ে রেখ্যা দাও সিন্ধু। ইয়ার পর যখন হোক খাব।'

'উঁহু। আপনি খেয়ে নও—তবে আমি যাব।'

'না সিন্ধু। আজ আমাকে ছাড়ান দাও বেটি'

'শরীর কি ভালো নাই বাবা?'

'শরীর ভালো আছে বেটি। মন ভালো নাই।' বলেই উঠে পড়লেন কৃষ্ণস্বামী। ঘর থেকে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। বারান্দা থেকে নামলেন খোলা উঠানে।

চারপাশে বর্ষার ঘনশ্যাম শালবনে জ্যোৎস্নার আভা প্রতিফলিত হয়েছে। দূর দিগন্ত পর্যন্ত বনের মাথায় [illegible] গেছে। নিঃশব্দ নয় নিস্তব্ধও নয়। [illegible] থমথম করছে [illegible] গাছ কুঁড়ি [illegible] পরিপুষ্ট [illegible] সকালে [illegible] ফুটছে [illegible] গভীর অন্ধকারের [illegible] চলেছে [illegible]

[illegible]

অগ্রসর [illegible]

এগিয়ে চললেন [illegible] হয়ে বনের দিকে [illegible] বনের [illegible] ছে। [illegible] সাড় জেগেছে সুর জেগেছে। [illegible] খাদ্য অক্সিজেনের ভাগ নিয়েছে [illegible] অক্সিজেন দিচ্ছে। [illegible] তুমি নিশ-রাত্রিহ কার্বনডায়ক্সাইড [illegible] সারা দিন [illegible] কার্বনডায়ক্সাইড দিচ্ছ। [illegible] মধ্যেও বিচিত্র সূক্ষ্ম স্থিতি আছে। [illegible] মধ্যে শুধু ক্ষয় শুধু ক্ষয়, শুধু ক্ষয়।

বাবাসাহেব। ফাদার।'

বাঙলোর দিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। যোসেফ লাল সিং ডাকছে। তিনি বনের দিকে চলেছেন, তাই শঙ্কিত হয়েছে। বনে ভালুক আছে। বুনো শুয়োর আছে। মধ্যে মধ্যে চিতা আসে। সেই ভয়ে তাঁকে ফিরে আসতে বলছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'বেশী ভিতরে আমি যাব না যোসেফ!

'না, বাবাসাহেব, গাঁ থেকে লোক এসেছে।'

লোক! তা হলে কারও বাড়িতে অসুখ! বিপদ! ঈশ্বর কি রিনার কথা ভাবতে নিষেধ করেছেন? ফিরলেন কৃষ্ণস্বামী। বারান্দায় বসে আছে, একক্রোশ দূরের একখানি ছোটো গ্রাম থেকে কৃষ্ণস্বামীর চেনা সবাই এ যে বুড়ো শরণ লায়েক।

'কী হল লায়েক মশায়? এত রাতে?'

'কী হবেক? বিপদ! তা নইলে তুমার কাছে আসব ক্যানে এত রেতে!'

'কার অসুখ? কই জানি না তো কিছু?'

'জানবা কী? এই আমার ছেল্যাটার বড়ো বিটিটো। পেথম পোয়াতি বটেক। সেই দুপুর থেকে বেথা উঠেছে। দাইটো এই রেতে বলে, 'আমি খালাস করতে লাবব লায়েক; গতিক মন্দ বটেক লাগছে তুমি বাবা-সাহেবকে খবর দাও।' মেয়্যাটা গোঙাইছে বাবা। শুনতে পাবা যেছে না। যেতে একবার হবেক বাবা'

'নিশ্চয়! হবেক বই কি।' কৃষ্ণস্বামী দ্রুতপদে উঠে গেলেন ঘরের ভেতরে। ডাকলেন, 'যোসেফ! তুমি চালো। যন্ত্রপাতি নিয়ে বাগটা গুছায়ে লাও হে। তোমরা আলো আন নাই লায়েক?'

'না গো বাবা, ত্যাল কুথাকে পাব গো। একটো কানাকুঁজো হারিকল আছে—তা সিটা দিলাম ঘরে। তা আকাশে জোস্তা রইছে—ঠিক চলে যাব।'

'আমাদের একটা হ্যারিকেন নাও লাল সিং। ব্লেসেড ইজ হি হ্যাট কামেথ ইন দি নেম অফ দি লর্ড। চলো লায়েক।' থাক রিনার কথা। রিনা মৃত। ঈশ্বর তার কথা মনে করতে নিষেধ করেছেন।

॥ চার ॥

অথচ রিনা তাঁকে লিখেছিল একদিন 'উঅ আনটু ইউ।' শেষ চিঠি তার। 'কৃষ্ণেন্দু, তুমি আমার কাছে মৃত। ডেড টু মী।'

পরদিন সকালে শরণ লায়েকের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন কৃষ্ণস্বামী। প্রায়

সারা রাত্রি পরিশ্রম করে শরণের নাতনীকে প্রসব করিয়ে বাড়ি ফিরছেন। ভোরের শালবনে এখনও রাত্রিচরদের আনাগোনা স্তব্ধ হয় নি। পাখিরাও বাসা ছাড়ে নি, কলরব শুরু করেছে শুধু। ফুলেরাও সবে ফুটছে। মাথার উপরে আকাশে বকের ঝাঁক উড়ে উড়ে চলেছে, বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলেতে চলেছে, আর পাক খাচ্ছে একসঙ্গে সরালি হাঁস। ভোরের বাতাস ক্লান্ত শরীরে বড়ো ভালো লাগছে। সাইকেলটা থাকলে বড়ো ভালো হত। ফিরতে ফিরতে ওই কথাটা মনে পড়ল। মনে পড়েছে কাল রাত্রেই। কিন্তু এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিল। অন্য কোনো চিন্তার অবকাশ ছিল না। আবার অতীত কথা, রিনার কথা মনে পড়েছে। হে ঈশ্বর? মার্জনা করো তুমি। যাকে ভালোবাসে মানুষ—তাকে ভুলতে পারে না। পারে না। পারে না।

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণেন্দু রিনাকে ভালোবেসেছিল। রিনাও ভালোবেসেছিল। দুজনের বিরোধের মধ্যে আশ্চর্যভাবে সেতু গড়ে উঠেছিল। ভাবলে আজও মনে হয় পরমাশ্চর্য! রিনা ওকে দেখলেই বারান্দা থেকে চিৎকার করে বলত, 'ইউ হিদেন।'

কৃষ্ণেন্দু তখন ধর্ম ঈশ্বর কিছুই মানে না, তা হিদেন ইজম্। ম্যাটার আর মাইণ্ডের সংজ্ঞাকে মেনে সে নূতন যাত্রা শুরু করেছে। তবু তাকে হিদেন বললে, তার গায়ে লাগত। কিন্তু সে সত্য অর্থে নয়-বলে নয়, গায়ে লাগত এদেশের মানুষ ব'লে। মেয়েটার উপর একটা শোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা তার মনের মধ্যে বিক্ষুব্ধ আবেগে ঘুরে বেড়াতে। সামান্য সুযোগে বিচিত্র রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসত এমনি একটা ঘটনা মনে পড়েছে।

এই ঘটনার মাসখানের পরে। সেপ্টেম্বরের শেষ, মেডিক্যাল কলেজের ওদের টীম জিতে নিয়ে এল কলেজ কম্পিটিশনের সবথেকে বড়ো শীল্ডটা সেবারকার খেলায় কৃষ্ণেন্দুই ছিল সবচেয়ে ভালো প্লেয়ার। মেট্রন পলি ব্রাউনের ভারি শখ ছিল খেলা দেখার। কলেজের টিমের খেলা থাকলে সেই অজুহাত নিয়ে সে ঠিক গিয়ে তার শখের হাতপাখা নিয়ে সামনেই চেয়ারে বসত। পাশে থাকত রিনা। কৃষ্ণেন্দু যেন রিনার উপরে শোধ তুলবার জন্যই এমন উন্মাদের মতো দুর্দান্ত বিক্রমে খেলত। রিনা সত্যসত্যই রাগত। কৃষ্ণেন্দুকে হিদেন বলার ঝোঁক তার বাড়তে লাগল। শীল্ড জিতে কলেজে এসে সেদিন ছেলেরা কৃষ্ণেন্দুকে কাঁধে নিয়ে নাচছিল। রিনা বেরিয়ে এল বারান্দায়। হঠাৎ কৃষ্ণেন্দুর কী মনে হল, রিনা হিদেন বলে সম্বোধন করবার আগেই সে চিৎকার করে উঠল, 'জয় কালী!' বলেই জিভ কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। রিনা ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকল। ছেলেদের দল হো-হো করে হেসে উঠল।

এরপর, রিনাকে দেখলেই কৃষ্ণেন্দু চিৎকার করে উঠত, ‘জয় কালী!’

রিনাও বলত, ‘হিদেন!’ প্রথম দিন হতভম্ব হয়ে ঘরে ঢুকলেও পরে আর হতভম্ব হত না রিনা।

আবার ঘটল আর একটি ঘটনা।

মাস কয়েক পর বড় দিনের সময় মিলিটারী স্টুডেন্টদের সোশ্যাল ফাংশন হল। তার মধ্যে ছিল কয়েকটা সিলেক্টেড সীন। একটি সীন ছিল ‘ওথেলো’ থেকে। ওথেলো আর ডেসডিমোনা। ‘ইট ইজ দি কজ, ইট ইজ দি কজ মাই সোল’ দিয়ে আরম্ভ ডেসডিমোনাকে হত্যার দৃশ্য। জন ক্লেটন করেছিল ওথেলো, এবং কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে ডেসডিমোনার অংশে অভিনয় করেছিল রিনা। ক্লেটনের ওথেলো ভালো হয় নি, কিন্তু চেহারা ও মিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্য এবং বিশেষ করে সহজ অভিনয়ের জন্য রিনার অভিনয়ের প্রশংসা হয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু দেখেছিল এই অভিনয়। এর পর কী তার খেয়াল হল, সে ওথেলো নাটকের ওই দৃশ্যটা মুখস্থ করে ফেলল এবং যখন-তখন ‘ইট ইজ দি কজ, ইট দি কজ’ বলে লাইনকিটুকু আবৃত্তি শুরু করে দিত। রিনা তিক্ত হয়ে এরপর কৃষ্ণেন্দুর সামনে বের হওয়া ছেড়ে দিলে। তবুও কৃষ্ণেন্দু শূন্য বারান্দার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করত, ‘ইট ইজ দি কজ।’

এর পর হঠাৎ একটি ঘটনায় সব কিছু উল্টে গেল। নাটকীয় ভাবে নয়—অত্যন্ত সাধারণ ভাবে—স্বচ্ছন্দ গতিতে। আগে সেই পরিবর্তনের সময় কৃষ্ণেন্দুর কাছে বিস্ময়কর বলে অবশ্যই মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ—?

বনপথে চলতে চলতে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল কৃষ্ণস্বামীর মুখে। কিসের বিস্ময়, কোথায় বিস্ময়ের কারণ? মানুষের মন প্রাণ-রসের এই স্বভাব। এই তো ঈশ্বরের তপস্যা মানুষের দেহের বেদীতে। গুণের আদর্শে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা যেমন তার স্বভাব, প্রতিযোগিতার পর গুণগ্রাহিতাও তার তেমনি প্রকৃতি-ধর্ম।

মাস আষ্টেক পর পরের বছর ফুটবলের সময়। ইন্টারভার্সিটি শীল্ড কম্পিটিশনে মেডিক্যাল কলেজের টিম যাবার কথা ঠিক হল। আই. এম. ডি. এবং এম. বি. কোর্সের ছেলেদের মিলিত টিম। ক্লেটন এবং কৃষ্ণেন্দু দুজনেই নির্বাচিত হল। সিলেকশন হওয়ার পরই দুজনের দেখা হল সিঁড়িতে। দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, ‘হ্যালো!’ দুজনেই একসঙ্গে হাত বাড়ালে, পরস্পরের হাত চেপে ধরলে। দুজনেই বললে, তুমি থাকলে আমি ভাবি না।

টুর্নামেন্টে ওরা ফাইনাল পর্যন্ত গিয়েছিল, ফাইনালে হারল। খেলাটা

হয়েছিল বম্বেতে। ফিরে যখন এল, তখন ওরা দুজনে দুজনের অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

ফিরে এসে ক্লেটনই ওকে নিয়ে গেল পলি ব্রাউনের বাড়ি। চল এবার রিনার সঙ্গে মিটমাট কর। সে বেচারার অত্যন্ত দুঃখ সে তোমার কাছে হেরেছে। পলি ব্রাউন ভারি খুশী হয়েছিল। এই দুর্দান্ত ছেলেটি কলেজে সর্বজনপ্রিয়তা দেখে আশ্চর্য হত। এবং কলেজের সর্বজন থেকে সেও আলাদা নয়। সে তাকে সংবর্ধনা করে বলেছিল, 'ওথেলো, দি টারবুলেন্ট মুর। তারপরেই হেসে বলেছিল, 'ইট ইজ দি কন্ধ, ইজ দি কজ। তুমি ওটা বেশ বল। আমার ভালো লাগে। কিন্তু রিনাকে চটাবার জন্য কেন বল? ইউ নটি বয়?

রিনা তখন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। ক্লেটন বলেছিল, 'লেট বাইগন্স বি বাইগন্স। শেক হ্যাণ্ডস ইউ টু, অ্যাণ্ড বি ফ্রেণ্ডস।'
কৃষ্ণেন্দু এগিয়ে গিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'আমি ক্ষমা চাইছি।'

রিনা হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণেন্দুর হাত চেপে বলেছিল, 'উই আর ফ্রেণ্ডস।'

আলাপের মধ্যে হঠাৎ পলি ব্রাউন এসে বলেছি, 'ওটা তুমি একবার আবৃত্তি করো: 'ইট ইজ দি কজ, ইট ইজ দি কজ।' ওইটে। সত্যিই ওটা ভালো কর। তোমার পার্সি ভয়েস আণ্ড—অ্যাণ্ড—ইউ ক্যান পুট লাইভলি ইমোশন ইন ইট ইট।

রিনা বলেছিল, 'আণ্ড—'বলেই চুপ করেছিল।

ক্লেটন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী?'

রিনা হেসে বলেছিল, 'তোমার থেকে অনেকটা বেশী ওথেলোর মতো। টল, মোর মুর্‌লাইক, ইজ' নট ইট?'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'কিন্তু তোমার চেয়ে ভালো ডেসডিমোনা আমি কল্পনা করতে পারি না। আমার মনে হয় পারবে কি।'

ক্লেটন বলেছিল, 'তা হলে তোমরা দুজনে গোটা গানটা করো। লেট আস এনজয় আণ্ড মেক দি মেমরি অব দি ফার্স্ট মীটীং আনফরগেটেব্‌ল। থাক চিরস্মরণীয় হয়ে আজকের এই পরিচয়ের স্মৃতি।

জেমস ব্রাউন একবার এসেই চলে গিয়েছিল। লোকটা অদ্ভুত। অদ্ভুত ঠিক নয়, ও সেই সব ইংরেজের একজন, যারা এদেশের এক-একজন ছোটখাট লাট-সাহেব। কালা মানুষদের সঙ্গে কথা কইতেও ঘেন্না। এবং গোঁড়া ক্রিশ্চান হিসাবে হিদেনদের ছুঁলে হাত ধোয়। নিঃস্ব, তাই নিঃশব্দে থাকে।

রিনা ব্রাউন সাহেবের ঘরের দিকে তাকিয়েই আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু

ক্লেটন ব্রাউনের কাছে গিয়ে অনুমতি আদায় করে এনেছিল। ব্রাউন সাহেব প্রশ্ন করেছিল, 'শুধু ভালো ছেলে, কলেজে পড়ে না ভালো ঘরের ছেলে।'

ক্লেটন বলেছিল, 'বোথ।'

'তা হলে অবশ্য অনুমতি দিতে পারি। উঁচু জাত? ওদের মধ্যে?'

'হ্যাঁ। হি ইজ এ গুপ্টা। উই হ্যাভ সো মেনি গুপ্টাজ অ্যামঙ্গস্ট আওয়ার প্রফেসরস।'

'ইয়েস, ইয়েস, আই নো। গুপ্টাজ আই নো। ইয়েস।'

অনুমতি দিয়েছিল ব্রাউন সাহেব।

ওরা গোটা সীনটাই আবৃত্তি করেছিল। একটা কাণ্ড ঘটেছিল শেষের দিকে। ডেসডিমোনাকে হত্যা করবার সময় সে যখন 'ইট ইজ টু লেট' বলে তার গলা টিপে ধরার অভিনয় করছে, রিনা যখন 'ওহ্‌ লর্ড লর্ড লর্ড' বলে কাতর চিৎকার করছে, তখন সেই মুহূর্তে সেই আয়াটি 'রিনা রিনা' বলে আর্তনাদ করে ঘরে এসে ঢুকে কৃষ্ণেন্দুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে ধরেছিল—ছেড়্যা দাও। ছেড়্যা দাও! ই—যেন একটা বিশ্বস্ত কুকুর হিংস্র হয়ে উঠেছে।

চমকে উঠে সরে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণেন্দু।

রিনা তাড়াতাড়ি উঠে বসে ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু, রিনা সান্ত্বনা দিয়েছিল পরিষ্কার মেদিনীপুর-মানভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলের খাস বাঙলা ভাষায়!

'মিছা-মিছা, ই সব মিছামিছি; ই সব থিয়েটারের বক্তৃতা!'

ও ঘর থেকে জেমস ব্রাউন এসে দাড়িয়েছিল দরজায়। ভয়ার্ত পশুর মতো স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে মেয়েটা স্তব্ধ মূক হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্ত মূক থেকে চিৎকার করে উঠেছিল—আমার—আমার—মেয়েটাকে—।

'নিকালো, ই ঘরসে নিকালো ইউ বিচ, গেট আউট!' ব্রাউন ফেটে পড়েছিল রাগে। কৃষ্ণেন্দু একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। মেয়েটির হাত ধরে রিনাই এ ঘর থেকে ওর ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। পলি ব্রাউন সামলেছিল জেমস ব্রাউনকে।

ক্লেটন হেসে বলেছিল কৃষ্ণেন্দুকে, 'দ্যাট নেটিভ ওম্যান রিনাকে এক মাস বয়স থেকে মানুষ করেছে। অত্যন্ত ভালোবাসে। রিনাকে অপছন্দ করে না। বাট, ইউ সি, হি ডাজ নট লাইক ইট। মিস্টার ব্রাউন অকৃতজ্ঞ নন, তিনি ওকে তাড়িয়ে দিতে চান না; দেনও নি; কিন্তু ওই যে মায়ের মতো ভালোবাসতে চায়, নিজের মেয়ের মতো দেখতে চায়, সে উনি বরদাস্ত করতে পারেন না। ইউ নো, মিস্টার ব্রাউন ইজ এ পাক্কা সাহিব। শুধু তাই নয়, ব্রাউন একজন গোঁড়া ক্রিশ্চানও বটে।' সেই মুহূর্তেই রিনা ফিরে এসেছিল।

রিনার সে-ছবি এখনও মনে আছে। একবার তাকাচ্ছিল, যে ঘরে ওই মমতায় আবদ্ধ, মূক পশুর মতো তার ওই ধাত্রী আছে সেই ঘরের দিকে, আবার তাকাচ্ছিল বাপের দিকে। হঠাৎ সে এক সময় ঘর থেকে বের হয়ে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরের দিকে।

পলি ব্রাউন ফিরে এসে কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত গুপ্টা। তুমি এটা মনে রোখো না। তুমি জান না। মেয়েটা বড়ো আনক্লীন ইন মাইণ্ড। এবং কিছুটা আউট অব মাইণ্ড। পাগল খানিকটা। রিনা ঘুমোয় আর ও তুক-তাক করে। একটু চুপ করে থেকে প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, 'খুব খুশী হয়েছি। আর কি সুন্দর আবৃত্তি করলে তুমি! আবার এসো। প্লীজ। প্লীজ, ডু কাম।'

*　　　　*　　　　*

ক্লেটনের সঙ্গে ওর প্রীতির সম্পর্কটাই ছিল গায়ের জোরের ব্যাপার নিয়ে। ওদের হোস্টেলে গিয়েই পাঞ্জা কষা থেকে শুরু হত। ঘরে ঢুকেই হাতখানা বাড়িয়ে বলত, 'কাম অন্।'

তারপর নানান রকমের প্রতিযোগিতা চলত। এবং যেটি বিস্ময়কর মনে হত ক্লেটনের কাছে, সেইটি সে পলি ব্রাউন বাড়িতে কৃষ্ণেন্দুকে টেনে নিয়ে গিয়ে করিয়ে তবে ছাড়ত।

শুকনো নারকেল শুধু হাতের জোরে ছাড়িয়ে মাথায় ঠুকে ভেঙে খাওয়া দেখে প্রশ্ন করেছিল, 'পাথর?'

'না। কাটলে রক্ত পড়ে।' হেসে বলেছিল কৃষ্ণেন্দু।

একদিন পঞ্চাশটা সিদ্ধ ডিম খাওয়ার পরিচয়ও দিয়ে আসতে হল ব্রাউনদের বাড়িতে।

এরই মধ্যেই কখন যে রিনা এবং সে, বান্ধবী এবং বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল, তার সঠিক দিনটি নির্ণয় করা কঠিন। তবে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল এই বন্ধুত্ব, হঠাৎ কোনো এক-দিনের আকস্মিক ঘটনার ফলে বা এক-দিনের আকস্মিক কোনো আবেগের উচ্ছ্বাসে নয়। অত্যন্ত সহজভাবে ও স্বচ্ছন্দ গতিতে। এই ফুল ফোটার মতো।

হ্যাঁ, ফুল ফোটার মতো। ফুল যেদিন ফোটে, সেদিন সূর্যোদয়ের আগেও তার বর্ণ-গন্ধের ঘোষণা কাউকে ডাক দেয় না। যখন ফোটে, তখন তার বর্ণশোভা গন্ধের নিমন্ত্রণ ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি করেই পরস্পরকে ওরা জানল একদিন।

ক্লেটন দু-বছর ফেল করে যখন পাশ করে বের হল, তখন কৃষ্ণেন্দুর সিক্সথ্ ইয়ার। কৃষ্ণেন্দু তখন শুধু খেলার আসরেই খ্যাতিমান নয়, শুধু দুর্দান্তপনাতেই

সর্বজনপরিচিত নয়, বিদ্যার ক্ষেত্রেও তার জীবন-দীপ্তি প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। চিকিৎসার কয়েকটা পদ্ধতিতে তখনই সে পাকা চিকিৎসকের মতো নিপুণ হয়েছে। কলেরায় স্যালাইন ইনজেকশন এবং ইনট্রাভেনাস ইনজেকশনে সে পটুত্ব অর্জন করেছে। সে-পটুত্ব এমন যে, কলেরা কেসের কলে নাম-করা ডাক্তারেরা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। ইনজেকশন সে-ই দেয়। ডাক্তার উপস্থিত থাকেন। তাতে তার উপার্জন হয়। সালভারসন ইনজেকশন দেবার জন্য তো তখন সে সদ্য পাশ-করা বন্ধু ডাক্তারের নামে একটি চেম্বার খুলেই বসেছে। এতে ক্লেটন তাকে সাহায্য করেছিল অনেক। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মহলে ওকে পরিচিত করে দিয়েছিল। ক্লেটন ওকে তখন স্যুট পরা ধরিয়েছে। ধুতি-কামিজ-পরা ডাক্তারের কাছে এরা আসতে চায় না। অর্থের অভাব হত না। নিজেই রোজগার করত।

ক্লেটন পাশ করল। ওদের পাশ করলেই চাকরি। নূতন চাকরি নিয়ে চলে যাবে। মিলিটারী স্টুডেন্টরা বিদায়ী দলকে অভিনন্দন জানালে। ক্লেটনের উদ্যোগেই ওথেলোর সেই দৃশ্যটি অভিনীত হল। তারই প্রস্তাবে কৃষ্ণেন্দু ওথেলো, ডেসডিমোনা রিনা।

ওই অভিনয়ের মধ্যেই কৃষ্ণেন্দু আবেগপ্রখর চাপা গলায় যখন ঘুমন্ত ডেসডিমোনার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আই উইল স্মেল দী অন দী ট্রী—' তখনই সে যেন আত্মহারা হয়ে গেল। সে হিন্দু, সে কালা আদমী, অভিনয়ে ক্লেটনের আগ্রহে ওথেলোর পার্ট পেয়ে থাকলেও ডেসডিমোনা রিনা ব্রাউনকে চুম্বনের অধিকার ওর ছিল না। আত্মহারা আবেগ সত্ত্বেও এখানটায় সংবরণ করলে নিজেকে, কিন্তু—

S'o sweet was ne'er so fatal. I must weep.

But they are cruel tears. The sorrow's heavenly.

বলতে বলতে তার বড়ো চোখ দুটি থেকে জলের ধারা নেমে এল। কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ হয়ে আসছিল, কোন রকমে সে শেষ করলে,

Its strikes where it doth love. She wakes.

রিনা ব্রাউন চোখ বুজেও অনুভব করেছিল সেই আবেগের স্পর্শ। চোখ মেলে দেখলে কৃষ্ণেন্দুর চোখে জলের ধারা। সে অভিভূত হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তে সে অনুভব করলে আরও কিছু। প্রখর স্পষ্ট হয়তো নয়, তবু অন্ধকারাবৃতের মতো অব্যক্ত নয়। কুয়াশার মধ্যে বর্ণের আভাসের মতো অস্পষ্ট। অস্পষ্ট থাকলেও অজ্ঞাত থাকেনি পরস্পরের কাছে। এরপর দুজনের দেখা হলেই একটা কম্পন বুকের মধ্যে অনুভব করত।

রিনা কৃষ্ণেন্দুকে পরে বলেছিল কথাটা। রিনা প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছিল না, কৃষ্ণেন্দুই যুগিয়ে দিয়েছিল। 'তুমি বলছ অন্ধকার কেটে গিয়ে কুযাশার মধ্যে রামধনুর রঙের আভাসের মতো? জান তো কালো কোনো রঙ নয়, কালো হল রঙের অভাব, বর্ণশূন্যতা।'

রিনা বলেছিল, 'দ্যাটস ইট।' বলেছিল, 'তারপর তুমি যখন বললে, থিঙ্ক অব দাই সিনস, আমি বললাম—দে আর লাভস আই বেয়ার টু ইউ. সেই মুহূর্তে আমারও চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।'

অভিনয়ের শেষে কেউ কারুর সঙ্গে কোনো কথা না বলেই চলে গিয়েছিল। পরস্পরের সঙ্গে দেখা করে নি। সারাদিন। শুধু তাই নয় কৃষ্ণেন্দু কেমন হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন আগে লেখা বাবার চিঠিখানা বার বার পড়ত আর ভাবত বাবা কলকাতায় এসেছিলেন [illegible]। এক মাসের উপর সে চিঠি দেয় নি। চিন্তিত হয়ে তিনি চলে এসেছিলেন। আরও একটা কারণ ছিল। ওদের গায়ের হরিবিলাস বসু কলকাতায় থাকেন তিনি দেশে গিয়ে বলেছিলেন ছেলে যে সাহেব হয়ে গেল শ্যামসুন্দরবাবু। [illegible] সাহেব-মেমের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। [illegible] টেবিলে বসে খাচ্ছে [illegible] নিজের চোখে দেখে এলাম।'

বাবা পরদিনই কলকাতায় এসে [illegible] ছিলেন। ওই ঠিকানাই সে ইদানীং ব্যবহার করত মেসের ঠিকানার পরিবর্তে। বোধ হয় ওর মধ্যে পরিষ্কার একটা প্রচ্ছন্ন [illegible] অহংকার ছিল [illegible]— চিঠিপত্র পেতে গোলমাল হত না।

কৃষ্ণেন্দু তখন চেম্বারে একটি [illegible] মেয়েকে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দিচ্ছে, তার সঙ্গে আর একটি মেয়ে বাইরে বসে আছে। আর দুটি রোগী অপেক্ষা করছে। সবাই [illegible] এদিক দিয়ে এদের [illegible] বৈজ্ঞানিক। ওর লজ্জা করে না। [illegible] সোজাসুজি বলে [illegible] আমার সন্দেহ হচ্ছে এবং সন্দেহের কারণও আছে যে, আমার [illegible] অসুখ করেছে। দেখ তো অনুগ্রহ করে।' এবং যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়ে [illegible] সুশেষ করে ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা চলে যায়। এদেশের লোক শুধু গরিবই নয়, কৃপণও বটে। ডাক্তারের ফি নিয়েও দর করে। ফাঁকিও দেয়।

মেয়েটির ইনজেকশন শেষ করে চেম্বার থেকে বেরিয়েই সে বাবাকে দেখেছিল। মেয়েটি তখনও টেবিলে শুয়ে। বিশ্রাম নিচ্ছে।

'বাবা!' বাবাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল সে।

'হ্যাঁ। এক মাসের উপর আটত্রিশ দিন চিঠি দাও নি। চিন্তিত হয়ে এসেছি।' বাবা তার মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে যেন পড়তে চেষ্টা করেছিলেন।

'আমি তো চিঠি দিয়েছি।'

'আমরা তো পাই নি!'

হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, একখানা পত্র লিখেছিল ডাকে দেবার জন্য। চেম্বারে ঢুকে ব্লটিং প্যাডটা তুলে চিঠিখানা বের করেছিল। অপরাধীর মতোই চিঠিখানা হাতে নিয়ে বাবার কাছে ফিরে এসে বলেছিল, 'কাজের মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম, ফেলা হয় নি।'

বাবা বিচিত্র হাসি হেসেছিলেন। তারপর ও সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন না করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এরা সব?'

'রোগী।'

'রোগী? তুমি—?'

'একজন ডাক্তার বন্ধু চিকিৎসা করেন এখানে। তাকে সাহায্য করি। আপনার আশীর্বাদে আমি পাশ-করা ডাক্তারদের চেয়ে ভালো ইনজেকশন দিই।'

এই সময়ে এসেছিল ক্লেটন এবং রিনা। 'হ্যালো ম্যান—'

কৃষ্ণেন্দু তাড়াতাড়ি তার বাবার পরিচয় দিয়ে বলেছিল, ক্লেটন, ইনি আমার বাবা। বাবা, ইনি আমার বন্ধু। আমাদের কলেজেই পড়েন, জন ক্লেটন, আর ইনি রিনা ব্রাউন। বন্ধু আমার।'

'গ্রাণ্ড ওল্ড ম্যান। ক্লেটন সত্যিই খুশী হয়ে বেশ সম্মান দেখিয়ে কথা বলেছিল।

রিনা একদৃষ্টে তাঁকে দেখেছিল।

বাবা আর থাকেন নি—চলে গিয়েছিলেন, দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলেন। কালীঘাটে তিনি চলে গেলে রিনা বলেছিল, 'হি ইজ এ ট্রু হিণ্ডু, এ টিপিক্যাল ব্রাহ্মিন। আমার ভারি ভালো লাগলো। কী মিষ্টি কথা। অ্যাণ্ড ইউ, টারবুলেণ্ট মুব, এ রায়টার, হিজ সন!' তারপরই বলেছিল, 'কি নাম বলতো সেই ব্রাহ্মণের ছেলের—যে বিদ্রোহ করে দেবতা ভেঙেছিল? ইয়েস। কালাপাহাড়—ব্ল্যাক মাউণ্টেন!'

হেসেছিল কৃষ্ণেন্দু। কৃষ্ণেন্দুই ওদের কাছে কালাপাহাড়ের গল্প বলেছে।

পরদিন হাওড় স্টেশনে সে বাবাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিল। বাবা কথা কমই বলেন, ট্রেনে চড়ে একটি কথাও বলেন নি। ট্রেন ছাড়বার সময় শুধু বলেছিলেন, 'সাবধানে চলো।'

হ্রাস পেয়েছিল কৃষ্ণেন্দুর। সাবধানে চলতে হবে? কেন? বাড়ি গিয়ে চিঠি লিখেছিলেন বাবা। লিখেছিলেন, 'ইচ্ছা ছিল আসিবার সময় তোমার সম্মুখেই সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আসি 'কিন্তু 'সাবধানে চলিবে' এই কথা ছাড়া কোনো কথা বলিতে পারি নাই। পত্রেও সকল কথা খুলিয়া লিখিতে বসিয়াও লিখিতে কেমন যেন বাধা অনুভব করিতেছি। তোমার মাকেও এসব কথা বলিতে পারিতেছি না। তাহা হইতে আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। মনে হইতেছে উচিত হইবে না। তুমি উপযুক্ত পুত্র। বিদ্যাবুদ্ধিতে তুমি যখন সুখ্যাতি পাইতেছ, তখন কী করিয়া মন্দ বলিব? কিন্তু তবু বলিতেছি, আমার ভালো লাগিল না। মনে হইতেছে, ভালো হইবে না। যেন বড়ো বেশী আগাইয়া যাইতেছ। আমাদের শাস্ত্রে বলে, উপনয়নের সময় তিন পায়ের বেশী অগ্রসর হইতে নাই। তাহাতে আর ফিরিবার উপায় থাকে না। আমার মনে হইতেছে, তিন পায়ের বেশীই অগ্রসর হইয়াছ তুমি। অপর দিকে বলে, সাত পা একসঙ্গে পথ হাঁটিলে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব হয়। দেখিলাম, কলিকাতায় তুমি অনেক পা অনেকের সঙ্গে হাঁটিয়াছ। সাত পা কিনা জানি না। সপ্তপদ পূর্ণ না হইয়া থাকিলে আর আগাইও না। গোবিন্দ তোমাকে রক্ষা করুন। সপ্তপদ পূর্ণ হইয়া থাকিলে তিনি যেন আর দুইপদ তোমাকে আগাইয়া দেন।'

চিঠি পেয়েও কৃষ্ণেন্দু হেসেছিল। বাবার অমূলক আশঙ্কায় না হেসে করবে কী? আর আশঙ্কা অমূলক না হলে পাথরের গোবিন্দের রক্ষা করবার শক্তিই বা কোথায়? কিন্তু এই ঘটনার, অর্থাৎ ক্লেটনের বিদায়-উৎসব উপলক্ষে ওথেলোর অভিনয়ের মধ্যে আকস্মিকভাবে নিজের যে প্রকাশ তার নিজের কাছে ঘটল, তারপর আবার চিঠিখানা খুলে বার বার না-পড়ে সে পারে নি। কয়েকদিন পরে পেয়েছিল মায়ের চিঠি। তার অভয়দা[illegible]ী উদারদৃষ্টি মা। মা লিখেছেন—'তোর বাবা ভয় পেয়েছেন। তিনি রাগ করলে আমি বুঝতাম হয়তো সহ্য করতে পারছেন না—তোর সত্যকে, বুঝতে পারছেন না তোর ন্যায়কে—তাই রাগ করছেন। কিন্তু ভয় যখন পেয়েছেন তখন যে চিন্তা আমারও হচ্ছে কালো। তবে তুই নিজে হিসেব করে দেখিস।' তা সে করেছিল—নিজেই হিসেব করেছিল, ক-পা সে ছেড়ে এসেছে, ক-পা এগিয়েছে রিনার সঙ্গে? হিসাব করতে বসে আবার মনের জোর ফিরে পেয়েছিল।

ইস্কুল এক পা, সেন্ট জেভিয়ার্স এক পা মেডিকেল কলেজ এক পা। তিন পা হয়ে গেছে। সে জানে উপনয়নের সময় দু-পায়ের পর শেষ পা ফেলার সময় পিতা বা উপনয়নদাতাই পাখানি ধরে পিছিয়ে দেন। ঘরে সংসারী

হয়ে আবদ্ধ হয়, বদ্ধ অবস্থাতেই জীবন কেটে যায়। মানুষের প্রাণ বদ্ধ জলাশয়ের মতো বাষ্প হয়ে পুনর্জন্মের জলধারা হয়ে ঝরে প্রবাহের কামনা করে। সে যদি নদীর স্রোতের গতি পেয়ে থাকে, তবে তাতে তার খেদের কি আছে? হ্যাঁ সে গতি সত্যিই সে পেয়েছে, অনেকদূর চলে এসেছে। তাকে রক্ষা করবার জন্য গোবিন্দের প্রয়োজন নেই। পাথরের বিগ্রহ গোবিন্দের নাগালের বাইরে সে। গোবিন্দ সজীব সত্য হলে সে তাকে মানবে। তার সামনে গিয়ে তবে দাঁড়াবে।

কল্পনার গোবিন্দকে সে তো মানে না। বিজ্ঞানের তথ্যগুলি যে তার সম্মুখে নতুন পথ খুলে দিয়েছে। তার কোনো পথই তো পুরাণের বৈকুণ্ঠের দিকে যায় নি।

আর রিনার সঙ্গে? কত পদ? কত পদ হল?

যত পদই হোক সপ্তপদ হয় নি। এবং ওপথে আর পদক্ষেপ করবে না স্থির করেছিল. কারণ—রিনা, ক্লেটনের মনোনীত বধূ। ক্লেটন তার বন্ধু। এখানের সে বাবা-মার চিঠি না-মেনেও সাবধান হল। পরদিন থেকে রিনাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিলে। রিনাই চিঠি লিখলে। ও তার জবাব দিলে. 'জনি ছিল. জনির সঙ্গে যেতাম। জনি চলে গেছে। আমার সামনে পরীক্ষাটাও বটে। জনি ফিরে এলে যাব। আমার দোষ নিয়ো না।' জন ক্লেটন চলে গেছে মিলিটারী ট্রেনিংয়ে।

* * * *

'বাবাসাহেব!' অতীতকালের স্মৃতি কথাকে ডুবিয়ে দিয়ে বর্তমান যেন কথা কয়ে উঠল। কে তাঁকে ডাকলে।

'কে!' থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণস্বামী। কারুর অসুখ না কি?

.'ই সকালে পয়দলে কুথাকে যাবেন গো? সাইকেল কী হল?'

কোনো গ্রাম থেকে মাথায় কলসী এবং পাটের শাকের বোঝা নিয়ে কয়েকজন লায়েক চলেছে বিষ্ণুপুরের দিকে। পথে বাবাসাহেবকে দেখে স্মিতহাস্যে সঙ্গে আত্মীয়ের মতো প্রশ্ন করছে।

পথ ভুল হয়ে গেছে কৃষ্ণস্বামীর। বনের মধ্যে পথ-ভুল একটা সাধারণ ব্যাপার।

নিজের আস্তানার পথ ফেলে অনেকটা চলে এসেছেন। বন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। বন শেষ হলেই একেবারে বিষ্ণুপুরের প্রান্তভাগে উঠবেন একেবারে যমুনা বাঁধের কাছাকাছি।

থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণস্বামী।

ফিরবেন এখান থেকে? না।

একবার যাবেন লাল-বাঁধের ধারে। লাল-বাঁধের পাড়ের উপর সেই পাথরখানাকে স্পর্শ করে যাবেন, যেখানকার উপর রামকৃষ্ণ পরমহংস বসে বিশ্রাম করেছিলেন।

মনের মধ্যে অবাধ্য স্মৃতির পীড়ন আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

মুছে যাক, অতীত কালের সব স্মৃতি মুছে যাক। পরশপাথরের ছোঁয়াতে লোহা সোনা হয়; ওই বৈরাগীশ্রেষ্ঠের আসনখানার স্পর্শে তাঁর মন বৈরাগ্যে ভরে উঠুক। বৈরাগ্যের গেরুয়ার ছাপে সুখ দুঃখ হাসি-কান্নার রামধনুর সাত রঙ নিঃশেষে ঢেকে থাক।

॥ পাঁচ ॥

মহাপুরুষের স্পর্শ মহাপুরুষের সঙ্গেই চলে যায়। অন্তত বস্তুজগতে থাকে না। বস্তুজগতের মধ্যে পাথরের শক্তি নেই, থাকলে মিশরের কাবা ওদের মসজিদের কল্যাণেই পুরো [illegible]। বুদ্ধের অস্থির উপর স্তূপের কল্যাণে ভারতবর্ষে সকল দুঃখ দূরে যেত। ঈশার পুত্রের আবির্ভাবের পর প্রতিবেশীতে মিলে ইয়োরোপ জুড়ে এক অপরূপ প্রেমের রাজ্য গড়ে উঠত। এমন ভাবে ইয়োরোপই বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে উঠত না।

থাকে মহাপুরুষের স্মৃতি আর বাণী। [illegible] মনে বয়ে চলে,—নদীর মতো। কিন্তু মনে যখন সংশয়ের ঝড় ওঠে—কোথা কোন্ দূর দিগন্ত থেকে বালি এসে জমা হয়, যখন গ্রীষ্ম জেগে ওঠে—মরুভূমি হয়ে ওঠে মন তখন সে-নদীর স্রোতও শুকিয়ে যায়। শুধু [illegible], উত্তপ্ত বালির চড়ার মধ্যে হা-হা করে।

ঠিক তেমনি ভাবে কৃষ্ণস্বামীর মন প্রবল তৃষ্ণায় হাহাকার করছে। কোনো-ক্রমেই তিনি রিনা [illegible]র কথা ভুলতে পারছেন না। কী করে পারবেন? এই রিনা দেখে সেই রিনাকে ভুলবেন কী করে? মরুভূমির মধ্যে যে নদীটি আগে বইত—তার স্মৃতি কি ভোলা যায়?

বিষ্ণুপুরের লাল বাঁধের ধারে পাথরখানিকে ছুঁয়ে বসেই একমনে ভাবছিলেন কৃষ্ণস্বামী।

মনে পড়ছে রিনার সেই মূর্তিমতী সান্ত্বনার মতো মূর্তি। দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষের মেঘের মধ্যে জলভরা বড়ো-বড়ো দুটি চোখ। সজল চোখে কৃষ্ণেন্দুর দিকে

তাকিয়ে বলেছিল, 'ইউ আর হার্টলেস, ইউ আর হার্টলেস কৃষ্ণেন্দু। আ ডিড নট নো। নেভার থট ইট ঈভন্!' কথাটা রিনা বলেছিল—কৃষ্ণেন্দুর মাতৃবিয়োগের পর। ছবিটা জ্বলজ্বল করছে।

মা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গিয়েছিলেন। কৃষ্ণেন্দু টেলিগ্রাম পেয়ে গিয়ে তাঁকে দেখতে পায় নি; পনের কুড়ি দিন পর শ্রাদ্ধশান্তি সেরে কামানো মাথা নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিল। বন্ধুরা জানত। কিন্তু রিনাকে বলে যাবার কথা মনে হয় নি। কারণ এর মধ্যে কয়েক মাসেই খানিকটা দূরেই চলে এসেছিল সে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় মনোজগতে রিনার কাছ থেকে দূরে সরেছিল সে সুকৌশলে। ডাক্তার সে। একালেব ডাক্তারিতে মানসতত্ত্বও পড়তে হয়। একনাগাড়ে নব্বুই দিন মনকে বেঁধে বাখলে, দূরে সরিয়ে রাখলে মনের আকর্ষণের সূত্র ক্ষীণ-জীর্ণ হয। বন্ধুব বধূ সম্পর্কে আসক্তিহীন হবার জন্যই সে সংকল্প করে তা-ই করেছিল। বিনা ক্লেটনেব মনোনীতা। তাবও বাবা-মা আছেন। হাসপাতালে পলি ব্রাউনেব সঙ্গে দেখা হত, তার সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু তাও যথাসাধ্য কম, রিনার কথা তুলতই না। মাতৃশ্রাদ্ধ সেরে ফেরার পর তার কামানো মাথা দেখে পলি ব্রাউন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল কী হয়েছে কৃষ্ণেন্দু? এনি মিস্হাপ?'

'আমার মা—।'

'মারা গেছেন? বাবা-মা মাবা গেলে তোমরা মাথা কামাও?'

'হ্যাঁ মিসেস ব্রাউন। আমাব মা হঠাৎ হার্টফেল কবে মারা গেছেন। আমি দেখতেও পাই নি।'

পলি ব্রাউন পরমাত্মীয়ার মতোই সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিল। অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছি কৃষ্ণেন্দু। সন্ধ্যায় সে ধর্মতলাব বন্ধুর চেম্বারে বসে আছে, এমন সময় এল রিনা। চোখে জল নিয়ে সে তাকে তিরস্কার করে অনুযোগ জানালে, 'তুমি হৃদয়হীন কৃষ্ণেন্দু। আমি জানতাম না। ভাবি নি কখনও।'

'বোসো রিনা।'

'না। এই কটা কথাই বলতে এসেছিলাম। তোমার মায়েব মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সেদিন একটা খবরও দাও নি? এত পর ভেবেছ?'

তার হাত ধরে তাকে আটকে কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি।'

তখন বসেছিল রিনা। সেদিন শুধু তার মায়ের কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল এবং কৃষ্ণেন্দু সত্যসত্যই কেঁদেছিল, 'আজকের কথা আমর মনে অক্ষয় হয়ে

রইল রিনা। তোমার পবিত্র হৃদয় স্বর্গের মতো। তার স্পর্শে আমার মন জুড়িয়ে গেল।'

একটুখানি হাসি ফুটে উঠেছিল রিনার মুখে। বেদনায় ম্লান, কিন্তু শান্ত। বলেছিল, 'সত্যিই মায়ের স্নেহ আমি কখনও পাই নি কৃষ্ণেন্দু। মামি পলি আমাকে ভালোবাসে, তার চেয়েও গাঢ় ভালোবাসার স্বাদ পাই আমি কুন্তীর কাছে। ভাবি, ও শুধু আমাকে মানুষ করেছে। আমার আয়া। তা'হলে গর্ভধারিণী মায়ের স্নেহের স্বাদ কেমন ?' রিনা চলে গেলে কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে বসেছিল কৃষ্ণেন্দু। এই ঘটনা থেকেই আবার রিনার সঙ্গে যোগসূত্র নতুন হয়ে উঠল। সূত্রটা সুতো ছিল না, কালের সঙ্গে মাত্র কয়েক মাসই জীর্ণ হয়ে যাবার মতো উপাদানে তৈরী ছিল না। ওটা ছিল সোনার মতো ধাতু থেকে গড়া। হাজার বছর পরেও মাটির তলা থেকে ওঠা সোনার আভরণের মতো হাজার বছর আগের দুটি হৃদয়ের যোগাযোগের সাক্ষ্য দেবে।

খাঁটি সোনা। কোন খাদ ছিল না।

আবার হঠাৎ একদিন। সেদিন হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে ঢুকেছে, কুন্তী—রিনার আয়া—ছুটে এসে তা ক বললে, 'ডাক্তারবাবু।'

অদ্ভুত তার চোখের দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি এমন যে যেন কথা কইতো। বুকের ভিতরে রাগ হোক, হিংসা হোক, ভয় হোক, আতঙ্ক হোক, সে যেন আপনার রূপ নিয়ে স্পষ্ট ফুটে বের হ'ত। কুন্তীর চোখে সেদিন ছিল আতঙ্ক আর আকুতি। দৃষ্টি থেকেই সে বুঝলে কিছু ঘটেছে।

কৃষ্ণেন্দু তখন সদ্য পাশ করেছে। হাউস-সার্জন হয়ে রয়েছে। তার কল্পনা—সে বিলেত যাবে। বছর দুয়েকের মধ্যেই টাকা সে সংগ্রহ করতে পারবে। টাকা তার কিছু আছে। মা তাঁর মৃত্যুকালে গহনাগুলি তাকে দিয়ে গেছেন। শ্রাদ্ধের পর তার বাবা তার হাতে সেগুলি দিয়ে বলেছেন—তুমি নিয়ে যাও। আমার খরচের হাত। পাশ করে তুমি ডিসপেন্সারি করবে বলেই সে দিয়ে গেছে! তা ছাড়াও কলেরার চিকিৎসায় স্যালাইন ইনজেকশনে এরই মধ্যে তার খ্যাতি যথেষ্ট হয়েছে এবং সাহস তার অপার। সেদিকে তার উপার্জনের পথ প্রশস্ত। পাশ যতদিন করে নি, ততদিন অন্য ডাক্তারের পিছনে তাকে যেতে হত। এবার সে একলা যাবার অধিকার অর্জন করেছে। এবং এ-দেশের বড়লোকদের বাড়িতে দুষ্ট খাবারের প্রবেশাধিকার আজও অবাধ এবং তাদের গণ্ডেপিণ্ডে খাবার প্রবৃত্তি প্রচণ্ড। কলকাতা শহরে মাছিরও অভাব নাই। ভ্যাকসিনও এরা নেয় না। ওদের বাড়িতে মোটা টাকা উপার্জনের পথ তার অনিবার্য। ধর্মতলার ডেরায় ছাড়া ও

চিৎপুর অঞ্চলে একটা চেম্বার করেছে। সালভারসন ইনজেকশনে নাম সব থেকে বেশী। ধর্মতলায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা লজ্জা না-করে চিকিৎসা করায়। চিৎপুর অঞ্চলে, যারা লজ্জা করে সংগোপনে চিকিৎসা করাতে চায়, তাদের জন্য চেম্বার। এখানে চার টাকার জায়গায় আট টাকা ফী। রিনার কথা গোপন অন্তরে আছে কিছু তার খবর রাখে না। বিদেশে চলে যেতে চায়।

কুন্তী সভয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছিল, 'রিনা কাঁদছে ডাক্তারবাবু।'

'কাঁদছে?'

'ফুলে ফুলে কাঁদছে। সকাল থেকে।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'জানি না, জনি সাহেবের বাবার কাছ থেকে কী চিঠি এসেছে সাহেবের কাছে। আমি জানি না, ওরা বলছে।'

কৃষ্ণেন্দু না-গিয়ে পারে নি। রিনা সত্যই পড়ে পড়ে কাঁদছিল। কৃষ্ণেন্দু যেতেই সে—একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'আমি কী করব কৃষ্ণেন্দু?' এবং আবার সে ফুলে ফুলে কেঁদে চলেছিল।

জনির বাবা চার্লস ক্লেটন চিঠি লিখেছে ব্রাউন সাহেবকে। 'আপনার চিঠি জন পেয়েছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি সত্যকারের একজন ইংরেজ এবং ক্রিশ্চান; আমিও তাই। জনিও ক্রিশ্চানের ছেলে ক্রিশ্চান। রিনাকে বিবাহ করা নিয়ে সে যখন আপনাকে একখানা চিঠি লিখতে উদ্যত হয়েছিল, তখনই আপনার চিঠি সে পায়। জন যে-কথা আপনাদের জানাতে চেয়েছিল, সে-কথা আমি জানাই। যাচাই না হলে প্রেমের ঠিক মূল্য বোঝা যায় না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, রিনার সঙ্গে মেলামেশার স্বরূপকে সে অল্পদিনেই বুঝতে পেরেছে। বন্ধুত্বকেই সে প্রেম বলে ভুল করেছিল। জন এখানে এসে চাকরি নিয়ে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে তার প্রকৃত ভালবাসার পাত্রীর সন্ধান পেয়েছে। কর্নেল রেমণ্ড আমার পুরনো বন্ধু। পলি তাঁকে জানে। তাঁর মেয়ে এমিলি। এমিলি রেবও অত্যন্ত ভালো এবং সুন্দরী মেয়ে। তারা দুজনেই দুজনকে ভালোবেসেছে এবং শীঘ্রই তারা স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হবে। এ পুয়োর গার্ল ইন ডিসট্রেস ইজ এ সেক্রেড থিং; রিনা দুঃখ পেলে তার জন্য আমার গভীর সহানুভূতি রইল। সময়ে সবই সেরে যাবে। রিনার সম্পর্কে যে সত্য আপনি তাকে জানিয়েছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি একজন খাঁটি ক্রিশ্চান।'

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। ক্লেটন সম্পর্কে মনে একটা আঘাত পেয়েছিল। একটা দুরন্ত ক্ষোভ জেগে উঠেছিল তার। সে আজ এখানে

থাকলে—। সে খোলা জানালা দিয়ে কলকাতার বাড়িগুলোর মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। ক্লেটন এমন পাষণ্ড!

'আই গেভ হিম মাই এভরিথিং কৃষ্ণেন্দু।' রিনা বালিশ মুখে গুঁজে কাঁদতে লাগল এবার।

'রিনা! কেঁদো না। রিনা! লুক অ্যাট মী ইন মাই ফেস্—রিনা!'

রিনা তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। মৃদু বিষণ্ণ হেসে বলেছিল, 'তুমি যদি আজ আমাকে ওথেলোর মত গলা টিপে মেরে ফেলতে পার কৃষ্ণেন্দু!'

এক মুহূর্তে কী হয়ে গিয়েছিল। একটা প্রকাণ্ড উঁচু বাঁধকে টলতে টলতে হেলে ঢলে সশব্দে ভেঙে ভূমিসাৎ হতে কেউ দেখেছে? ঠিক তেমনিভাবে বাঁধ ভেঙে পড়ল আর উন্মত্ত জলস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো জীবনের সকল আবেগ যেন মুহূর্তে মুক্তিলাভ করল। 'রিনা—রিনা—আমি তোমাকে ভালবাসি, কথা কটি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। অবশ্য সে উন্মাদের মতো রিনার বুকের উপর পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

'রিনা আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালবাসি, রিনা! রিনা! মাই লাভ। আমার সব। রিনা! আমি তোমাকে ভালবাসি।'

মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে রিনা শুধু বলেছিল, 'কৃষ্ণেন্দু! মাই কৃষ্ণেন্দু!'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, রিনা।'

সে শুধু বলেছিল—'কৃষ্ণেন্দু—মাই কৃষ্ণেন্দু!' মাই কৃষ্ণেন্দু!'

তারপর মুখের উপর মুখ রেখে দীর্ঘক্ষণ তারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ পর কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমি আর দেরি করতে চাই না। যত শিগগির হয় বিয়ে করতে চাই। কাল এসে আমি তোমার বাবা-মাকে বলব।'

পরের দিন কৃষ্ণেন্দু গিয়ে বলেছিল ব্রাউন সাহেবকে।

ব্রাউন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ইউ সি মিস্টার গুপ্টা, আমি একজন ইংরেজ। তার চেয়েও বেশী, আমি একজন ক্রিশ্চান। আমার মেয়ে রিনা অবশ্য একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, তার মধ্যে কিছুটা এদেশের রক্ত আছে, কিন্তু সে আমার মেয়ে। আজকালকার দিনের মতো তিন আইনে রেজেষ্ট্রি করে বিয়েতে আমি রাজী নই। সেও হবে না। সে আমার চেয়ে বেশী ক্রিশ্চান ধর্মে অনুরাগী। তোমাকে আমি জানি। তুমি কৃতি মানুষ। সাহসী এবং সৎ লোক। বিয়েতে আমার অমত নেই, কিন্তু তোমাকে ক্রিশ্চান হতে হবে।'

ক্রিশ্চান হতে হবে! স্তম্ভিত হয়ে গেল কৃষ্ণেন্দু। এতটা ভাবেনি সে।

ধর্ম সে মানে না। সেখানে ধর্মান্তরের কথা হয়তো কিছুই নয়। তবু একটা যেন প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করলে।

'ভেবে দেখো, ইয়ং ম্যান! কাল এসে উত্তর দিয়ো। কাল না পার কয়েকদিন পর।

কৃষ্ণেন্দু মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে ফিরছিল। রিনার ঘরের দোরে থমকে দাঁড়িয়েছিল। রিনার দরজা বন্ধ ছিল। সে ডেকেছিল 'রিনা!'

ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলে, 'তুমি যাও, তুমি যাও। আমি ভাবি নি। আমি এ-কথা ভাবি নি। গো ব্যাক কৃষ্ণেন্দু, গো ব্যাক।'

'রিনা!'

'না! না! না! ফরগেট মি। গো ব্যাক।'

সে চলে এসেছিল। সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে কুন্তি। সে কাঁদছিল। কৃষ্ণেন্দুকে দেখে বলেছিল, 'রিনা মরে যাবেক—ডাক্তার বাবা—রিনা মরে যাবেক।

পৃথিবী ঘুরেছিল। আকাশ-মাটি, ঘর-বাড়ি, মানুষ—সব যেন পাক খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল। একটা অসীম শূন্যতায় ভরে যাচ্ছিল তার মন। সব শূন্য, সব শূন্য। রিনা ছাড়া আজ আর সে পৃথিবীতে বাঁচবার কল্পনা কবতে পারে না। ধর্ম? ধর্ম তো সে মানে না। সত্যই মানে না। ঈশ্বরও মানে না। সে মানে নূতন কালের নূতন সত্যকে। ঈশ্বর নেই, এই সত্যই তার কাছে আজ একমাত্র সত্য! ট্রুথ ইজ গড—সত্য যদি ভগবান হয়, তাহলে সব ধর্মই আজ সমান মিথ্যা তার কাছে। তবু একটাকে অবলম্বন করে থাকতে হয়েছে তাকে। সে মানে না, তবু তাকে লোকে বলে হিন্দু বৈদ্য। তাকে কাগজে লিখতে হয়, ফর্ম পূর্ণ করতে হয়। কিন্তু আজ রিনা তাব জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য। তার জন্য সে হবে ক্রিশ্চানই হবে। তার বাবা—।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা তার হাহাকার করে উঠল।

বাবা। তার বাবা! বাবা কি এটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারবেন? কিন্তু ক্রিশ্চান হয়েও কি সে তাঁর সন্তান থাকতে পারবে না? তাঁর ধর্ম নিয়ে তিনি থাকবেন। তাঁর আচার-আচরণ সমস্ত কিছুকে সে আজ শ্রদ্ধা করে তেমনি করবে। সে তো কোনো ধর্মের আচারণের মধ্যে নিজের জীবন-সত্যকে সন্ধান করবে না, সে সন্ধান করবে তার ধর্ম এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক-জীবনের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে। তবে কিসের বিরোধ, কিসের সংঘর্ষ? হবে সে ক্রিশ্চান শুধু নামে রিনার জন্য! দুরান্তরেই সে থাকে, বাবা থাকেন গ্রামে। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তাকে তাঁর প্রয়োজন,

কতটুকু? সেবার? সেবা সে করবে। তিনি ছোঁবেন না? তাঁকে ছোঁবেন না, রিনাকে ছোঁবেন না? কেন ছোঁবেন না! কেন?

অর্ধোন্মাদের মতো সে বেরিয়ে এল। তার অন্তর থেকে দেহের অণু-পরমাণু চিৎকার করছিল, 'রিনা—রিনা—রিনা!' রিনাকে ভিন্ন সে বাঁচতে পারে না। এ তার দেহলালসা নয়। সে বার বার পরীক্ষা করেছে। তার চেয়ে বেশি কিছু! অনেক অনেক বেশী।

হাসপাতাল থেকে শরীর অসুস্থ বলে সে চলে এল। ছোটো একটা ব্যাগে সামান্য কটা জিনিস নিয়ে হাওড়ায় ট্রেনে চেপে বসল। বাড়ি পৌঁছে দাঁড়াল বাবার সামনে।

'তুমি হঠাৎ!' বাবা চমকে উঠলেন। একি চেহারা?

'আপনার কাছে এসেছি। অনুমতি চাইতে এসেছি। আমি একটি ক্রিশ্চান আংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

বাবা চমকে উঠলেন না। চিৎকার করলেন না। তার মুখের দিকে চেয়ে অভ্যাসমতো শান্তভাবেই বললেন, 'এ আমি জানতাম।'

বাবার পা দুটো ধরে উপুড় হয়ে পড়ে কৃষ্ণেন্দু উন্মাদের মতো বলেছিল, 'আপনি বলুন।'

বাবা বলেছিলেন, 'তুমি উন্মাদ। নইলে আমার পায়ে ধরে লজ্জাহীন হয়ে এ-কথা বলতে পারতে না যে একটি ক্রিশ্চান মেয়ের জন্য আমার ধর্ম তুমি ত্যাগ করবে!'

'তাকে ভিন্ন আমি বাঁচব না।'

'তুমি মরে গেলে আমি আত্মহত্যা করব, এ-কথা আমি বললে মিথ্যা বলা হবে কৃষ্ণেন্দু। আত্মহত্যা আমি করব না, কষ্ট নিশ্চয়ই পাব, কিন্তু বাঁচব, ভগবানের নাম করে বাঁচব। আমার ধর্মে আত্মহত্যা অধর্ম।'

সে চীৎকার করে উঠেছিল, 'বাবা!'

বাবা শান্ত স্বরে বলেছিলেন, 'উত্তর আমি দিয়েছি কৃষ্ণেন্দু। ওই মেয়েকে বিয়ে করলেও আমার কাছে তুমি মৃত, মেয়েটিকে না পেয়ে মরে গেলেও তাই। আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'আর এগিয়ো না।' তুমি শোন নি। তার সঙ্গে জীবনের অগ্নিসাক্ষী করে সাত পা যদি হেঁটে থাক, তা হলে তোমার উপায় কী?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হেসে তিনি গোবিন্দ স্মরণ করেছিলেন! আর কথা বলেন নি, উঠে চলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কৃষ্ণেন্দু যেমন উন্মাদের মতো গিয়েছিলেন তেমনি উন্মাদের মতোই ফিরে চলে এসেছিল।

একেবারে স্টেশনে। বাবা তার একবার ফিরেও ডাকেন নি। কলকাতায় পথে মাঝখানে নেমে পড়েছিল। সারাটা রাত বসে ছিল প্লাটফর্মের উপর ভোর রাত্রে আবার ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরেছিল।

এসে রিনার চিঠি পেয়েছিল, 'না—না—না। এ তুমি কোরো না। কৃষ্ণেন্দু আমি মিনতি করছি। এই আমার শেষ কথা কৃষ্ণেন্দু। আমি আসানসোল যাচ্ছি। যাচ্ছি রেভারেণ্ড আরনেস্টের কাছে। তাঁর কাছে শান্তি আছে। শান্তির জন্যে যাচ্ছি আমি। রিনা।'

কিন্তু কৃষ্ণেন্দু তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মন স্থির করেছে।

রিনাকে তাকে পেতেই হবে। জীবনের যে-কোন মূল্যে রিনাকে তার চাই। ধর্ম-জাতি-কর্ম-প্রতিষ্ঠা—সব, সব দিতে পারে সে। রিনা জানে না, রেভারেণ্ড আরনেস্ট তাকে শান্তি দিতে পারবেন না। পারেন না। তাঁর ধর্মও পারে না। শান্তি-সুখ-আনন্দ-তৃপ্তি—সব আছে তার তাকে পাওয়ার মধ্যে। জীবনের সুখ, জীবনের শান্তি যেমন ভোগের মধ্যে বস্তুর মধ্যে নেই—তেমনি জীবনকে ছেড়ে দিয়ে আদর্শবাদের বা ধর্মের আচার আচরণ মন্ত্র জপ ত্যাগ বা কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যেও নেই। শুধু কায়ার মধ্যেও নেই আবার কায়া বাদ দিয়ে মায়ার মধ্যেও নেই। কায়া-মায়া মাখামাখি এই জীবন। জীবনের কাম্য যদি কোথাও থাকে তবে সে জীবনের মধ্যেই আছে। রিনা, তুমি যা চাও তা আমার মধ্যে, আমি যা চাই তা তোমার মধ্যে। রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্বাদ মন মাধুর্য-স্নেহ প্রেম সান্ত্বনা, এই তো জীবনের কামনা। এ আছে জীবনের মধ্যেই। আর কোথাও নেই।

সে বেরিয়ে পড়েছিল আবার। আর দেরি নয়। একবার গিয়েছিল সে ব্রাউনের কাছে, পলির কাছে। 'আমি ক্রিশ্চান হওয়া ঠিক করেছি, মিস্টার ব্রাউন।'

ব্রাউন কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর উঠে এসে তার হাত ধরে বলেছিল, 'আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, গুপ্টা!'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আশা করি রিনার সঙ্গে বিয়েতে কোনো অমত থাকবে না আপনার?'

'নিশ্চয়ই না। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দেব। রিনা আঘাতে মর্মাহত হয়ে আসানসোল গেছে। সে থাকলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

'আজই আমি যাচ্ছি চার্চে।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, যদি বল।'

ব্রাউনের সাহায্যে তার ধর্মান্তর গ্রহণ অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল। ধর্মান্তর গ্রহণের পর ব্রাউন বলেছিল, ইউ রান আপ টু রিনা। ব্রিং হার ব্যাক।'

পলি বলেছিল, 'সে কাঁদতে কাঁদতে গেছে। আসুক সে হাসিমুখে।'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'কাল যাব।'

ফিরে গিয়েছিল তার বাসায়। তার আগের দিন সে নতুন বাসা করেছে ধর্মতলায়। রিনাকে নিয়ে সংসার পাতবার মতো বাসা। যেখানে ছিল, ক্রিশ্চান হবার পর আর সেখানে থাকতে চায় নি। নিষ্ঠুরভাবে আঘাত দেবে প্রতিবেশীরা। মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল। ধর্ম যদি ঈশ্বর দেয়, তবে এমন অনুদার কেন? প্রেমহীন করে কেন মানুষকে? এক মুহূর্তে এতকালের প্রীতি স্নেহ সব মুছে গেল? সব মুছে গেল? ঈশ্বর কি প্রেমহীন, প্রীতিহীন, স্নেহহীন? সে কি বিদ্বেষপরায়ণ? সে কি আঘাত করে? মনটা কেমন হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম সে মানে না। ঈশ্বরকে সে নেই বলেই ধ্রুব জানে। তবু হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করে কেমন যেন হয়ে গেল মনটা।

সারাটা রাত বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে রইল। নিউ টেস্টামেণ্টখানা নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। মন লাগল না। রিনার ছবি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মন তখন আবার উৎসাহে ভরে উঠেছে। সারা রাত রিনার সঙ্গে বিয়ের স্বপ্ন দেখেছে। সে উঠল। আসানসোল। আসানসোল যাবে সে। রিনা। সকালের রোদ যেন সোনার ঝলক বলে মনে হচ্ছে।

পৃথিবী মাটির। পৃথিবী কঠিন। সূর্যের আলো সোনা নয়, বড়ো উত্তপ্ত। মানুষের সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ তার আত্ম-প্রবঞ্চনায়। নিজেকে নিজে সে যত বঞ্চনা করেছে তার চেয়ে বেশী বঞ্চনা আর কেউ করে নি। অলীককে সত্য বলে ধারণা করে তার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একদিন সে মুখ থুবড়ে পড়ে হাহাকার করে মরে। সেই অলীকের মোহে সোনাকে বলে মাটি। মুখের খাদ্য ঠেলে দিয়ে উপবাসে নিজেকে পীড়িত করে।

রিনার যে-দৃষ্টি, সেই স্তম্ভিত-বিস্ময়-ভরা মুখ আজও তার মনে পড়ে।

সে আসানসোলে মিশনে এসে রিনাকে সামনেই পেয়েছিল। রেভারেণ্ড আরনেস্টের বাংলোর সামনে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

কৃষ্ণেন্দু উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে ডেকেছিল দূর থেকে, 'রিনা! রিনা!'

রিনা চমকে উঠেছিল, 'কৃষ্ণেন্দু?'

'হ্যাঁ, রিনা। আমি কাল ব্যাপটাইজ্‌ড হয়েছি। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আর কোন বাধা নেই। তুমি আমার। ইউ আর মাইন।'

রিনায় বিচিত্র রূপান্তর ঘটতে লাগল। কৃষ্ণেন্দু তার হাত ধরতে গিয়ে থমকে গেল। রিনা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

নিষ্পলক দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে, তার মুখের উপরই নিবদ্ধ, তবু যেন সে তাকে দেখছে না, যৌবনমাধুর্যে অপরূপ তার মুখখানিতে কী লেখা যেন ফুটছে কপালে, ভ্রূতে দুটি ঠোঁটে ক্ষীণ রেখায় স্তম্ভিত বিস্ময়ের সঙ্গে আরও দুর্বোধ্য কিছু যেন ফুটে উঠছে সমস্ত কিছুতে। তার মধ্যে আশ্চর্য দৃঢ়তা এবং আশ্চর্য আরও কিছু। মহিমা? হ্যাঁ তাই।

ধীরে ধীরে রিনা বলেছিল, 'ক্রিশ্চান হয়েছ? আমার জন্য?'

'হ্যাঁ, রিনা।'

'তোমার ধর্ম, তোমার ঈশ্বর ত্যাগ করেছ? ছি! ছি!'

'রিনা, কী বলছ?'

'তুমি বুঝতে পারছ না? কি ভয়ানক!'

'রিনা! আমি তোমার জন্য জীবন দিতে পারি! রিনা!'

'লাইফ ইজ মর্ট্যাল! জীবন নশ্বর। একদিন তা যাবেই। অসংখ্য জীবন অহরহ যাচ্ছে কৃষ্ণেন্দু. ইচ্ছে করে মানুষ মরছে, বিষ খাচ্ছে, গলায় দড়ি দিচ্ছে। মানুষ মানুষকে মেরে নিজে মরছে। কৃষ্ণেন্দু, সেদিন এখান থেকে কিছু দূরে হাজারিবাগে একজন বাঘ মারতে গিয়ে বাঘের হাতে মরেছে! জন ক্লেটনও হয়তো কোনো যুদ্ধে গুলির সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ দেবে। বাধ্য হয়ে দেবে। এমন জীবন দেওয়াটা নেশার ধর্ম কৃষ্ণেন্দু। আমার প্রভু জীবন দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের জন্য, ধর্মের জন্য। তুমি আমার জন্যে তোমার সেই ধর্ম, তোমার বিশ্বাসের ঈশ্বরকে ত্যাগ করলে কৃষ্ণেন্দু। ফর এ গার্ল? ফর দিস আইজ অব মাইন হুইচ ইউ সো অ্যাডোর—'

কৃষ্ণেন্দু প্রথমটায় বিচলিত হয়ে গিয়েছিল রিনার এই আকস্মিক আক্রমণে। এ-রিনাকে সে এই প্রথম দেখছে। ধর্মান্ধতায় উগ্র উন্মাদ! সে নিজেকে সংবরণ করে এবার বাধা দিয়ে বলেছিল, 'ডোণ্ট বি সিলি, রিনা।'

'সিলি?' প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল রিনা।

দৃঢ়স্বরে কৃষ্ণেন্দুও বলেছিল, 'ইয়েস। সিলি। কারণ কোনো একটা ধর্মকে মানুষ অবলম্বন করে, রিনা, ওই ধর্মকে অতিক্রম করে সর্বজনীন মানব-ধর্মে উপনীত হবার জন্য। এই ধর্মের গোঁড়ামী আর বন্ধনের মধ্যে বন্দীর মতো বাঁধা থাকবার জন্য নয়।'

'ইয়েস। মানি। শুনেছি। কিন্তু বুঝতে পারি না। যা পারি, এটুকু বলতে পারি যে, যারা ওখানে পৌঁছুতে চেষ্টা করে, তারা একত্রে মানুষকে

পাবার জন্য সে-তপস্যা করে না। তপস্যা করে সব মানুষকে আপন-জন বলে পেতে। একটি নারীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না কৃষ্ণেন্দু, সকল জনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, ঢেলে দেয়। ঈশ্বর বড়ো পবিত্র; বড়ো মূল্যবান। তাঁকে তুমি ত্যাগ করলে কৃষ্ণেন্দু? আমার জন্যে? না। না।

'কী বলছ তুমি রিনা?'

রিনা আবার স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'রিনা!'

রিনা বললে, 'না আমার জন্যে নয়। সে সৌন্দর্য তুমি ভালোবাস সেই সৌন্দর্যময় একটি নারীর জন্য।' কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে আসছিল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল এবার!

ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণেন্দু তার হাত ধরে বললে, 'রিনা—'

'ছেড়ে দাও! লীভ মী। ডোণ্ট টাচ মী। প্লীজ—প্লীজ।'

'রিনা!'

নিরুচ্ছ্বাস কান্না কাঁদতে কাঁদতে রীনা বললে, 'তুমি ভয়ংকর, কৃষ্ণেন্দু, তুমি ভয়ংকর। একটা নারীর জন্য তুমি তোমার ঈশ্বরকে ছাড়তে পার। কৃষ্ণেন্দু, আমার চেয়ে সুন্দরী নারী অনেক আছে। তাহলে তাদের কাউকে যখন দেখবে, সংস্পর্শে আসবে, সেদিন আমাকেও তুমি ছুড়ে ফেলে দেবে তুচ্ছ বস্তুর মতো। তোমার যে ঈশ্বরকে তোমার একান্ত আপনার বলে এতদিন জেনে এসেছ, ভালোবেসেছ—বিপদে ডেকেছ—অভয় পেয়েছ—। ওঃ! তুমি যাও। আমি তোমাকে ভালোবাসি! কিন্তু না। বিবাহ করতে আমি পারব না। তুমি ভয়ংকর!

কৃষ্ণেন্দু স্তম্ভিত হয়ে বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। প্রতিটি কথা তাকে যেন বিদ্ধ করছিল সূচের মত। একটু থেমে রীনা আবার বললে,—'তোমার বাবা যদি আমায় বলেন—তোমার জন্যে আমাকে আমার ধর্মের সঙ্গে আমার ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে হবে—তবে আমি তা পারি? না—না—না। তুমি যাও—তুমি যাও।' বলেই সে যেন ছুটে পালিয়ে গেল। একটা আতঙ্ক যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

পাথর হয়ে গেল কৃষ্ণেন্দু। স্থির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, অর্থহীন। তার কেউ নেই। কিছুই তার নেই। কি করবে সে? বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃদ্ধ পাদরী। তিনি বোধ হয় দুজনের কথার মধ্যে আসতে চান নি। তিনি এবার এগিয়ে এলেন।

'ইয়ং ম্যান!'

'শুভ মর্নিং, ফাদার।' সে সচেতন হয়ে উঠল এতক্ষণে।

'শুভ মর্নিং। বসবে? বিশ্রাম করবে?'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফাদার? অনেক ধন্যবাদ। তার প্রয়োজন নেই। আমি নেক্সট ট্রেন ধরতে চাই।'

ফাদার বলেছিলেন, 'কোথায় যাবে তুমি? তোমার মনের অবস্থা আমি জানি।'

সে বলেছিল, 'জানেন না ফাদার। আমিও জানি না। আমি ভেবে দেখব। লেট মি থিঙ্ক ফাদার।'

'—My Son—'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমি কথা দিচ্ছি ফাদার—আমি মরব না।'

সে চলে এসেছিল।

* * *

সেই রিনা ব্রাউন। যে এর পর বুকে ঝুলিয়ে নেবে ক্রশ আর যার একমাত্র পাঠ্য হবে হোলি বাইবেল, ভেবেছিল কৃষ্ণেন্দু। যে রিনা ব্রাউন সারা জীবন অবিবাহিত থাকবে ভেবেছিল, সেই রিনা ব্রাউন। সে উন্মাদিনীর মতো মদ আর ব্যভিচারে নিজেকে ভাগিয়ে দিয়েছে। আমেরিকান অফিসারের জীবনের সাধ-মিটিয়ে নেওয়া উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভেসে বেড়াচ্ছে। স্মৃতিও বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে।

ওথেলোর কথাও তার মন থেকে মুছে গেছে। বললেও মনে পড়ে না, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে, অন্তরের অন্তস্থল থেকে সহ্য করতে না পারায় ইঙ্গিত ফুটে ওঠে তিক্ত দৃষ্টির মধ্যে।

আর কৃষ্ণেন্দু? সে কৃষ্ণস্বামী হয়ে এই অরণ্য অঞ্চলে রোগীর চিকিৎসা এবং কুষ্ঠরোগীর সেবায় মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে, রিনা বলেছিল, 'বিশেষ ধর্মকে অতিক্রম করে মানুষ নির্বিশেষে মানবধর্মে পৌঁছেছে। মানুষ একজনের জন্য নয়, একটি নারীকে বা একটি পুরুষকে পাবার জন্য নয়, সকল মানুষকে আপনার বলে পাবার জন্য।'

শুধু রেভারেণ্ড কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত সে নয়। সে ক্রিশ্চান, সে ভারতীয় সন্ন্যাসী। সে রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী। যে ঈশ্বরকে উপেক্ষা করার জন্য রিনা তাকে ভয় করেছিল, সে ঈশ্বরকে তাকে পেতে হবে। তাকে খুঁজেছে। তার সন্ধান সে পেয়েছে।

মানুষের বস্তুময় দেহের মধ্যে তাঁকে সে তপস্যারত দেখেছে।

চিদ্‌বিভ্রান্তিকর মহাসত্তা। বিরাট মহাসত্তায় উপনীত হবে মানুষ। শুধু

পবিত্র মমতায় কোমল, সত্যে নির্মল, প্রেমে পরিশুদ্ধ অহিংস। এই যুদ্ধের মধ্যেও সে তপস্যাকে ডুবিয়ে নিঃশেষ করতে পারে নি। তামসীর মতো সে তাকে গ্রাস করতে গিয়েও পারছে না।

বিচিত্র বিস্ময় এই যে, তাকে সেই ঈশ্বরসন্ধানী দেখেই সেই রিনা আজ ভয় পেল; সঙ্কুচিত হয়ে গেল, হিংস্র হয়ে উঠল মানুষ দেখে সরীসৃপের মতো।

আশ্চর্য, সেই নির্মল আলোকসন্ধানী রিনা, আজ ওই যুদ্ধের মধ্যে যে উন্মাদিনী তামসী নিজেকে প্রকট করেছে, সে গ্রাস করতে চায় সমস্ত তপস্যাকে, হত্যা করতে চায় ঈশ্বরকে, সেই তামসীর সে ক্রীতদাসী, ক্রীড়াসঙ্গিনী, প্রেতিনী। হয়তো বা তারই প্রতীক। হে ভগবান! ওহ্ গড।

রিনা—হঠাৎ জীপের গর্জনে তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল! জীপ! তিনি ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। জীপের সঙ্গে রিনার অস্তিত্ব যেন মনের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে মেঘগর্জনের মতো। তিনি উঠে পড়লেন। হঠাৎ নজরে পড়ল জোড়া-বাংলো মন্দিরের মাথায় মিলিটারী-পোশাক-পরা কারা ঘুরছে, দেখছে বাইনোকুলার দিয়ে। প্রমোদভ্রমণ আর উল্লাস, উচ্ছৃঙ্খলতা আর উন্মত্ততা। তামসী রিনা সঙ্গে আছে। নিশ্চয়। ভয়ার্তের মতো কৃষ্ণস্বামী উঠলেন। পাকা রাস্তায় নয়। মাঠে মাঠে এসে বনের পথ ধরে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

—রিনা তার ঈশ্বরকে তাকে দিয়ে নিজের জীবনে নিঃস্ব হয়ে গেল কি—তার অবিশ্বাস—তার রিক্ততার তিক্ততায় হাহাকারে—ভয়ঙ্করতায়?

॥ ছয় ॥

বনের ভিতর দিয়ে চলেছিলেন কৃষ্ণস্বামী। দ্রুতপদেই চলেছিলেন। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। প্রায় সাতটা বাজে। রোগীরা এসে বসে আছে। অসুস্থ মানুষ। তার ভগবান। ব্লেসেড্ আর দি পুওর ইন স্পিরিট: ফর দেয়ার্স ইজ দি কিংডম্ অফ হেভেন্। তারাই ভক্ত। 'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ'—ভক্তের হৃদয়ে আমি বাস করি। ওরা অশিক্ষার মধ্যে ভগবানকে ভক্তি করে। অন্ধকারের মধ্যে বাস করেও ওরা আলো চায়। ওরা জীবনের আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে না। আলোর অভাবেই আলো বলে কাঁদে। ওদের মধ্যে ঈশ্বরের তপস্যা আছে।

বনে কোনো ফুল ফুটেছে। গন্ধ উঠেছে। পাখিরা কলকল করছে। সূর্য

আজ মেঘের আড়ালে ঢাকা। বনভূমি বর্ষণের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে। প্রতিটি পাতার মধ্যে কৃষ্ণস্বামী অনুভব করছেন উদ্ভিদ-প্রাণের ব্যাকুল প্রত্যাশা।

'হ্যালো, ডু ঈ হিয়ার? হ্যালো?

চমকে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী। নারী-কণ্ঠস্বর, রিনা ব্রাউনের গলা। এই বনের মধ্যে? এই সকালে? এদিক ওদিক তাকিয়ে কৃষ্ণস্বামী দেখলেন রিনা ব্রাউন বনের ভিতরে এক টুকরা ফাঁকা জায়গায় একটা একক বড়ো শালের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। পাশে একটা ফ্লাস্ক; হাতে সিগারেট। সেই পোশাক।

কৃষ্ণস্বামী শুধু বললেন, 'ইয়েস্?'

'কাম হিয়ার. সিট ডাউন। হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক, এ স্মোক?'

'আই ডোণ্ট ড্রিঙ্ক, ডোণ্ট স্মোক। থ্যাঙ্ক ইউ।'

এবার চিৎকাব করে উঠল বিনা, 'কৃষ্ণেন্দু!

হেসে কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'আমাব রোগা বসে আছে রিনা—আমি যাই। আমাকে ক্ষমা করো।' তারপর আবার বললেন, 'তুমি চিনেছ বিনা। কাল ভেবেছিলাম তোমার স্মৃতিও ভ্রংশ হয়ে গেছে।'

'গেছে। অনেক গেছে। কিন্তু ওথেলো ভুলি নি। 'লেট মী লুক্ অ্যাট ইয়োর আইজ লুক ইন মাই ফেস্' বলে আমার দিকে যখনই তাকালে, তোমাব দৃষ্টি আমি তখনই চিনলাম। কিন্তু—।'

সিগাবেট টানতে লাগল বিনা। অতিবিক্ত মদ্যপানের ফলে ওর হাতের আঙুল কাঁপছে।

'আমি যাই রিনা।'

'তুমি এখানে কী করছ? এ কী পোশাক? এ কী চেহারা?'

'আমি ক্রিশ্চান হয়েছিলাম তুমি জান। তারপর হয়েছি সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের ক্রিশ্চান সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসীতে যা করে তাই করছি। ঈশ্বরকে খুঁজছি। অবশ্য মানুষের সেবাব মধ্যে। আমি ডাক্তার, ওদের চিকিৎসা করি। কিন্তু মূল চিকিৎসা,—কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা।'

রিনার হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রিনা বললে, 'জীবনটাকে নষ্ট করলে কৃষ্ণেন্দু। আই অ্যাম্ দি কজ্ আই অ্যাম্ দি কজ্—'

'না। জীবন আমার নষ্ট হয় নি। তুমি আমাকে যা বলেছিলে, তা মিথ্যা বল নি। পৃথিবীতে ঈশ্বরের চেয়ে বড় কিছু নেই।'

'আমি বলেছিলাম তোমাকে? হ্যাঁ আমি বলেছিলাম। আই অ্যাম্ দি কজ।'

'আমি যাই। গুড বাই।'

'দাঁড়াও। আকি আবার বলছি—আমি ভুল বলেছিলাম। এ পথ তুমি ছাড়।'

'না। আমি যাই। গুড বাই!'

'আর এক মিনিট। আমার কথা জিজ্ঞাসা করবে না?'

'না। তোমার কথা তোমার রূপের মধ্যেই প্রকাশ, রিনা। কী জিজ্ঞাসা কবব?'

'আবার বলছি ঈশ্বর নেই কৃষ্ণেন্দু। আমি তোমাকে ভুল বলেছিলাম। দুঃখ দিয়েছিলাম। ঈশ্বর নেই।'

উঠে দাঁড়াল রিনা ব্রাউন। তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—'শোন আমার কথা। আমি বলছি, ঈশ্বব নেই। নাথিং ইজ সিন—পাপ নেই, পুণ্য নেই, ঈশ্বর নেই।'

কণ্ঠস্বব তাব তীব্রতর হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে কৃষ্ণস্বামীর পথরোধ করে দাঁড়াল।

'তুমি এ-সব ছাড়ো কৃষ্ণেন্দু। জীবনকে নষ্ট কোরো না। ফিরে যাও। নতুন জীবন আরম্ভ করো।'

'তোমার সঙ্গে?

হি-হি করে হেসে উঠল রিনা ব্রাউন। তীব্র তীক্ষ্ণ বীভৎস হাসি। হাসি থামিয়ে বললে 'আমাব এখন দাম অনেক কৃষ্ণেন্দু। তোমার দাম আমার কাছে সেদিনেব চেয়ে অনেক কম! সেদিন ভয় করে বলেছিলাম। আজ করুণা হচ্ছে। হার্মলেস, ডোসাইল, ওয়ার্থলেস, ঈশ্বরবিশ্বাসী সন্ন্যাসী তুমি, নির্বোধ তুমি, মূর্খ তুমি, আমার ঘৃণার পাত্রও নও, করুণার পাত্র।'

কৃষ্ণস্বামী আর কথা বললেন না, এগিয়ে চললেন।

পিছন থেকে রূঢ় চিৎকার করে উঠল রিনা ব্রাউন, 'শোন। আমার কথা শোনো। ইউ মাস্ট লীভ দিস প্লেস। এখানে থাকতে তুমি পাবে না। চলে যাও। অনেক দূরে।'

কৃষ্ণস্বামী ঘুরে দাঁড়ালেন।

রিনার এমন তীব্র উগ্র মূর্তি তিনি কখনও দেখেন নি। তার দীর্ঘ ঘন কালো নেত্ররোমের স্বপ্নালু বেষ্টনীর মধ্যে আয়ত কালো চোখ যে এমন জ্বলন্ত হয়ে উঠতে পারে, তা তাঁর কল্পনাতীত। চোখ দুটো তার জ্বলছে। ধক-ধক করছে।

রিনা বললে, 'তোমার ওই বাংলোটা আমার চাই। আমি এখানে থাকব। অনেক দিন থাকব। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারব না। তোমাকে

এ-অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হবে। ইউ মাস্ট। না হলে আমি ওদের লেলিয়ে দেব! ওরা তোমাকে, ওরা কেন, আমিই তোমাকে গুলি করে মারব।'

কৃষ্ণস্বামী কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে আবার চলতে শুরু করলেন। আর পিছন ফিরলেন না। ভীত তিনি হলেন। নিজের জন্য নয়। ওই ঝুমকির জন্য। সিন্ধুর জন্যও বটে।

রিনা ব্রাউন প্রেতনীব মতো গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ফুলছে। হয়তো ফ্লাস্ক খুলে মদ খাচ্ছে। অনুমান করতে এতটুকু বিলম্ব হল না তাঁর।

* * *

ঠিক করলেন, ঝুমকি আব সিন্ধু গ্রামেব ভিতরে গিয়ে থাকবে। লাল সিং ওদের আগলাবে। সেও যাবে। তিনি থাকবেন একা।

তাঁর ভয় নেই। ভয় কৃষ্ণেন্দুর কোনো কালে ছিল না। কৃষ্ণস্বামী হয়ে তিনি ঈশ্বর খুঁজে বেডাচ্ছেন, তিনি মৃত্যুকে ভয় কববেন কেন। আসুক মৃত্যু। অন্যায়কে প্রতিবোধ করে তিনি মববেন। প্রেতিনী রিনা ব্রাউনের ভয়ে তিনি পালাবেন?

রাত্রি তখন নটা। তিনি বসে ছিলেন। প্রতিটি জীপের বা মোটরের শব্দে একটু সজাগ হয়ে উঠছিলেন। মধ্যে মধ্যে এক-একটা দীর্ঘ নিস্তব্ধতার মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন। আকাশ বর্ষার মেঘে ভরেছে। আজ, হয়তো আজই বর্ষা নামবে। দিগন্তে মৃত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তিনি ও-কথা ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন নিষ্কলুষ পবিত্রতার প্রতিমূর্তি রিনার কথা। প্রেতিনী রিনা ব্রাউনের কথা। প্রেতিনী নয়, সাক্ষাৎ তামসী আজ রিনা ব্রাউন।

রাত্রি তামসী নয়। রাত্রির অন্ধকারে জীবনের মধ্য থেকেই তামসী বেরিয়ে আসে। বস্তু-জগতে, স্থান-জগতে ক্ষোভের কারণ না থাকলে, অনিয়ম না ঘটলে সে জাগে না। ক্ষোভ মিটলেই সে শান্ত হয় স্থিত হয়। জীবনেব মধ্যেই সে সদাজাগ্রত, চেতনার মধ্যে অহরহ সে সক্রিয়। সুপ্তির মধ্যে সে দুঃস্বপ্ন, অবসর-বিশ্রামের মধ্যে সে কুটিল কল্পনা। শান্তির পথে, সুখের পথে চৈতন্যের পথে মানুষকে এগুতে সে দেবে না। নিষ্ঠুর আক্রোশে পিছন থেকে অজগরের মতো আকর্ষণ করছে। গ্রাস করতে চাইছে। একবার জড়িয়ে ধরতে পারলে গ্রাস না করে ক্ষান্ত হবে না।

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তন্দ্রা এসেছিল কৃষ্ণস্বামীর। টর্চের আলোয় তন্দ্রা ছুটে গেল। তিনি উঠে বসলেন।

'কে ?'

দূর-দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সেই ক্ষণিক আলোতেই দেখলেন, হ্যাঁ, সেই বটে। দীর্ঘাঙ্গী নারীমূর্তি এগিয়ে আসছে। একটু একটু টলছে। রিনা ব্রাউন উত্তর দিল, 'আমি। তুমি আমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছ দেখছি!'

'আমি। শুধু তোমার নয়, তোমার সঙ্গে আরও লোকের প্রতীক্ষা করছিলাম। যারা ভয়ঙ্করী লোলুপ ভয়ঙ্কর। যারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলবে। আমি বুঝতে পেরেছি, এ বাড়িতে যত প্রয়োজন তোমার না থাক, আমাকে তাড়ানো তার চেয়ে তোমার বেশী প্রয়োজন। তুমি স্বস্তি পাচ্ছ না। কিন্তু কেন ?'

একখানা চেয়ারে বসে রিনা বললে, 'ইউ মাস্ট গো অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার। তোমাকে যেতে হবে।'

'নো। আই মাস্ট নট গো। ঈশ্বরের সাধনায় আমি এখানে শপথ নিয়ে এসেছি। এ আমার সাধনার আসন।'

'স্টপ।' চিৎকার করে উঠল রিনা। আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে সে বললে, সব মিথ্যে। ঈশ্বর নেই। কোনোদিন ছিল কি না জানি না। থাকলে সে মৃত। মানুষ তাকে মেরে ফেলেছে। আমার দিকে দেখো। আমি তার সমাধি। আমার বাবা সভ্য ইংরেজ ধর্মবিশ্বাসী ক্রিশ্চান—তাকে মেরে আমার মধ্যে সমাধি দিয়েছে। আমি তোমাকে বলছি। যা মৃত তা বাঁচে না। ঈশ্বর-বিশ্বাসের গলিত শবটা ছেড়ে দাও। চলে যাও এখান থেকে।'

'তুমি আজ যা-ই হয়ে থাক রিনা, তুমি ক্রিশ্চান।'

'না, না, না। আমি ক্রিশ্চান নই। এতক্ষণ শুনলে কি ?'

'রিনা।'

'কোনোদিন ছিলাম না। আমার ক্রস, আমার বাইবেল, আমি ফেলে দিয়েছি। কোনোদিন আমি ব্যাপটাইজড্ হই নি। দীক্ষা আমার বাবা নিতে দেয় নি। কোনো ধর্মই আমার নেই। বাবা জেমস ব্রাউন ইংরেজ, ধর্মে ক্রিশ্চান, অত্যাচারী জমিদার। আমার মা ছিলেন, হিন্দুদের মধ্যেও বন্য অস্পৃশ্য জাতের মেয়ে। লালসা চরিতার্থ করবার জন্য বাবা তাকে উপপত্নী হিসেবে রেখেছিল, তাকে কিনেছিল। আমি তাদের জারজ সন্তান। কৃষ্ণেন্দু, সেই আয়া, সেই কুন্তী আমার মা!'

বিদ্যুৎচমকের মেঘগর্জনটা ঠিক এই মুহূর্তেই ধ্বনিত [illegible] রিনার কথার প্রতিধ্বনির মতো। কৃষ্ণেন্দু বজ্রাহতের মতোই স্তম্ভিত [illegible] গেল। কোনো কথা, একটা বিস্ময়সূচক মর্মান্তিক ধ্বনিও বের হল না। [illegible] না হেসে উঠল।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে কাঁধে-ঝোলানো ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা মদ খেয়ে বললে, 'আরও শুনবে? আরও অনেক আছে। আমার ওই মা কুন্তী, সে হল, মেদিনীপুরে যেখানে ব্রাউনের জমিদারি ছিল, সেখানকার জঙ্গল-মহলের পুরনো এক ছত্রী ইজারাদারের রক্ষিতা এমনি এক বুনো মেয়ের গর্ভজাত মেয়ে। ইজারাদারের রক্ষিতা ছিল এক ব্রাহ্মণের ব্যাভিচারের ফল। আরও শুনবে? কালো মেয়েদের রক্তের সঙ্গে অনেক ফরসা রঙের মিল হয়েছিল শেষ সাদা ইংরেজের রঙ। সবটা প্রকাশ পেল আমার মধ্যে। কালো চুল, বড়ো বড়ো চোখের পাতা, সাদা রঙ। রঙ-রূপ আমার যাই হোক, আমার কি কোনো ধর্ম আছে, আমার কি কোনো ঈশ্বর আছে। ঈশ্বরের ধর্মের আমি জীবন্ত সমাধি। মৃত ঈশ্বর আমার মধ্যে পচছে। গন্ধ উঠছে।'

রিনা স্তব্ধ হয়ে গেল অকস্মাৎ। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

কৃষ্ণস্বামীর মনে হল চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে এসেছে। তিনি বললেন, 'তুমি কাঁদছ।'

'কাঁদছি? লুক'—সে টর্চটা জেলে নিজের মুখের উপর ধরলে। না, রিনা কাঁদে নি। চোখ দুটি তার নেশায় আরক্ত, দৃষ্টি তার অসহনীয় তীব্র।

'চোখের জল আমার অনেক দিন শুকিয়ে গেছে। মরুভূমি হয়ে গেছে। অনেক কেঁদে জল শেষ হয়ে গেছে।'

ধীরে ধীরে রিনা বললে, 'সব তোমার জন্যে কৃষ্ণেন্দু, ইউ আর দি কজ, ইউ আর দি কজ, আজ তোমার নাম স্পষ্ট উচ্চারণ করেই বলছি, ইউ আর দি কজ।' একটু হাসলে রিনা। বোধ করি ওথেলোর এই দৃশ্যটির অভিনয়ের সুখস্মৃতি খানিকটা মাধুর্যের সঞ্চার করলে ক্ষণিকের জন্য।

'তোমার মতো ভালোবাসার জনকে ফিরিয়ে দিলাম, তুমি ঈশ্বরকে, ধর্মকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস কর না বলে। কাল তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি ভাবছি, আমার নিজেকে না দিয়ে সেদিন আমার ঈশ্বর, আমার ধর্ম সব বোধহয় তোমাকে দিয়েছিলাম। তুমি সব কেড়ে নিয়ে এসেছিলে আমার অজ্ঞাতসারে।'

আবার একটু স্তব্ধ থেকে বললে, 'আসানসোল থেকে ফিরে এলাম। ঈশ্বর এবং ধর্মকে আমি এত ভালোবাসতাম কৃষ্ণেন্দু যে অন্তর হাহাকার করলেও আমি কাঁদি নি। সংকল্প করেছিলাম সারাজীবন 'নান' হয়ে কাটিয়ে দেব। ব্রাউন সাহেব—তাকে বাবা বলতে আমার ঘৃণা হয় কৃষ্ণেন্দু—সে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলে; 'সে কই?' আমি তাকে বললাম, 'আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।' সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন? সে ক্রিশ্চান হয়েছে, তুমি জান না? সে তোমাকে বলে নি?' বললাম, 'বলেছে'। জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে'?'

আমি তোমাকে যা বলেছিলাম, সব বললাম। কৃষ্ণেন্দু, এক মুহূর্তে তার মুখোশ খুলে গেল। চিৎকার করে উঠল, 'বাস্টার্ড—বিচ।' তারপর অনর্গল কুৎসিত, অশ্লীল গালাগাল। বললে, 'ক্রিশ্চান? তুই ক্রিশ্চান? ডু ইউ নো, হিদেন ওই কুন্তী, হিদেনেদের চেয়েও ঘৃণিত ও। ওরা পর পর তিন জেনারেশন বাস্টার্ড, ওই তোর মা।' বলল, 'জীবনের মুহূর্তের দুর্বলতা আমাকে এত বড় ভুল করালে। তোর সাদা রঙ দেখে আমি ভুলে গেলাম। তোকে বাঁচিয়ে রাখলাম।'

একটা সিগারেট ধরালে রিনা। তারপর আবার কথা বলতে গিয়েই থমকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ইট্‌স্ রেনিং। বৃষ্টি এল।' হেসে বললে. 'কুন্তী-মা আমায় বলত, জল আইচে গ।'

কয়েকটা বড়ো বড়ো ফোঁটা কৃষ্ণস্বামীর কপালে হাত এসে পড়ল। দূরান্তরে সোঁ-সোঁ শব্দ উঠছে। আসছে বর্ষার বর্ষণ। মৃদুমন্দ নৈঋত হাওয়া বইছে।

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'ভিতরে চলো রিনা।'

'ঘরের ভিতরে? চলো। কিন্তু তাতেই বা কী দরকার। আমি চলে যাই। শুধু বলে যাই, তোমাকে বলেছি, আবার বলছি, এখান থেকে তোমাকে সরে যেতে হবে। আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। ইউ মাস্ট।'

'সে হবে রিনা। কিন্তু এই বৃষ্টিতে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যাবে?'

'ভিজতে ভিজতে চলে যাব। দুর্যোগ আমি ভালোবাসি কৃষ্ণেন্দু। আগে ঝড়-জল এলে ভয় করতাম। এখন আনন্দ পাই। আই ফিয়ার নো ডার্কনেস, আই ফিয়ার নো স্টর্ম, আই ফিয়ার নো থাণ্ডার, লেট মী গো। বাট ইউ মাস্ট লীভ দি প্লেস।'

'না। বোসো।'

ঘরের মধ্যে এসে স্তিমিত লণ্ঠনটি উজ্জ্বল করে দিলেন কৃষ্ণস্বামী।

'নো।' বলে রিনা এসে আলোটাকে কমিয়ে, নিভিয়ে দিল। পলতেটা পড়ে গেল। 'অন্ধকার—অন্ধকার ভালো। জান ব্রাউনের কাছে সব কথা শুনে তিনদিন আমি অন্ধকারে পড়ে পড়ে কেঁদেছিলাম। দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আলো জ্বালি নি। নিজের দিকে চেয়ে দেখতে ভয় হত আমার। আমার সঙ্গে সমানে কাঁদত আমার মা। কুন্তী ব্রাউনকে আমি ঘৃণা করি। কুন্তীকে ঘৃণা করতে পারি না। হতভাগিনী। ব্রাউনের ভয়ে ভয়ার্ত মূক জন্তুর মতো সারাজীবন আমার আয়া হয়ে থেকেছে, কোনোদিন আমাকে মেয়ে বলে একবিন্দু স্নেহ শ্রদ্ধা আমার কাছে চাইতে পারে নি। অন্ধকারে দুজনে কাঁদতাম। নিজের কলঙ্কের ভয়ে—আমার মাতৃপরিচয়ের

অমর্যাদা পাছে তাকে স্পর্শ করে, আমাকে স্পর্শ করে, তার লজ্জায়—সে আমাকে ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষিতও করে নি। আমাকে নার্সারিতে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মায়ের তখনও রূপ-যৌবন ছিল। সে-রূপে নাকি এক বন্য মোহ ছিল। সে মোহ আশ্চর্য। আমার চুলে চোখে চোখের পাতায় তার পরিচয় আছে। তাকেও সে তাড়ায় না। তাকে সে কিনেছিল। ভোগ করত, বর্বরের মতো। ক্রিস্টান। ক্রায়েস্ট। সন অব গড! তিনি ছিলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। রোমান ইম্পিরিয়লিস্টরা মেরেছিল তাঁকে। লোকের বিশ্বাস, তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন। হয়ে থাকলেও ইম্পিরিয়-লিস্টরা যে এখনও মরে নি। তাঁরা যে তাঁকে ক্রুশে নিত্য বিঁধে মারছে। প্রতিদিন তিনি ক্রুশ বিদ্ধ হচ্ছেন!'

হাসলে রিনা। হেসে বললে, 'এরা কিন্তু একটা জায়গায় মহৎ। ক্রেটন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই খাঁটি ইংরেজ জমিদার তার আভিজাত্য বজায় রেখে আমার সব বৃত্তান্ত তাকে জানিয়েছি। ক্রেটনের বাবা ধন্যবাদ জানিয়েছিল ব্রাউনকে। তুমি হিদেন বলে সত্য বলার প্রয়োজন মনে করে নি। আমি ক্রিশ্চান নই, তবু তোমাকে ক্রিশ্চান, ধর্মে দীক্ষিত না করে আমার সঙ্গে বিয়েতে মত দেয় নি। আমি হিদেনের গর্ভজাত মেয়ে, আমাকে বাইবেল আর ক্রশ দিয়েছিল খেলার ছলে। তার কোনো মূল্য নেই। ঈশ্বর ধর্ম কোনো কিছুর উপর আমার কোনো অধিকার নেই। ঈশ্বর মূক, কোনো ভাষা নেই তাঁর, তিনি প্রতিবাদ করেন নি, ধর্মের ঘরের তালা রীতির কোড়ে মেলে নি বলে খোলে নি। আমি সামনে পেয়েছি নরকের সিংহদ্বার খোলা—তার মধ্যে ঢুকেছি।' সে সিগারেট ধরাল।

বাইরে তখন প্রবল বর্ষণ নেমেছে। চারিপাশের সুদীর্ঘ বিশাল শালবনের পল্লবে ধারাপতনের শব্দে শব্দময় মেঘমল্লার বেজে বেজে উঠেছে। বিচিত্র ঝর-ঝর এক সঙ্গীত। পৃথিবীর অন্য সব শব্দ ডুবে গিয়েছে। এমন কি, জীপ কি মোটরের শব্দও ভালো শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ রিনা উঠে দাঁড়াল। একটা জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বললে, 'কী সুন্দর রাত্রি! মনে হচ্ছে, বিশ্বজগতে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই।'

কৃষ্ণস্বামী স্তব্ধ হয়ে রিনার কাহিনী শুনে সেই স্তব্ধ হয়েই বসেছিলেন। বেদনায় করুণায় তাঁর অন্তর মুহ্যমান হয়ে গেছে। বাইরের ওই সজল বাতাসের প্রবাহের মতো হায়-হায় করে সারা হয়ে গেল। এমনি করেই কাঁদছে। হে ভগবান, তুমি ওর অন্তরে পুনরুজ্জীবিত হও। ওর অন্তরের কবরখানা বিদীর্ণ

করে জেগে ওঠো। তোমার স্পর্শে কুষ্ঠরোগীর নিরাময় হওয়ার মতোই কঠিন আঘাতে বিকৃত ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরকে সুস্থ করে তোলে। সুন্দর রিনা, এখনও সুন্দর। এখনও সেই মাধুরী তার সর্বাঙ্গে, এখনও তার দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ পক্ষঘেরা আয়ত কালো চোখ দুটি মানস সরোবরের মতো স্বচ্ছ গভীর। আকাশের প্রতিবিম্বে এখনও সে নীলাভা প্রতিফলনের শক্তি হারায় নি। মেঘ তুমি কাটিয়ে দাও, অপসারিত করো। হে ঈশ্বর! নরকের মুখে উন্মাদ যাত্রীকে তুমি ডাকো। ফিরে আয়—বলে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'রিনা ঈশ্বরের সমাধি বার বার রচনা করবার চেষ্টা করেছে ঈশ্বরের বিপরীত শক্তি। আলো আর কালো। ভালো আর মন্দ। কিন্তু বার বার মন্দ হেরেছে, ভালো জিতেছে। ঈশ্বর সে-সমাধি বিদীর্ণ করে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন। হায় রিনা, অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ, অনেক বেদনা। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তখন দূরে চলে গেছি। আমি জানলে এ দুঃখ তোমাকে পেতে দিতাম না। বলতাম— জীবন, সে ঈশ্বরের অংশ। সৃষ্টির মধ্যে মানুষের জীবনেই ভগবান কথা কন, হাসেন. কাঁদেন, ভালোবাসেন, নিজেকে নিজে বলি দেন, বিশ্বের কাছে বিলিয়ে দেন, মানুষের মধ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ। মানুষের মধ্যে জীবন, সে যেখান থেকেই অদ্ভুত হোক, সে সমান পবিত্র। ব্রাহ্মণ নেই, চণ্ডাল নেই, ক্রিশ্চান নেই, হিদেন নেই, ধনী নেই, দরিদ্র নেই। গোত্র কুল ইতিহাস পরিচয় থাক না-থাক, মানুষ সমান পবিত্র, তার মধ্যে ঈশ্বর সমান মহিমায় আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল। তোমাকে নিয়ে আমি মহা আনন্দে এই তপস্যা করতাম।'

পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'যে-ঈশ্বরকে তুমি সমাধিস্থ করেছ বলছ, তিনি আবার উঠবেন। তুমি শান্ত হও।'

'ডোণ্ট টাচ মী প্লীজ। ডোণ্ট। ডোণ্ট, কৃষ্ণেন্দু! আমাকে স্পর্শ করো না।' চিৎকার করে উঠল রিনা। সে যেন আর্তনাদ।

'পীস্ অ্যাণ্ড বী স্টীল্, রিনা।' ওথেলো মনে পড়িয়ে দিয়ে তার অন্তরে স্বপ্নাবেশের স্নিগ্ধতা সঞ্চারের চেষ্টা করলেন কৃষ্ণস্বামী।

কিন্তু রিনা অধীর কণ্ঠে বললে, 'শান্তি আমার নেই। স্থির আমি হতে পারব না, কৃষ্ণেন্দু। তুমি জানো না। ও-সবের কোনো কিছুতেই আমার অধিকার নেই। আমার ব্যাভিচারী জন্মদাতা ব্রাউন আমাকে বলেছিল— আমার ধর্মে অধিকার নেই—ঈশ্বরে অধিকার নেই—পবিত্রতায় অধিকার নেই। যেমন করে ওরা সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে জবরদস্তি করছে—তোমাদের কোন অধিকার নেই—আর তাদের থাকছে না—হারাচ্ছে! তারাও বিশ্বাস করছে। আমার

তাই হয়েছিল—আমার অধিকার নেই বলে নিজেই ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলাম নরককুণ্ডে। সেখানে পাঁকের মধ্যে ফুলের মতো আমি পচতে লাগলাম—আজ আমার ভেতরটা নিঃশেষে পচে গেছে। শয়তান আমাকে অধিকার করেছে। আমি অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু পবিত্রতার কথা আর ভাবতেই আমি পারি না। দুর্দান্ত ক্রোধে অন্তর আমার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, প্রচণ্ড আক্ষেপ জেগে ওঠে শরীরে। আমি কাঁদতে পারি না। আমি ব্রাউনের উপর রাগে আক্রোশে বেরিয়ে এসেছিলাম, ফেলে দিয়েছিলাম বাইবেল; পাছে তোমার সঙ্গে দেখা হয় এই ভয়ে লুকিয়ে ছিলাম জঘন্য পল্লীতে। সঙ্গে আমার মা। সে এই রাত্রির মতো। অন্ধকার মূক। পাপ কর, পুণ্য কর, কোনো কিছুতে প্রতিবাদ নেই, শাসন নেই, বরং নীরব প্রশ্রয় আছে; কালো কাপড়ের কালো সর্বাঙ্গে ঘের দিয়ে ঢেকে রাখে, প্রকাশ হতে দেয় না। জীবন আরম্ভ করলাম রিপন স্ট্রিট অঞ্চলে। নাইট ডেনের জীবন। ফিটনের কোচম্যান, ডেনের বয়েরা যার পরিচালক। সেখান থেকে হোটেলে গিয়ে পড়লাম। হোটেল থেকে এই যুদ্ধের মধ্যে দেহ বিক্রি করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শয়তান বেঁধে রেখেছে আমাকে। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'রিনা?' শিউরে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী।

'না। দোষ কাউকে দেব না। সব আমার জন্মফল। আমার জন্ম থেকেই পঙ্ককুণ্ড কৃষ্ণেন্দু, সেখানে তুমি পাঁকের কবর চাপা পড়েছ, ঈশ্বর পড়েছে, ঈশ্বরের পুত্র পড়েছে, ব্রাউন সাহেব দিয়েছে চাপা।'

'রিনা।' হাতখানি টেনে নিলেন কৃষ্ণস্বামী।

'আমাকে চাও তুমি? প্রেম নেই। দেহ দিতে পারি আমি। প্রাণ নেই। মন নেই।, মনও গেছে। প্রেমও নেই। চাও তুমি প্রাণহীন, মনহীন শুধু কোমল মাংসপিণ্ডের এই দেহ?'

হাত ছেড়ে দিলেন কৃষ্ণস্বামী। বললেন, 'ভগবান তোমাকে দয়া করুন—

'নো! নো! নো! ও নাম কোরো না।'

'মৃতকে তোমার ভয় কি?'

'ভয় নয়, ঘৃণা। শোনো কৃষ্ণেন্দু, তুমি এখানে থাকতে আমি স্বস্তি পাব না। তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে, তুমি যাও। কৃষ্ণেন্দু। না হলে হয়তো আমি তোমাকে গুলি করে মারব। কিংবা ওরা মারবে। ওরা যদি জানতে পারে—তোমার জন্যে আমি চলে যাব, তা হলে ওরা ক্ষমা করবে না।'

কৃষ্ণস্বামী অন্ধকারের মধ্যেই যেখানে দেওয়ালের ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটি মূর্তি টাঙানো ছিল সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন: হে অবিনশ্বর! নিজেকে প্রকাশ করো তুমি।

'কৃষ্ণেন্দু, তুমি যাবে কি না বলো।'

'না।'

'না ?'

'না।'

'অন্যত্র গিয়ে তুমি আমার কাজ করো। আমাকে উত্যক্ত কোরো না তুমি।'

'না।'

'কেন ? কিসের জন্য ? আমার জন্য ? আমার দেহ চাও ?'

অত্যন্ত স্থির সঞ্চালনে ঘাড় নাড়লেন কৃষ্ণস্বামী। বললেন, 'না। তোমার দেহ নিয়ে কী করব ? আমি চাই তোমার আত্মাকে। তোমার মনকে। দেহ মরে যায় পচে যায়। আত্মা অমর। যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।' সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিলেন, 'কী হবে ওকে ? আমি তোমার আসল তোমাকে চাই। তোমার চিরন্তন তোমাকে। ইহকালের পরকালের তোমাকে।'

'সে নেই। পাবে না। তবে কেন ? কিসের জন্য থাকতে চাও এখানে ? কিসের জন্য ? মরবে ?' চিৎকার করে উঠল রিনা।

'মরব।' শান্ত কণ্ঠে কৃষ্ণস্বামী বললেন—'দ্যাট উইল বি মাই ক্রুশিফিকেশন। আই এ্যাম হিয়ার টু বি ক্রুশিফায়েড এগেন।'

বলতে বলতেই রিনার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে তিনি জ্বালালেন। ছটাটা গিয়ে পড়ল ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির উপর।

পর-মুহূর্তেই রিনা ক্ষীপ্রবেগে কী টেনে বের করলে। পিস্তল। পিস্তলটা তুলে গুলি করলে। মূর্তিটা ভেঙে পড়ে গেল। কৃষ্ণস্বামী চিৎকার করে উঠলেন—'রিনা।'

রিনা বেরিয়ে চলে গেল কক্ষচ্যুত উল্কার মত। এতক্ষ · সচেতন হলেন কৃষ্ণস্বামী। দ্রুত বেরিয়ে এলেন—ডাকলেন—'রিনা। রিনা! রিনা!'

'নো! নো! নো!' উত্তর ভেসে এল দূর থেকে—'নো।'

* * *

সেই অন্ধকার বর্ষণমুখর রাত্রিতে তিনি পথের ধারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ধারণা হল—রিনা নিশ্চয় ফিরবে! কিন্তু রিনা ফিরল না।

পরদিন তিনি গেলেন পিয়ারা-ডোবা। রিনা ব্রাউন কোথায় ? কোন খোঁজ মিলল না। বনের ভিতরটা তিনি খুঁজলেন। রিনার মৃতদেহ মিলল না। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলেন—মরেছে সে ? উত্তর পেলেন—না। সে মরেনি। নিজে সে মরবে না। না।

সেই থেকে আর রিনাকে দেখা গেল না।

আরও কতদিন কৃষ্ণস্বামী গেলেন পিয়ারা-ডোবা ; কতদিন মোয়ারে রাস্তার তেমাথায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কতদিন রামচণের ফটকে অপ্রয়োজনে বসে রইলেন। কত জীপ গেল। কত বিলাসিনী গেল। কিন্তু রিনা নেই তাদের মধ্যে।

রামচরণ, রামচরণের ছেলে বললে, 'সি মেমটো কোথা গেল বাবাসাহেব ?'

কৃষ্ণস্বামী কী বলবেন ? বলেন, 'কে জানে !'

কে জানে ? সে কোথায় ? কোন দূরান্তরে দূরবিস্তৃত যুদ্ধের সীমানায় রিতা তামসী উল্কার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। অথবা অন্ধকারচারী সরীসৃপের মত। কে জানে ?

॥ সাত ॥

পৃথিবী শুধু জল আর মাটি নয়। সমুদ্র বন পাহাড়—এর মধ্যেই পৃথিবীর সীমানা শেষ নয়। তার একটা উর্ধ্বলোক আছে। আকাশে মাধ্যাকর্ষণ যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ততদূর তার সীমানা। আবার মাটির বুকের ভিতরে অন্ধকার গহ্বরে তার একটা অধোলোক আছে। সেই মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। বিচিত্র ভাবে এই মাটির তলায় যে বীজ ফাটে, সে মাধ্যাকর্ষণ-ধৃত থেকেও উপরের দিকে মাথা ঠেলে ওঠে। গাছের মূল থেকে মাটির নীচে ফুল ফোটে আকাশে! পাখি ডানা মেলে আকাশে ওড়ে। আকাশে উঠে আরও আরও উপরে উঠতে চায়। কিন্তু তার নীড় মাটির বুকে আটকানো গাছের ডালে, সেখানে তাকে নামতে হয়। সরীসৃপ থাকে মাটির বুকেব অন্ধকার গহ্বরে ; তাকে উঠে আসতে হয় মাটির উপরে, বায়ুর জন্য, আহারের জন্য, আলোর জন্য।

কৃষ্ণস্বামীর মন বিহঙ্গের মতো আকাশ-বিহারী। আলো, আরও আলোর জন্য সে ডানা মেলেছে। রিনা ব্রাউনই একদিন সেই পাখা মেলার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল। আশ্চর্য মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের শক্তি, বাবা জেমস ব্রাউনের আঘাতে সেই রিনা ব্রাউন অন্ধকার গহ্বরে সরীসৃপ হয়ে গেল। তার বাল্যজীবনে পুরাণে পড়েছিল একজন রাজা কার অভিশাপে অজগর হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের কাছে গল্প শুনেছিল কাজলহারার। কাজলহারা ঠিক রিনার মতো স্ফটিক-গড়া মেয়ে, তার সতীন তাকে জাদুদণ্ডের প্রহারে সাপিনীতে পরিণত করেছিল। ব্রাউন ঘৃণার অমর্যাদার ওই জাদুদণ্ড দিয়ে আঘাত করে তাকে ঠিক সাপিনীই করে দিয়েছে। রিনা উল্কা নয়, সে সরীসৃপ।

কিন্তু পাখিকেও মাটির বুকে নামতে হয়। সরীসৃপকেও মাটির উপরে আসতে হয়। হঠাৎ দুজনে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাই যেন হয়েছিল। কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে রিনা ব্রাউনের এই জীবনের দেখাটা ঠিক যেন তাই। অন্ধকার রাত্রে সরীসৃপরূপিণী রিনা বিহঙ্গ কৃষ্ণস্বামীর নীড়ে এসে বিষনিশ্বাসে গর্জন করে তাঁকে শাসিয়ে চলে গেল। আর দেখা হল না।

কৃষ্ণস্বামী কয়েকদিন অন্ধকার রাত্রে সরীসৃপের জন্য প্রতীক্ষা করলেন, কিন্তু সে আর এল না। কোথায় কোন দূরে নূতন অন্ধকার বিবরের সন্ধানে চলে গেছে। কৃষ্ণস্বামী পক্ষ বিস্তার করে দিলেন আকাশে। ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে উঠবেন তিনি। রিনা তার পথে গেছে, তিনি তাঁর পথে চলবেন। শুধু মাঝে মাঝে আকাশচারী বিহঙ্গের মাটির দিকে দৃষ্টি ফেরানোর মতো রিনার কথা মনে পড়লে, দিগন্তের দিকে তাকিয়ে, ভগবানের কাছে তার মঙ্গল কামনা করেন। মঙ্গল করো প্রভু। রিনার চিত্তকে সুস্থ করো, শান্ত করো। কুষ্ঠরোগী এসেছিল তোমার কাছে, তুমি তাকে স্পর্শ করেছিলে। সে নবজীবন লাভ করেছিল। তেমনি করে রিনার চিত্তকে সুস্থ করো। বলো, 'বী দাউ ক্লীন।' আবার কিছুক্ষণ পর রিনার চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবি[illegible]দেন। অসময়ে বাইসিক্ল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান।

'কেমন আছ হে তোমরা সব? অাঁ? মহাশয়রা গো?'

'ভা[illegible]লো কোথা বাবাসাহেব? খুদ খেয়ে আর বাঁচে মানুষ, প্যা[illegible]টের ব্যামো ধরে গেল। ছেল্যা মেয়া ছা-ছিঙ্‌ড়ি সব—সব।'

'দেখছি, দেখছি এস. ডি. ও-কে বলে দেখছি।'

'কিবাচিনি তেল আর কাপড়ের কথা বলবা বাবা।'

'বলব। কিন্তুক এখনই কারুকে হাত-টাত দেখতে হবে নাই ত?'

'ছুরুক-ছারুক অসুখ, ই আর কী দেখবেন গো?'

'ওই বাচ্চাটার পিঠে উ দাগটো কিসের বটে হে? দেখি দেখি!'

হঠাৎ চোখে পড়েছে একটি ছেলের পিঠের ঘাড়ের কাছে একটি বিবর্ণ সাদা দাগ। 'দেখি রে খোকা, ইদিকে আয়, ইদিকে আয়, শুন শুন।'

'হা ক্যানেরে, হারামজাদা বজ্জাত! দেখা ক্যানে?'

দেখে শুনে বললেন, 'তাই ত হে মহাশয়, কেমন পারা লাগছেক যেন গো! ইয়াকে ত দেখাতে হয়। নিয়ে যেয়ো ক্যানে আমার উখানে। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখব।'

আবার রওনা হন। কুষ্ঠের প্রসার [illegible] মনে চিন্তিত হন, বেদনা অনুভব করেন। ভুলে যান অন্য সবকিছু।

নিজের মাইক্রোসকোপ কৃষ্ণস্বামীর গোড়া থেকেই আছে, ছাত্রজীবনে যখন বন্ধুর সঙ্গে তার আওতায় থেকে প্র্যাকটিস করতেন, তখন থেকেই আছে। কম দামে জোগাড় করে দিয়েছিল ক্লেটন। কারবারটা চোরাই মালের তা জেনেই কৃষ্ণেন্দু কিনেছিল। তখন সে ছাত্র-আমলের কৃষ্ণেন্দু। দ্বিধা তার হয়নি। ওটা দিয়ে যখন কাজ করেন কৃষ্ণস্বামী তখন ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করেন মাকে-বাবাকে। মা তাঁর সমস্ত গহনাই দিয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দুকে। সে গহনা বিক্রী করে সে ঠিক করেছিল বিলেত যাবে। তখনই ঘটল রিনার সঙ্গে জীবন দেওয়া-নেওয়া। এবং তার কিছুদিনের মধ্যে সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সে একটা কালবৈশাখীর ঝড়ের মত। জেমস ব্রাউন বললে—ক্রিশ্চান হতে হবে। বাবার পায়ে ধরেও মত পেলে না। উন্মত্তের মত ফিরে এসে বিনাকে জিজ্ঞাসা না করেই ক্রিশ্চান হ'ল। বিনা ঘৃণা ও আতঙ্কভরে মুখ ফেরালে—একটি নারীর জন্যে তুমি তোমার এতকালের ভগবানকে ত্যাগ করেছ কৃষ্ণেন্দু? তুমি ভয়ঙ্কর। না—না। কৃষ্ণেন্দু বের হল সেই ঈশ্বরের সন্ধানে—যে ঈশ্বর রিনার কাছে তার চেয়েও বড—পৃথিবীর সব কিছু থেকে বড। টাকাটা থেকেই গিয়েছিল বাঙ্কে।

আগেকার কৃষ্ণেন্দু ছিল মায়ের গোপাল। সংসারের সব জিনিসে ছিল তারই অগ্র অধিকার। সে নিতেই জানত, দিতে জানত না। শেখে নি। প্রথম দিতে শিখল, রিনার হাতে নিজেকে দিয়ে। রিনা তাকে ঠেলে দিল ঈশ্বর সন্ধানের পথে। বৈজ্ঞানিক যদি বলে ফ্রাস্ট্রেশনের পথে তো—বলুক, সে একটু হাসবে প্রতিবাদ করবে না।

থাক রিনার কথা। তার কথা ভাবতে ভাবতে সময়ে সময়ে মনে হয়, রিনা জন্ম থেকেই বোধ হয় পেয়েছিল ঈশ্বরকে; তাকে ফিরিয়ে দেবার সময় তার সেই ঈশ্বরকে নাস্তিক কৃষ্ণেন্দুকে দিয়ে নিজে কাঙাল হয়ে গেল। হিন্দুপুরাণ মহাভারতের কর্ণের কথা মনে পড়ে। তার মায়ের নাম ছিল কুন্তী। কুন্তীর কুমারী জীবনের সন্তান—কর্ণ কবচকুণ্ডল নিয়ে জন্মেছিল। রিনার জন্মগত ঈশ্বর-বিশ্বাসও তাই। কর্ণ কবচকুণ্ডল দান করে মৃত্যুবরণ করেছিল। রিনা ঈশ্বর-বিশ্বাস তাকে দিয়ে তামসী হয়ে গেল। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। হে ঈশ্বর, তার জীবনের কবরখানাকে জীবনময় করে তুলে তুমি নূতন করে জাগো। মানুষের প্রাণশক্তির শুভবুদ্ধি, তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকার আলো, হে ঈশ্বর, তুমি জাগ্রত হও। তোমার হাতে রিনাকে সমর্পণ করে কৃষ্ণস্বামী নিশ্চিন্ত। তার কল্যাণের জন্যই কৃষ্ণস্বামী নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণ করবে তোমার পায়ে তোমার কর্মে। অন্তরে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রিনাকে নীরোগ

কর তুমি; কৃষ্ণস্বামী তোমার সংসারে কুষ্ঠরোগীর সেবা করে তোমাকে সেবা করবে।

এবার কৃষ্ণস্বামীর বাবার কথা মনে পড়ে যায়। স্বল্পবাক, নির্লিপ্ত মানুষ। আশ্চর্য কঠিন। তবু তিনি তাঁর সম্পত্তি-বিক্রি-করা টাকা তাঁকেই দিয়ে গেছেন। এক কথায় কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিলেন, 'যাও। প্রয়োজন নেই তোমাকে।' বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন ঠাকুর নিয়ে। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন। কিছু টাকা এবং ঠাকুরটি মঠে দিয়ে গেছেন। নিজের জীবনের সামান্য টাকাই খরচ করেছিলেন। বাকি তেরো হাজার কয়েক শো ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, উকিলকে বলেছিলেন, কৃষ্ণেন্দুর খোঁজ করে টাকাটা দিতে। সেটা কৃষ্ণস্বামী পেয়েছেন। তাই থেকেই চলে আশ্রম। এবার আশ্রমটিকে কুষ্ঠ হাসপাতাল করে তুলবেন তিনি। এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমে একটা কুষ্ঠরোগীর ডিসপেনসারি খুলবেন কৃষ্ণস্বামী। আউটডোর।

রিনার মঙ্গল হোক। এই কর্মের মধ্যে রিনার আকর্ষণ ছিন্ন করে দাও।

লাল সিং সিন্ধু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। 'বাবাসাহেব। ই ত ভাল হচ্ছে নাই।'

কৃষ্ণস্বামী হাসেন। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করেন, 'তোমারও ভয় করছে লাল সিং?

লাল সিং মৌন থেকে জানায়, হ্যাঁ লাগছে।

সিন্ধু স্পষ্ট বলে, 'হ্যাঁ বাবাসাহেব। মহাব্যাধিকে ভয় কার না'ই বলেন? হ্যাঁ—আপনকার নাই বটে। তা আপনার পুণ্য আছে, আমাদের তো নাই। কী করব কন?'

বর্বরা ঝুমকি ভয় করে না। ঘৃণা করে। বলে, 'বড়া খারাপ বাসায়। গন্ধো কী। উঃ আর কী হয়ে যায়—হ্যাক থু।'

মধ্যে মধ্যে সেই আমেরিকান মিলিটারী অফিসারটি আসে। এখন আর হে ম্যান' বলে না। বলে, 'মর্ণিং রেভারেণ্ড!'

মধ্যে মধ্যে সে বিনার খবরের কথা তোলে। বলে,—'ডোণ্ট নো—য়োয়ার শী ইজ গন! শী ওয়াজ—ওয়াণ্ডারফুল।' হঠাৎ সেদিন বললে,—'শুনলাম আসাম ফ্রণ্টে ঘুরছে। ঠিক তো বলা যায় না। তবে অনেকটা মেলে সেই ডেয়ার-ডেভিল মেয়েটার সঙ্গে।'

'আসাম?'

'ইয়েস। গৌহাটি—শিলং। চিটাগং। জাস্ট লাইক হার, লাইক এ গুটিংস্টার।'

সেই মুহূর্তে ঝুমকি এসে দাঁড়াল,—'বাবা সাহেব!'

অফিসারটি বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে—'এ যে কৃষ্ণমর্মর মূর্তি রেভারেণ্ড।'

কৃষ্ণস্বামী মনে করিয়ে দেন, 'এটি আসলে একটি চার্চ, মিস্টার অফিসার !'

সামনে যুদ্ধ ! মাথার উপর মৃত্যুর পরোয়ানা যাদের, তারা যত উদ্দাম তত ভীরু। ঈশ্বরের রোষকে ভয় না করে পারে না। অন্তত ঘাঁটাতে চায় না ঈশ্বরকে। গায়ে ক্রশ এঁকে সরে যায়।

কৃষ্ণস্বামী লাল সিংকে ডেকে পরদিন বললেন, 'লাল সিং, আমার শরীর বড় খারাপ মনে হচ্ছে, আমি কিছুদিন বাইরে যাচ্ছি।'

'কোথা যাবেন বাবাসাহেব ? আপনি না থাকলে ইখানে আমরা কী করে থাকব ?

'পনেরো কুড়ি দিন। তবে বেশী নয়। তোমরা গ্রামের মধ্যে যেমন থাক থাকবে।'

পঁচিশ দিন পর ফিরে এলেন কৃষ্ণস্বামী। শরীর সারে নি, বরং শীর্ণ হয়েছে। সিন্ধু বললে, 'শরীর যে খারাপ কর‍্যা এলেন বাবাসাহেব !'

'অনেক ঘুরেছি সিন্ধু ! অনেক কাল ইখানে থেকে মনটা হাঁপিয়ে ছিল। ছাড়া পেযে খুব ঘুরলাম। সেই একেবারে যুদ্ধের লাগালাগি জায়গাতে। শিলং, গৌহাটি, ইখান-সিখান। ঘুরে ঘুরে শরীর খারাপ হবে বইকি ! তবে হাঁ, মনটা ভাল হইছে।'

চট্টগ্রাম থেকে গৌহাটি পর্যন্ত যুদ্ধের লাইনের স্থানগুলিতে খবর নিয়ে ফিরেছেন। হ্যাঁ, খবর পেয়েছেন। ঠিক এমনি একটি মেয়ে ছিল। সে মরেছে। কেউ তাকে খুন করে গৌহাটি থেকে শিলংয়ের পাহাড়ের পথে একটা খাদে ফেলে দিয়েছিল।

সম্ভবত কোনো নিষ্ঠুর সৈনিক। রিনার উদ্ধত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। পোস্ট মর্টেমে জানা গেছে, তার পেটে ছিল মদ, আর জানা গেছে যে, হতভাগিনী কদর্যব্যাধিগ্রস্তা ছিল।

নিশ্চিত হয়েছেন কৃষ্ণস্বামী। রিনা তার জীবনে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে গেছে অথবা নিষ্ঠুর মূল্য দিয়ে এই উল্কা-জীবনের দেনা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে গেছে। পুলিস বিভাগ তার কোনো পরিচয় পায় নি। কৃষ্ণস্বামীকেই তারা প্রশ্ন করেছিল, 'জানতেন নাকি একে ?'

'না। এ সে নয়।'

এই জবাব দিয়েই কৃষ্ণস্বামী চলে এসেছেন। মিথ্যা বলেন নি, এ সে নয়। কিন্তু ঈশ্বর তুমি তাকে কেন দয়া করলে না। ভাল—তার বিচারের সময় তুমি তাকে দয়া করো। এইবার,—হে ঈশ্বর, তোমার সেবায় আমাকে মগ্ন করে

দাও। সেই সঙ্কল্প নিয়েই ফিরেছেন। কলকাতা থেকে অনেক কষ্টে ওষুধপাতিও কিনে এনেছেন। সেগুলো সেই দিনই সাজিয়ে ফেললেন। ডুবে গেলেন এই সেবাকর্মে।

বছরখানেক পর একদিন সকালে ঝুমকি এসে দাঁড়াল।

'বাবাসাহেব।'

'কী?'

'লাল সিং কাল যেতে চলে গৈছে।'

'চলে গৈছে? সে কি? কোথা গৈছে?'

'কে জানে? সি উয়ারা জানে। বুললে, কুঠ নিয়ে কারবার করে সাহেবের কুঠ হল, আবার থাকে? চল সিন্ধু পালিয়ে বাঁচি।'

'কী বললে? কার কুঠ হয়েছে?'

'ক্যানে তুর হয়েছে।'

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কৃষ্ণস্বামী। তাঁর কুষ্ঠ হয়েছে? কয়েক মুহূর্ত পরে তাঁর বুদ্ধি সক্রিয় হল। 'কোথায়? কই?'

নিজের আঙুলগুলি চোখের সামনে মেলে ধরলেন। ছোট আয়না দেওয়ালে টাঙানো ছিল, সেখানার সামনে দাঁড়ালেন। কই? কোথায়?

ঝুমকি বললে, 'উঁহু। উঁহু। যেমন দাগ দেখে তু বলিস—কুঠের লক্ষণ ইটা, তেমনি চাকা-পারা দাগ একটো হইছে যে তুর। পিছা দিক। তু দেখবি কী করে?'

'কোথায়?'

কৃষ্ণস্বামীর জামাটা তুলে পিঠের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে ঝুমকি বললে, 'এই যি। এইটো! কি বেটে ইটো? অ?'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৃষ্ণস্বামী। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি যেন খানিকটা অবশ হয়ে গেছেন। আঘাত পেয়েছেন তিনি। এর জন্য প্রস্তুত তিনি ছিলেন না। এর সম্ভাবনা ছিল না এমন নয়, তবু যখন সত্য সত্য এল, তখন সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে; বড় কষ্ট হচ্ছে। হয়েছে। ঝুমকি যেখানকার আঙুল দিয়েছে সেখানকার সাড় নেই, ঝুমকির আঙুলের স্পর্শ তিনি বুঝতে পারছেন না।

রিনা! রিনার জন্য! কোনো কিছুই যেন মনের মধ্যে ধরা পড়ে নি। মন ওইদিকে এমনই ব্যগ্র ছিল যে, অন্য দিকের সব কিছুই চোখের উপর দিয়েই তাঁর অলক্ষ্যে চলে গেছে।

মস্তিষ্কের মধ্যে কোষে কোষে বেদনার আবেগ ভূগর্ভবদ্ধ আগুনের মতো ফেটে বেরুতে চাচ্ছে। কৃষ্ণস্বামী পাহাড়ের মতো তাকে নিজের মধ্যে রেখেছেন। কাঁপতে দেবেন না। ফাটতে দেবেন না। আগুন ধরিত্রীগর্ভে প্রাণের উত্তাপে পরিণত হোক। প্রাণকোষে-কোষে সে-আগুন সহস্র প্রদীপশিখার মতো জ্বলে উঠুক আনন্দ-দীপালিতে ভগবানের আরতিতে।

অনেকক্ষণ পর তিনি আত্মস্থ হয়ে বললেন, 'আমি বাঁকুড়া যাচ্ছি ঝুমকি।'

বাঁকুড়ায় নূতন কী বলবে? বলবে, ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে। অনিবার্য এসেছে। এর পর? কোথায় যাবেন, কী করবেন?

হাঁ, এসেছে। কার্যকারণের পরিণাম! কৃষ্ণস্বামীকে তিরস্কারও শুনতে হল। এই ভাবে সংঘবদ্ধ বৈজ্ঞানিক চেষ্টার বাইরে একক চেষ্টা করার অনিবার্য পরিণাম!

চুপ করেই গেলেন কৃষ্ণস্বামী। শুধু একটি হাস্যরেখা ধীরে ধীরে তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল।

লর্ড, আই ক্রাই আন্‌টু দী: মেক হেস্ট আন্‌টু মী।

'চিন্তার খুব কারণ আছে বলে মনে করি না। কিন্তু আর তো এইভাবে লোকের চিকিৎসা করে বেড়ানো ঠিক হবে না আপনার।'

'নিশ্চয়। এ তাঁর নির্দেশ! আসতে আসতে ভেবেছি আমি। আমি চলে যাব। কুম্ভকোণম লেপ্যার অ্যাসাইলামে। সেখানে আমার চিকিৎসাও হবে, আমি ডাক্তার হিসাবে কিছু কাজও করতে পারব।'

'গড বী উইথ ইউ।'

মাদ্রাজ উপকূলে কুম্ভকোণম কুষ্ঠাশ্রম। বিরাট কুষ্ঠাশ্রম। সেখানে নিপীড়িত ভগবানের সেবায়তন। আজ মনে পড়ল রিনা ব্রাউনকে। স্ফটিকে-গড়া মূর্তির মতো পবিত্র কুমারী রিনা ব্রাউন, আসানসোলের চার্চইয়ার্ডে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার সময় তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসকে, তাঁর ঈশ্বরকে কি এই পথে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল? না। এই পথ তিনি নিজে বেছে নিয়েছেন।

সেট্ এ ওয়াচ, ও লর্ড, বিফোর মাই মাউথ: কিপ দি ডোর অব্ মাই লিপস্।

একটা ক্ষুব্ধ বাক্যও যেন কৃষ্ণস্বামী উচ্চারণ না করে।

চলো কুম্ভকোণম। শেষ আশ্রম।

* * *

সত্যের চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু নেই; ট্রুথ ইজ স্ট্রেনজার দ্যান ফিকশন: সত্যে মৃত মানুষও বাঁচে, কল্পনার কাহিনীর বাঁচালে অবিশ্বাস্য হয়। বাস্তব

জগতে বস্তু থেকে প্রাণ কালোর সঙ্গে যুদ্ধ করে তার সীমানা অতিক্রম করার জন্য যুগ যুগ ধরে ছুটছে, সম্মুখে দিগন্তে আলোর রাজ্য উজ্জ্বল মহিমায় আহ্বান জানাচ্ছে, তবু মানুষের কানের কাছে অবিশ্বাসী বুদ্ধি কূট তর্কে মুখর হয়ে বলছে, আলো নয়, আলেয়া। আলো মিথ্যা, কালোই সত্য। অমৃত কল্পনা, মৃত্যুই সত্য।

আরও আট মাস পর।

কুম্ভকোণম সেবায়তনে সেদিন ক্লান্ত শরীরে শুয়ে আছেন কৃষ্ণস্বামী। এইখানেই তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। সবচেয়ে কঠিন রোগের রোগীদের তিনি চিকিৎসা করেন। তাঁর নিজের চিকিৎসাও হয়। রোগ বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়ে এতদিনে তার গতি রুদ্ধ হয়েছে। নাকের পেটি ঈষৎ স্ফীত হয়েছে; মুখে, কপালে, গালে, অসুস্থ রক্তাভ মসৃণতা দেখা দিয়েছে; কানের পেটি দুটিও ফুলেছে। হাতের আঙুল ঠিক ফোলে নি, তবে তৈলাক্ত হাতের আঙুলের মতো দেখায়। প্রথমদিকে দ্রুতবেগেই বেড়েছিল। এখন রোগের গতি রুদ্ধ হয়েছে।

এদিকে কালের পটভূমিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গি েছে। ভারতবর্ষে বিস্ময়কর রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটল। স্বাধীন হচ্ছে ভারতবর্ষ। বিভক্ত হচ্ছে ভারতবর্ষ। কৃষ্ণস্বামী দেখেন, আর নিত্য বলেন, এ-জয় তোমারই জয়! মানুষের মধ্যে সত্যের তপস্যাই তুমি। তোমারই জয়। যা হচ্ছে—তার মধ্যে ছলনা মিথ্যা যতই থাক মানুষের, তার চেয়েও বেশী আছে তোমাব দেওয়া সত্যের তপস্যা। আমি জানি। রিনার জীবনের পাপ বড় নয়, প্রায়শ্চিত্ত বড়। আমি জানি। সে জীবন দিয়েছে নিজে। আমাকে দিয়ে গেছে তোমার করুণা। তার আত্মাকে তুমি শান্তি দিয়ো। তার সমস্ত পাপ আমার দেহে ব্যাধি হয়ে তার পাওনা শোধ ব নিক।

ক্লান্ত দৃষ্টিতে নিজের ঘরে খোলা দুয়ারের পথে তিনি সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। মনে মনে এই কথাগুলিই বলছিলেন। একজন ডাক্তার এসে বললেন, 'রেভারেণ্ড, একজন ইংরেজ ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমি বলেছি আপনার শরীর অসুস্থ, কিন্তু তিনি বললেন, অনেক দূর থেকে আসছেন, এবং বললেন, বলবেন আমার নাম জনি, জন ক্লেটন!'

'জন ক্লেটন!' বিস্ময়ে চমকে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী। জন ক্লেটন সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এই লেপার অ্যাসাইলামে! 'কই? কোথায়?'

দূরে দেখা গেল শ্বেতাঙ্গ দম্পতি আ ছে। কিন্তু—কিন্তু—ও—কে? একি হল?

অকস্মাৎ ঘরগুলো দুলতে লাগল, পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছে। সামনের গাছপালা আকাশ আলো সব কেমন হয়ে যাচ্ছে, কী হয়ে যাচ্ছে! জ্যোতির্লোকে যেন বিস্ফোরণ হচ্ছে। ক্লেটনের পাশে ও-কে? কৃষ্ণস্বামী চিৎকার করে উঠলেন, 'রিনা!'

জন ক্লেটনের পাশে রিনা! রিনা ক্লেটনের স্ত্রী।

হ্যাঁ কৃষ্ণেন্দু। আমি। আমাকে দেখে তোমার বিস্ময়ের কথাই বটে। কিন্তু তুমি, তুমি আমাকে আশ্চর্যভাবে অশরীরীর মতো অনুসরণ করে আমাকে অহরহ ডেকেছ। কাম ব্যাক্, কাম ব্যাক্, ফিরে এসো, ফিরে এসো বলে ডেকেছ। ফিরতে চাইলাম। পালিয়ে গেলামও এলাকা ছেড়ে। কিন্তু কে আমাকে হাত বাড়িয়ে দেবে? কার হাত ধরে আমি আবার মানুষের হৃদয়ের রাজ্যে প্রবেশ করব? তোমার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু পারি নি! ভয়ে পারি নি আমি গুলি করে—'

চুপ করে গেল রিনা। উচ্চারণ করতে পারলে না সে-কথা।

কৃষ্ণস্বামীর বিস্ময় কেটে আসছে।

রিনা বললে, 'তুমি বলেছিলে, মানুষের অন্তরে ভগবানের পুত্রকে তার মন্দ বুদ্ধি নিত্য ক্রুশবিদ্ধ করে, নিত্য তিনি নবজীবনে জেগে ওঠেন। অনুভব করলাম এ সত্য। কিন্তু তবু তোমার সামনে যেতে পারলাম না। তোমার সেই ভয়ঙ্কর কথা আমার কানে বাজত। তুমি বলেছিলে, আমি এখানে থাকব টু বী ক্রুশিফায়েড এগেন। তুমি সন্ন্যাসী, তুমি সেইণ্ট, তোমার পাশে আমি দাঁড়িয়ে কলুষিত করতে পারি তোমাকে? কিন্তু—'

চোখ দিয়ে রিনার জল গড়িয়ে এল।

জন ক্লেটনও যেন সেই কৃষ্ণেন্দুর জনি নয়। অথবা কৃষ্ণস্বামী কৃষ্ণেন্দু নন। জন ক্লেটন ও তাঁর সঙ্গে সম্ভ্রমভরে কথা বলছে। অবশ্য ক্লেটনও আর সে-ক্লেটন নয়। সে পরিণত-বয়স্ক মানুষ। পোড়-খাওয়া মানুষ। অনেক দুঃখ পেয়েছে। প্রথম স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ করে চলে গেছে। যুদ্ধে বন্দী হয়ে দীর্ঘদিন পূর্বাঞ্চলের বন্দীশিবিরে কাটিয়েছে। আজও তার দেহ শীর্ণ। ভিতরে বাইরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। ক্লেটনের কানের পাশে গুলির দাগ। কপালে সারি-সারি রেখা দেখা দিয়েছে। কণ্ঠস্বর তার শান্ত। তার জীবনেও বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ক্লেটন বললে, 'যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলাম। মুক্তি পেয়ে ফিরে কিছুদিন পর গেলাম কাশ্মীর। শরীরটা একটু সুস্থ হবে। মনে ক্লান্তির সীমা নেই। হঠাৎ

কাশ্মীরে দেখলাম রিনাকে। ঝড়ে ডানাভাঙা বোবা-হয়ে-যাওয়া পাখি দেখেছ কৃষ্ণেন্দু?

হেসে ক্লেটন বললে, 'তোমাকে কৃষ্ণেন্দু বলতে বাধছে রেভারেণ্ড। তুমি সত্যিই পবিত্র।'

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'একমাত্র ভগবানই পবিত্র ক্লেটন। যারা জীবনের বেদনাকে তাঁর পায়ে ঢেলে দেবার জন্য তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে তাদের উপর তাঁর আলো পড়েই তাদের পবিত্র মনে হয়। নইলে তারাও মানুষ ক্লেটন।'

বিচিত্র হেসে তারপর বললেন, 'আমি ধারণা করেছিলাম, রিনা শিলং ফ্রন্টে। এখানকার একটি অ্যামেরিকান অফিসার বলেছিল—রিনা শিলংয়ে। সেখানকার কে এক অফিসার তাকে একটি উন্মত্তপ্রায় মেয়ের কথা বলেছিল। তার ধারণা হয়েছিল—সে রিনা। আমি শিলংয়ে গেলাম। ওকে ফিরিয়ে আনব জীবনে। গিয়ে শুনলাম সে মেয়েটি মরেছে। তাকে কে রাত্রে খুন করে খাদে ফেলে দিয়েছিল।'

রিনা সজল চক্ষে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কৃষ্ণস্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'কত খাদে, কত জঙ্গলে, এমন কত হতভাগিনীর জীবন শেষ হয়েছে, দেহ শকুন-শেয়ালে খেয়েছে, মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তার হিসেব নেই। আমারও যেত কৃষ্ণেন্দু, যদি সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা না হত, যদি তোমার স্মৃতি আমার পেছন দেবদূতের মতো অহরহ না ফিরত—তবে আমারও ওই হত। আমি পিগাবা-ডোবা থেকে পালিয়ে গেলাম সেই রাত্রে। সেই ঝড-বৃষ্টির মধ্যেই ক্যাম্পের দিকে যেতে যেতে গেলাম না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন দুলছে, কাঁপছে, ভেঙে পড়ছে; ভেঙেচুরে অ র একরকম হয়ে যাচ্ছে। মনে হল ক্যাম্পের মধ্যে আকাশের মেঘের মতো পুঞ্জ .. বিরক্তি তিক্ত জমে উঠেছে—ঘুরপাক খাচ্ছে। ওখানকার মানুষগুলোকে বীভৎস কুৎসিত মনে হল। কি যে মনে হয়েছিল ঠিক বলতে পারব না। তবে ওপথে যেতে যেতে অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠল—না। ওখানে নয়! না—না—না।

দাঁড়ালাম। তারপর দুরন্ত রাগ হল তোমার উপর। ফিরলাম দুরন্ত রাগে—তোমাকে খুন করব। দেখলাম তুমি সেই জলের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ পথের দিকে তাকিয়ে। বুঝলাম—আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ। মুহূর্তে আমি সাহস হারালাম, রাগ হারালাম; কাঁপতে লাগলাম। থর থর করে কেঁপেছিলাম। কেঁদেছিলাম। তারপর ভেবেছিলাম—মুখে রিভলবারের নল পুরে গুলি করে উন্মত্ত যন্ত্রণাজর্জর জীবনটাকে শেষ করে দেব। কিন্তু তাও

পারলাম না। তুমি পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে। অশ্চর্য শক্তি তোমার সেই স্থির মূর্তির। আশ্চর্য শক্তি। তারপর তুমি চলে গেলে আমি পালালাম। ছুটে পালিয়েছিলাম মাইলখানেক। তারপর একখানা জিপ পেয়েছিলাম। ব্যাঙ্কুরা এসে ট্রেন ধরলাম। কোথায় যাব? স্থির করলাম অনেক দূরে যাব। অনেক দূরে। প্রচণ্ড উন্মত্ত কোলাহল—ভয—পাশবিকতার মধ্যে। মরণ নিয়ে খেলার মধ্যে যেখানে ভাববার অবকাশ নেই। আছে মরা আর মারা; আর অবসরের মধ্যে নেশা আছে, খাওয়া আছে—আর আছে উন্মত্ত দেহভোগ। এলাম আসামে। শিলংয়ে আমি যাইনি—আরও সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এলাম। যখন পৌঁছুলাম, —তার আধ ঘণ্টার মধ্যে হল একটা এয়াররেড। একটা মাটির গর্তে লুকিয়েছিলাম। রেড শেষ হল। তখন পিছু হটার হুকুম হয়েছে। একজন অফিসার আমাকে জীপে নিয়ে নিলে মরণের মুখে ভোগলালসায়। রাত্রে সে অভিজ্ঞতা আমার চিরস্মরণীয়—আমি ভুলব না। অরণ্যভূমের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছিল। আমি দেখলাম একা তুমি সহস্র হয়ে চারিপাশে ঘিরে রয়েছ আমাকে। তারপর চাঁদ ডুবল। অন্ধকারে জিপ ওন্টালো অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান যখন হল তখন শেষ রাত্রি। দেখলাম পড়ে আছি, একা খাদের কিনারায়; আব তুমি আমাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছ। হ্যাঁ তুমি। নির্ভুল তুমি। আমার পিস্তলটা সঙ্গেই ছিল। আমি গুলি ছুড়লাম, তুমি নড়লে না। একবার কাঁপলে না, ধরেই রইল। মনে হল, বললে—'আই এ্যাম হিয়ার টু বী ক্রুশিফাইড এগেন।'—আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আবার যখন জ্ঞান হল—তখন আমি হাসপাতালে। শুনলাম খাদের ধারে আমি একটা গাছে আটকে ছিলাম! নিচে আড়াই হাজার ফুট খাদ। কিন্তু আমি জানি—গাছ সে নয়, হতে পারে না। আজও জানি। সে তুমি। অস্থির অধীর হয়ে উঠলাম। কোথায় যাব? কোথায় গেলে তোমার এই অশরীরী অনুসরণ থেকে রেহাই পাব। ফ্রন্টের আবহাওয়া—ওই ভোগসর্বস্ব মানুষ তখন অসহ্য হয়েছে! তারা যেন রাক্ষস। হ্যাঁ, সমস্ত জীবনের ক্ষুধা পুঞ্জীভুত করে তখন তারা রাক্ষসের মতো বুভুক্ষু।

ওদের নাগালের বাইরে দূর-দূরান্তরে পালিয়ে যেতে চাইলাম। ওদিক থেকে আমি চলে এসে পালালাম সিমলার দিকে। সেখান থেকে কত জায়গা। ক্লান্ত শ্রান্ত। দেহ ভেঙেছে মন ভেঙেছে—চাইলাম বিশ্রাম। শুধু বিশ্রাম। শুধু মদ খেতাম। আমি তখন কখনও মরে বাঁচতে চাই কখনও আবার দারুণ ক্ষোভে উল্কার মতো ছুটতে চাই। কিন্তু যতবার এগিয়েছি—ততবার ওই খাদের ধারে গাছের মধ্যে তোমাকে দেখার মতো, কিছু না কিছুর মধ্যে তোমাকে দেখেছি। পথ আগলে দাঁড়িয়েছ। ওঃ! কতবার ওয়ার-জোনের দিকে অর্ধেক পথ গিয়ে

ফিরে পালিয়ে এসেছি এমনিভাবে তোমাকে দেখে। তারপর গেলাম কাশ্মীরে।। তখন আমি অর্ধমৃত। কিন্তু তবু রেহাই নেই। পিছনে লাগল বুভুক্ষু সৈনিক। একদিন মদ খেয়ে আত্মরক্ষা করতে পারলাম না। মাতাল হয়ে পড়ে গেলাম। একটা নির্জন জায়গায়, দুটো জানোয়ার আমার সঙ্গ নিয়েছিল—তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

স্তব্ধ হল রিনা। আর সে বলতে পারছে না।

কৃষ্ণস্বামীও স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছেন, গভীর রাত্রে শান্ত সমুদ্রের মতো।

ক্লেটন বাকীটা শেষ করলে। ওইখানেই রিনার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল।

সন্ধ্যার পর সামরিক শাসনের ভয়ে তারা ফিরতে বাধ্য হল। রিনা তখন প্রায় অজ্ঞান, আর শুধু বিড়বিড় করে বকছে আপন মনে। তারা শবের কাছে আনন্দ পায়নি, তাকে ফেলে চলে যাবার সময় তাকে লাথি মারছিল। ক্লেটন আসছিল সেই পথে সে দেখতে পেয়ে ছুটে যায়। অফিসারস্ ব্যাজ দেখে তারা পালায়। ক্লেটন দেখে শিউরে উঠে।

রিনা! রিনা! হ্যাঁ, এই তো রিনা।

সে ডেকেছিল, 'রিনা, রিনা।'

রিনা বিড় বিড় করে বকেই গিয়েছিল। ওরা যা বুঝতে পারেনি—ক্লেটনের তা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি। রিনা বকছিল, 'ইট ইজ দি কজ্, ইট ইজ দি কজ্ মাই সোল!'

আর সন্দেহ থাকেনি, এই রিনা ব্রাউন! রিনাকে সে কাঁধে করেই প্রায় তুলে এনেছিল। বার বার কানে কানে বলেছিল, 'রিনা মাই ডার্লিং, রিনা মাই লাভ, রিনা মাই এঞ্জেল! আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

রিনা চিৎকার করে বলেছিল,—'লীভ মি—লীভ মি—লী ভ মি কৃষ্ণেন্দু! দি গেটস অব হেভেন্স উইল বি ক্লোজড টু ইউ ফর মি—ফর মি। আই ডোণ্ট লাইক টু গো টু হেভেন্স। লীভ মী!'

এক মাস প্রাণপণে সেবা করে চিকিৎসা করিয়ে রিনাকে সে সুস্থ করে তুলেছিল। রিনা বিস্মিত হয়েছিল।

ক্লেটন রিনাকে বলেছিল নিজের কাহিনী। তারপর বলেছিল, 'প্রথম যৌবনের সে-আমি দুঃখে আগুনে পুড়ে গিয়েছে। গ্লানি আবর্জনাই পোড়ে, ছাই হয়; যা খাঁটি তা ছাই হয় না, পুড়ে শুদ্ধ হয়। আমি তোমাকে এইটুকু বলি রিনা, ট্রাই মি, পরীক্ষা করে দেখ আমাকে। আর যদি বলো চলো তোমাকে কৃষ্ণেন্দুর কাছে নিয়ে যাই।'

চমকে উঠেছিল রিনা।—'কার কাছে? না—না—না—। বলো না, বলতে নেই। সে সেইণ্ট।'

*   *   *

রিনা বললে, 'কী করব? তোমার পাশে দাঁড়াবার মতো শক্তি আমার তখন নেই। আমি ওকেই বিশ্বাস করলাম। এবং সে তো প্রমাণ করলে। সে ভালোবাসাকে প্রমাণ করলে। দু-হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলে কৃষ্ণেন্দু, আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলে। সেটা এল ওর মধ্যে দিয়ে। তুমি সেইণ্ট কৃষ্ণেন্দু! তুমি সেইণ্ট!'

তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার দুঃখ রইল, তোমার এই অবস্থায় তোমার সেবা করতে পারলাম না!'

কৃষ্ণস্বামী সামনে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাকিয়ে থেকেই বললেন, 'এই হয়তো আমাব পুরস্কার রিনা। এই দিয়েই তিনি আমার সব অতৃপ্ত কামনা তৃপ্ত করে দিলেন।'

এবার হাসলেন, হেসে বললেন, 'দেখো, আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, এক সঙ্গে সাত পা হাঁটলে মিত্রতা হয়। আমাদের বিবাহে স্বামী-স্ত্রীতে অগ্নি সাক্ষী করে, সাত পা একসঙ্গে পা ফেলে হাঁটে। কিন্তু যখন ভগবানকে খোঁজে মানুষ, তখন সে একা, কারুর সঙ্গেই সাত পা হাঁটা যায় না। বন্ধুর সঙ্গেও না। একা। সে-পথে বিচিত্রভাবে আসে আশীর্বাদ, অভিশাপ! এবং—। সাত পা একসঙ্গে না হাঁটলে সংসাবের আনন্দে ফেরা যায় না। তোমরা হেঁটেছ দোর খুলেছে। সুখে তোমাদের সংসার ভবে যাক। আমরা যাত্রা—অ্যালোন। আমি সুখী।'

স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে।

ক্লেটন সে-স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, 'আমরা আবার আসব। আমি ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছি না। বিনাকে নিয়ে এখানেই ঘর বাঁধব। বার বার আসব।'

'এখানে থাকবে তোমরা? তা হলে—তা হলে আমি একটা অনুরোধ করব। রিনা, তুমি আমার আশ্রম জান। সেখানে ঝুমকি বলে একটি অনাথা মেয়ে আছে—তাকে তোমাদের সংসারে নিও। আচ্ছা। আর নয়। জন, ইউ আর এ মেডিক্যাল ম্যান। চলে যাও, আর না। গুড বাঈ! গুড বাঈ! কেঁদো না, নো-নো-নো। আমি দেখতে চাই তুমি হাসছ। লুক ইন মাই ফেস। দেখো, আনন্দ ছাড়া আর কিছু কি আছে। গুড বাঈ! গুড বাঈ! গুড বাঈ!'

দীর্ঘ হাতখানি তুলে দীর্ঘকায় পুরুষটি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। স্থির কিন্তু। এ ওদের বিদায় সম্ভাষণ দিচ্ছেন, না শূন্যলোকে অদৃশ্য ঈশ্বরের পা দুটি শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছেন—সে কৃষ্ণস্বামীই জানেন।

পরিশিষ্ট

কিছুকাল আগে রেডিয়ো থেকে কয়েকজনকে 'মনে রাখার মত মানুষ' এই পর্যায়ে নিজের নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলা হয়েছিল। এ পর্যায়ের কথিকাগুলি সত্যই একেবারে বিস্ময়কর এবং কৌতূহলোদ্দীপক। ইংরেজীতে যাকে বলে Truth is stranger than fiction; কিন্তু যিনি fiction রচনা করেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সত্য অবশ্যম্ভাবীরূপে তাঁর fiction-ভুক্ত বা তার অঙ্গীভূত হয়ে বসে থাকে। অবশ্য যদি সে অভিজ্ঞতা-লুব্ধ সত্য সস্ত-লব্ধ না হয়। পৃথিবীর সব লেখকই এই বিচিত্র বিস্ময়কর সত্যের মধ্যে দিয়ে সেই জীবন-সত্যকে খুঁজে বেড়ান, স্বর্ণসন্ধানী বা মণিমাণিক্য-সন্ধানী দুঃসাহসীর মতো। সে সন্ধান যার মেলে সে-ই ফকির থেকে হয় ধন। এর সন্ধানেই বড় বড় লেখকেরা মানুষের মেলার মধ্য বিহ্বলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। লিখবার উদ্দেশ্যে ঘোরেন না, দেখবার উদ্দেশ্যেই ঘোরেন। লণ্ডন প্যারিসের পথে-গলিতে, রাশিয়ার শহরে-গ্রামে ব্ল্যাক সীর তটভূমিতে বড় বড় লেখকেরা ঘুরেছেন, দেখেছেন। যাঁরা পূর্বকালে এদেশে মহাকাব্য লিখেছেন তাঁরা পদব্রজে ভারতের হিমালয় থেকে সমতল নগরগ্রাম অরণ্যভূম পরিভ্রমণ করেছেন। এই সত্য মিলে গেছে এমনই বিচিত্র মানুষের জীবন-সত্য থেকে। আমারও এ স্বভাব ছিল, আজও আছে। এককালে বাংলার মেলায় মেলায় ঘুরেছি। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। এখনও ঘুরি। এমনি ঘোরার মধ্যে দেখা পেয়েছিলাম একজন মনে রাখার মতো মানুষের। আমি লেখক, আমার মনে রাখার মতো মানুষ মনেই থাকেনি—আমার মনের সাগরে অবগাহন করে আমার লেখার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সপ্তপদী সৃষ্টির এই বিচিত্র সত্যটি—ইদানীং কালে আমার রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা বাস্তব-বৈচিত্র্য অনুসারী। এবং সত্য সত্যই এক্ষেত্রে Truth is stranger than fiction.

সপ্তপদীর সমাদর হয়েছে। এবং গল্পের নায়কের অস্তিত্ব ও সত্যের কথা রেডিয়ো-শ্রোতাদের কাছে বলেছি ও প্রবন্ধের বইয়ের মারফৎ পাঠকদের কাছেও হাজির করেছি। সেইটুকু পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করছি।

মানুষের বাস্তব জীবনে রাম মেলে না কিন্তু মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মেলে—মহাত্মা গান্ধী মেলে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র মেলে—আমার জীবনেই মিলেছে। তাঁরা তাঁদের কর্মে কীর্তিতে ইতিহাসের পাতায় মারফতে চিরকাল মানুষের

একটা খুরি বা পাথরের শীল। একে মনে আছে? ওকে? আছে বই কি। সেই তো রোল নম্বর একশো—কি এক? দাঁত দুটি উঁচু। কপালে চুলের একটা ঘূর্ণি?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আর তাকে?

—কাকে বলুন তো? কেমন দেখতে?

একদিন তাঁর সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চল দ্বীপে ঘুরছি, দুধারে বন আর পাহাড়। হঠাৎ এক জায়গায় এসে প্রশ্ন করলেন—একে মনে আছে? আমাদের সময়ে ফোর্থ ইয়ারে পড়ত, লম্বা কালো—হৈ হৈ করে মাতিয়ে রাখত সব। মেম বিয়ে করবার জন্যে ক্রিশ্চান হয়েছিল?

বললাম—আছে বৈকি।

—দেখবেন তাকে?

—এখানে কোথায় সে?

—চলুন, দেখবেন।

দ্বীপকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন একখানি গ্রামে। পাহাড়ের কোলে—আদিবাসীদের গ্রাম। তার মধ্যে কাঠে তৈরী একটি চার্চ। সেই চার্চের পাদরী, একজন দীর্ঘ শীর্ণকায় মানুষ—মুখে আশ্চর্য প্রসন্ন হাসি। গ্রামের ছেলেদের পড়াচ্ছেন।

বললেন—উনি।

অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—উনি?

—হ্যাঁ। কিছুদিন হল ওঁকে আবিষ্কার করেছি—কথায় পরিচয় হল—জানলাম উনিই তিনি।

সেই প্রচণ্ড দুর্দান্ত হৈ হৈ-করা ছেলে—যে একটি নারীর জন্যে ধর্ম-বাপ-মা সব বিসর্জন দিতে পারে—সেই ইনি। শান্ত-প্রসন্ন-মধুর।

বন্ধু বললেন—একটা ট্রাজেডির দৃষ্টান্ত।

—মেয়েটি মরে গেছে?

—না। ঘটেছিল কি জানেন; এই যে ক্রিশ্চান না হলে বিয়ে দেবে না, এ জেদ ছিল বাপের। মেয়েটি তা চায়নি। সে চেয়েছিল তিন আইনে বিয়ে হোক। ইনি ধর্ম মানতেন না, জাত মানতেন না। ইনি ক্রিশ্চান হলেন, নিজের থেকে। এবং গিয়ে বললেন—আমি ক্রিশ্চান হয়েছি। আর তো বাধা নেই।

মেয়ের বাপ বললেন—না।

কিন্তু মেয়ে পাথর হয়ে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর

বলল—তুমি আমার জন্তে; আই মীন একটি মেয়ের জন্তে, তোমার ঈশ্বর, তোমার ধর্ম ত্যাগ করলে?

উনি খুব উৎসাহের সঙ্গে হেসেছিলেন—বলেছিলেন—আমার জীবন দিতে পারি তোমার জন্তে।

মেয়েটি বলেছিল—মাফ কর আমাকে। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। তুমি আমার জন্তে এতকালের ঈশ্বরকে ত্যাগ করলে। কাল আমার থেকে কোনো সুন্দরী মেয়ে তোমার ভালো লাগলে আমাকে ত্যাগ করবে না কে বললে?

মেয়েটি ওকে বিয়ে করেনি। কোনো মতেই রাজী হয়নি। বাপ-মায়ের অনুরোধও রাখেনি।

উনি চলে এলেন মর্মাহত হয়ে। সারারাত ভাবলেন। স্থির করলেন—ঈশ্বর এত বড়? এত প্রিয়? যার জন্তে সংসারের প্রিয়তম জনকেও উপেক্ষা করা যায়? তাহলে তিনি তাঁকেই খুঁজবেন। তাঁর সেবাতেই জীবন নিয়োগ করবেন। সেই থেকে উনি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রথমে ছিলেন—গোরো পাহাড়ে। সেখানকার আদিবাসীদের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সাধনা করেছেন। পাকিস্তান হবার পর এখানে এসেছে।

বললাম—সেই মেয়েটি?

—তার খবর উনি আর করেননি, রাখেনওনি।

আমার মনে হল—আমার অন্তর্লোকের সকল স্তর ভেদ করে এক অতি সাধারণ—অসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। অট্টহাস্তের বদলে প্রসন্ন ধীর হাস্তে সুপ্রসন্ন, দুর্দান্তপনার পরিবর্তে পরম প্রশান্ত উল্লাস চঞ্চতার অধীরতার পরিবর্তে শান্ত ধীর।

মনে পড়ল বিখ্যাত উপন্যাস কুয়ো ভেডিস।

—Where goest Thou Lord!

উত্তর হল—To Rome to be crucified again!

অল্প কয়েকটি কথা বলেছিলাম। উত্তরে কথা পেয়েছি অল্প। কিন্তু প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্তে যেন অমৃত ধারায় স্নানপুণ্য অনুভব করেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—ঈশ্বর পেয়েছেন?

শুনেছিলাম—পেয়েছি বৈইকি। নইলে এত আনন্দ পাই কোথা থেকে।

ফিরে এলাম। আমার মনের স্মৃতির ঘরে একটি অতি অসাধারণ মানুষের অসাধারণ জ্যোতির্ময় প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এলাম। ঐতিহাসিক বিরাট পুরুষদের ছবির সারি অনেক উঁচুতে টাঙানো। ঘাড় উঁচু করে দেখতে

হয়। এঁর ছবি ঠিক তাঁদের নিচেই ঝুলছে। মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াই। আমার কাছে যিনি অবিস্মরণীয়—তিনি আমার লেখার মধ্যে দেখা না দিয়ে তো পারেন না। সপ্তপদীতে তিনি কৃষ্ণেন্দু হয়ে দেখা দিলেন।

* * *

বাকি থেকে গেছে নায়িকার কথা। নায়িকার নাম রিনা ব্রাউন। অবশ্যই কাল্পনিক নাম। এবং কৃষ্ণেন্দুর হারিয়ে-যাওয়া প্রেমিকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাকে আমি দেখিনি। কথাও বিশেষ শুনিনি। রিনা তবু পুরো কাল্পনিক নাম। এ ক্ষেত্রে গল্প একটু সত্য—যা রূপকথার রাজ-কন্যার খসে-পড়া একগাছি সেনার বর্ণ চুলের এক অপরূপাকে মনে করিয়ে দেবার—যা আমি পেয়েছিলাম তাই বলি। আসল মানুষটি এবং কৃষ্ণেন্দু যেমন এক নয়, উপন্যাসের রিনা ব্রাউনও তেমনি সেই অসাধারণ মেয়েটি নয়—যে বলেছিল বা বলতে পেরেছিল, 'আমার মোহে তুমি যখন তোমার এতদিনের ধর্ম এতদিনের বিশ্বাসের ভগবানকে ত্যাগ করেছ, তখন কে বললে আমাব থেকে সুন্দরী কাউকে দেখলে আমাকে পরিত্যাগ করবে না।' পূর্বেই বলেছি তাকে আমি দেখিনি তাকে আমি জানি না। যা ঘটেছিল তাতে সেই মেয়েব পক্ষে একমাত্র চিরকুমারী থাকাই উচিত। সত্য ক'রে এই মেয়ের কি হয়েছিল বা হয়েছে তা সেই পাদরীও জানেন না। বাস্তবসত্য, গল্প উপন্যাসের কল্পনার বিচিত্র সত্য থেকেও অদ্ভুত। হয়তো অবিশ্বাস্য। লিখতে বসে রিনার চরিত্র নিয়ে বেশ ভাবনায় পড়েছিলাম। হঠাৎ একটি দেখা, মাত্র কয়েক বারে কয়েক ঝলক দেখা একটি ইংরেজ বা আমেরিকান বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইংরেজীবাসিনী এক বিচিত্র বিদেশিনী মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। তার কয়েকটি কথা এবং ছবি মনের মধ্যে ভাসছে।

১৯৪৪ সালে পুরীর সমুদ্রতীরে তাকে প্রথম দেখেছিলাম। দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে-চোখের পাতাগুলি ঘন কালো এবং ফুলের কেশরের মতো দীর্ঘ। মাথার চুলে ঘনকৃষ্ণ শোভাই শুধু নয়—বিষুবরেখার অঞ্চলস্থ ঘাসের ঘন বর্ণাঢ্যতা এবং সমৃদ্ধিও তার রক্তের ইতিহাসের একটি সাক্ষ্য বহন করছিল। তার পরনে স্ল্যাক; গায়ে ফুলহাতা ব্লাউজ, মাথায় একখানা গাঢ় লাল রঙের রুমাল। উচ্চ হাস্য-প্রমত্ত কণ্ঠস্বরে অর্ধস্থির পদক্ষেপে ঝড়োজীবনের ইঙ্গিত আর ইঙ্গিত ছিল না—স্পষ্ট পরিচয় হয়ে ব্যক্ত হয়েছিল। একমুহূর্তে পুরীর সমুদ্র-তটের সকল মানুষের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে সবিস্ময়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্ফারিত হত। সঙ্গে অবশ্যই অহরহ কেউ-না কেউ যুদ্ধের পোশাকপরা শেতাঙ্গ থাকতই। একদিন পূর্ণিমার রাত্রে সমুদ্রতটে তাকে তীব্রকণ্ঠে বলতে

শুনেছিলাম—বোধকরি তার সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল—সে—বলেছিল—What do I care for God? I am no Christain. My father did not baptize me. He was ashamed of me. I hate you. Yes I hate you. Your heaven is not my heaven. My heaven is hell. My God is the God of hell.—বর্বর মাতাল সৈনিকটা তাকে মেরেছিল মুখের উপর। ইংরেজের আমল, যুদ্ধের কাল, বি-এন-আর হোটেলের এলাকায় কয়েকজন এদেশের লোকের সঙ্গে আমিও ছিলাম—কিন্তু কেউ কিছু বলেনি, বলতে সাহস করেনি এবং অনধিকার চর্চাও মনে হয়েছিল। পরদিন আবার তাকে দেখেছিলাম—মুখে তার কালসিটের দাগ; ঠোঁটটা ফুলে গেছে। সমান উৎসাহে প্রমত্ত পদক্ষেপে ঘুরছে। সর্বনাশের পথের যাত্রিনী।

এই মেয়েকে কলকাতাতেও চৌরঙ্গী অঞ্চলে দেখেছি। একদিন এক ময়দানে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি নিশ্চল প্রতিমার মতো; তখন অপরাহ্ণ বেলা। কি ভাবছিল কে জানে। তার স্বর্গের কথা? তার ঈশ্বরের কথা? তার জীবনের কথা?

তারপর তাকে দেখি শিলংয়ের পথে। বছর দেড়েক বাদে। এই সময়ের মধ্যেই তার জীবন দেহ অমিতাচারের ফলে দীর্ণ হয়েছে পোকা-ধরা লতার মতো।

এরচেয়ে ভাল বাস্তব উপমা মনে হচ্ছে না। এই কিছুদিন আগে বোধ করি মাস ছয়েক হবে একটি ভালো অপরাজিতার লতা এনে বাড়িতে পুঁতেছিলাম। প্রথম সে বাড়তে লাগল ঘন সবুজ বর্ণে, চওড়া পাতার পর পাতা মেলে, মোটা সরস ডাঁটার সর্পিল বিস্তারে। চোখ জুড়িয়ে যেত। হঠাৎ গাছটায় পোকা ধরল। পাতা ছোট হল—কুঁকড়ে যেতে লাগল, ডাঁটা শীর্ণ হল—শিরা-ওঠা হাতের মতো লম্বা রেখা জাগল তাতে, পাতার ডাঁটা বর্ণে এমন একটা কিছু মিশল যা দৃষ্টিকে পীড়িত করে। ও মেয়েটির অবস্থাও তখন ঠিক তেমনি। গোহাটি থেকে এক বাসে যাচ্ছিলাম। তার সঙ্গে ছিল একটি তরুণ যার বয়স তার থেকেও অনেক ছোট, দুগ্ধপোষ্য না হোক নিতান্তই কিশোর একটি, যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে, মেয়েটাই তাকে পাকড়েছে বা কিশোরটি যুদ্ধক্ষেত্রের আবহাওয়ায় তার কাঁচামাটির পেয়ালার মতো কাঁচা অপরিণত জীবন-পাত্রে এই মেয়েটার জীর্ণ যৌবনের ঝাঁঝালো মদ ঢেলে আকণ্ঠ পান করতে ছুটে এসেছে বলির বিল্বপত্রভোজী পশুর মতো। মেয়েটার হাত কাঁপছে অর্থাৎ সুরা কম্পন শুরু হয়েছে। চোখ দুটো অহরহ ঢলঢল করছে। বিড়বিড় করে বকছে। বমি করতে শুরু করলে বাসে। গৌহাটির বাঙালীরা আমাকে প্রচুর কমলালেবু দিয়েছিল। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সে

তাকাচ্ছিল কমলাগুলির দিকে। আমি তাকে কয়েকটি লেবু দিয়েছিলাম। সে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কত দাম? আমি হেসে বলেছিলাম—তোমাকে দিলাম, তুমি অসুস্থ, খাও। আমি তো লেবু বিক্রি করি না।

মেয়েটিকে একদিন ফুটপাতে পড়ে থাকতেও দেখেছি; একটা জীপ এসে তুলে নিয়ে গেল।

মেয়েটির ওই কয়েকটি কথা মনে হল সপ্তপদীর নায়কের আমূল পরিবর্তনের কথা মনে ক'রে। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না—সে বেরুল ঈশ্বর খুঁজতে, ঈশ্বর কি জানতে! রিনাই তো আঘাতের মধ্যে দিয়ে দিলে তার ঈশ্বরকে। পেলে কি? বৃহত্তর ঈশ্বর-বিশ্বাস, দৃঢ়তর বোধ পাওয়াই সম্ভব।

কিন্তু হারিয়ে রিক্ত হওয়াও তো অসম্ভব নয়।

ঈশ্বরের জন্য প্রিয়তম মানুষকে বর্জন করে। রিক্ততাই সাধারণভাবে মানবিক। পূর্ণতা অসাধারণ। অস্বাভাবিক না হলেও দুর্লভ। তাই মেয়েটির ওই সমুদ্রতীরের কথা মনে ক'রে এবং শ্বেতাঙ্গ জাতির দুর্ধর্ষ বেপরোয়া দুঃসাহসের পথের দুর্মদেরা যে ভাবে পৃথিবীময় নিজেদের দেহের প্রয়োজন মিটিয়ে সন্তান উৎপাদন ক'রে তাদের ফেলে চলে এসেছে এবং বর্ণসঙ্কর সমাজ বলে নিজের সন্তানদেরই ঘৃণা করে এসেছে, সে-কথা মনে ক'রে ওই মেয়েটিকেই তার ওই কয়েকটা কথার মধ্যে ইতিহাসকে আশ্রয় করে রিনারূপে অঙ্কিত করেছি। জানি যে, মেয়েটার রক্তের মধ্যেই হয়তো পাপ-পুণ্য না-মানার ঈশ্বর না-মানার বীজ ছিল, হয়তো জন্মস্বৈরিণী, কিন্তু আমি তার কয়েকটা প্রদত্ত কথার মধ্যে একটা ব্যথা-বেদনার আভাস পেয়েছিলাম। কেবলমাত্র ওই-টুকুর জন্যেই সে আমার মনে স্মরণীয়ও হয়ে আছে, তাই ওই ভাবেই সমবেদনার তর্পণের জল তাকে অর্পণ করে তাকে এঁকেছি আর বলেছি—আমি লেখক তুমি আমার কাছে এই তর্পণের তর্পণীয়। তুমি আমার অনাত্মীয় অবান্ধব হয়তো বা অপঘাতই তোমার নিয়তি; তোমাকে তবু দিতে হবে আমার শ্রদ্ধার নির্মল জল। আমার শ্রদ্ধাতেই সে ফিরেছে। কুম্ভকোণমের কৃষ্ণস্বামীও যে আমার শ্রদ্ধায় মহিমান্বিত।

সেদিন বর্ষাকালের কৃষ্ণপক্ষের একটি ঘনমেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। সারাদিন প্রায় বর্ষণ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর বর্ষণ থেমেছে কিন্তু দুর্যোগ কাটে নাই। আকাশে দিগন্ত থেকে দিগন্ত বিস্তৃত মেঘ রয়েছে। এলোমেলো বর্ষার বাতাস বইছে। বইছে প্রবল বেগেই। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশের মেঘের ঘন আবরণের ছায়ায় চামড়ার মতো পুরু হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যেন সে-অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে শুধু অসংখ্য লক্ষ লক্ষ জোনাকির জ্বলা আর নেভা। জ্বলছে আর নিভছে।

মধ্যে মধ্যে কোন দূর দিগন্তে মেঘ চমকাচ্ছে। তার ক্ষীণ আলোয় পারিপার্শ্বিকের একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ঘন অরণ্য-ভূমির মধ্যে একটি পথ।

মৃদু গম্ভীর মেঘগর্জন উঠছে পরপর। কিন্তু অবিরাম উঠছে গাছের সঙ্গে বাতাসের মাতনের শব্দ। ঝর-ঝর, ঝর-ঝর, ঝর-ঝর। তার সঙ্গে ব্যাঙের উল্লাস-কলরব যুক্ত হয়ে একটি যেন একতানের শব্দ। ঠিক তালে তালে বেজে চলেছে। -ঠাৎ একটি প্রবল বিদ্যুৎ চমকে উঠল—অরণ্যভূমির মাথার উপর। আলোয় আলো হয়ে গেল বনভূমি; সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে দেখা গেল চারিদিক।

দুপাশে ঘন শালবনের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে একটি সুগঠিত পথ। সেই পথ ধরে দূরে চলেছে একটি মানুষ। চলছে নয়—দীনু ডাকহরকরা ডাক নিয়ে ছুটছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে বাজছে লাঠির ডগার ঘণ্টা ঘুঙুরের ঝুন-ঝুন শব্দ। আরও দেখা গেল, বাতাসে শালবন দুলছে।

আলো নিভে গেল। ঘনতর হয়ে উঠল অন্ধকার। উচ্চ মেঘগর্জন উঠল।

অন্ধকারের মধ্যে আবার জ্বলতে লাগল জোনাকি। ব্যাঙের ডাকের ডাকের সঙ্গে বাতাসের মাতামাতি প্রকট হয়ে উঠল। বেজে চলল, ঝুন-ঝুন শব্দ।

এইবার বাঁকের মাথায়—যে মুখে দীনু চলেছে তার আগে—বিপরীত দিক থেকে বাঁকের গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাথায় মাথায় ধুমকেতুর পুচ্ছের মতো দীর্ঘ আলোর ছটা জেগে উঠল। ওপার থেকে কোনো মোটরকার আসছে। তার হেড-লাইট স্পট-লাইটের আলো শিখা বিস্তার করে এগিয়ে আসছে। মোটর দেখা যাচ্ছে না।

মিনিটখানেক পরেই মোটরখানা বাঁকে মোড় নিয়ে সোজা এগিয়ে এল। দেখা গেল আলো। রাজপথ, দুপাশের জলসিক্ত অরণ্যভূমি চারিপাশের অন্ধকার বেষ্টনীর মধ্যে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীনু ডাকহরকরাও স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে ছুটছে। পিছন দিক হতে অদ্ভুত লাগছে তাকে।

মোটরে আসছেন ডাক্তারবাবু।

হুডওয়ালা টুরারবডি মোটরটা এগিয়ে দীনুর কাছাকাছি এসে বারেকের জন্য মন্থর হল। এই দুর্যোগের মধ্যে এমন করে কে যায়?

দীনুকে স্পষ্ট দেখা গেল।

পেশী-সবল কালো মানুষটি। মাথায় একটা ছোট টোকা। ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। পরনে মালকোঁচা সেঁটে কাপড় পরা। হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত খালি। কাঁধে একটা লাঠির সঙ্গে ডাকের ব্যাগ বাঁধা রয়েছে, লাঠির ডগায় বাঁধা দুটি ঘণ্টা, লাঠিতে লাগানো একটি বল্লমের ফলা। হাতে রয়েছে একটি লণ্ঠন।

মোটরের আলো চোখে পড়তেই সে রাস্তার পাশে সরে গিয়ে চলতে শুরু করল ঈষৎ মন্থর গতিতে।

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন—কে?

দীনু চলতে চলতেই উত্তর দিল—ডাকহরকরা, সরকার বাহাদুরের ডাক।

—কে, দীনু?

দীনু গাড়ির পিছন দিক থেকে উত্তর দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। কে? ডাক্তারবাবু?

বলতে বলতেই সে অন্ধকারের মধ্যে যেন মিশে গেল।

ডাক্তারবাবু আবার গাড়িখানার গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন। গাড়ি চলতে লাগল—দুপাশের শালগাছের ভিজে পাতায় হেড-লাইটের তীব্র আলো পড়ে ঝকমক করে উঠল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পড়ল গিয়ে আলো। ঊর্ধ্বাকাশে খানিকটা দূর পর্যন্ত শূন্যলোকে আলো যেন ভাসতে ভাসতে চলল। তার ওপারে নিঃসীম অন্ধকার। অন্ধকার চিরে দু-একবার মেঘে দূরান্তের বিদ্যুচ্ছটা ভেসে গেল। কিছু দূর গিয়েই আর-একটা বাঁক, সেখানে ডাক্তারের গাড়ি মোড় নিচ্ছে এমন সময় একটা চিৎকার শোনা গেল।

অ্যা—ও,—খবরদার!

ডাক্তার গাড়ির ব্রেক টিপে ধরলেন।

আবার চিৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠল—খবরদার। ডাক। সরকার বাহাদুরের ডাক!

ডাক্তার গাড়ি থেকে মুখ বের করে পিছন দিকে তাকালেন।

ওপাশ থেকে দরজা খুলে নেমে পড়ল ড্রাইভার। সে দেখলে পিছনের দিকে তাকিয়ে।

অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

মৃদু বিদ্যুৎ চমকাল। সেই মৃদু বিদ্যুতালোকে ড্রাইভার এবং ডাক্তার

দেখলেন—দূরে দুটি যুধ্যমান ব্যক্তি। কাউকে চেনা গেল না। একজন লোক—সে নিশ্চিতরূপে দীনু; উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। একজন তার কাছ থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। এ-ছবি একটা চকিতের ছবি। ওই বিদ্যুৎ-চমকের মধ্যে দেখা গেল মাত্র। বিদ্যুৎ-চমক মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। অন্ধকারের মধ্যে চিৎকার উঠল। না—না—না। না!

ডাক্তার ড্রাইভারকে বললেন—উঠে এসো গাড়িতে। জলদি।

ড্রাইভার উঠে বসল। গাড়ি ঘুরল। হেড-লাইট পড়ল দূরে যুধ্যমান লোক দুটির উপর। তখন আক্রমণকারী লাঠি উদ্যত করেছে। সে পিছন ফিরে আছে আলোর দিকে। দীনু চিৎকার করে উঠল। ডাকাত! ডাকাত! এর পরই লাঠি পড়ল। দীনুর চিৎকার শোনা গেল—আঃ—!

গাড়ি অগ্রসর হল। লোকটি একবার চেষ্টা করল ব্যাগটা টানতে। কিন্তু গাড়ির আলো এগিয়ে আসতেই ছেড়ে দিয়ে বনের মধ্য দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

গাড়িটা এসে দাঁড়াল।

দীনু উপুড় হয়ে ডাকের ব্যাগ আঁকড়ে পড়ে আছে। তার মাথার পিছন দিকটা ফেটে গেছে। লণ্ঠনটা গড়াচ্ছে।

ডাক্তার টর্চ ফেলে চারিদিক দেখলেন। ড্রাইভার গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা নিয়ে নামল। ডাক্তারও নামলেন। দীনুকে দেখলেন। হাত দেখলেন। বুকে হাত দিলেন। আঘাতটা দেখলেন। বললেন—এঃ, ঘাটা বড় জোর লেগেছে।

ড্রাইভার বললে—কিন্তু ডাকের ব্যাগটা ছাড়ে নি।

ওকে ফার্স্ট এড দেওয়া দরকার। চারিদিকের বন ও অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেখে বললেন—কিন্তু এখানে আর নয়! দলে নিশ্চয় একজন ছিল না। বনের মধ্যে সরে নিশ্চয় লুকিয়ে আছে। আমাদের দুজন দেখে আবার আসতে পারে। তুমি ওদিকে ধরো। আমি এদিকে।

ধরলেন দুজনে। দীনুকে তুললেন—দীনুর বুক আঁকড়ে ধরা ডাকের ব্যাগটা উঠতে চাইল। ডাক্তার টেনে ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর গাড়িতে তুললেন।

গাড়ি এসে উঠল সদর হাসপাতালে।

ডাক্তার নেমে ভিতরে গিয়ে সর্বাগ্রে টেবিলে বসে খসখস করে চিঠি লিখে ফেললেন।

ড্রাইভারকে ডাকলেন—শম্ভু!

শম্ভু এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে ব্যাগটা রেখে গেল।

এই চিঠি নিয়ে তুমি এখুনি থানাতে যাও। চিঠি দিয়ে এসো। বোলো—আমি দীনুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। আঘাতটা জোর বলেই মনে হচ্ছে। ওঁদের এসে ব্যাগটা দেখে নিতে বোলো। পোস্টাপিসে খবর ওরাই দেবেন।

শম্ভু চিঠি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার বের হলেন—বিপরীত দিকের বারান্দায়। তার আগে খুলে ফেললেন কোটটা। আস্তিন গুটিয়ে নিতে নিতে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে যাবার সময় দরজা বন্ধ করলেন চাবি দিয়ে।

বারান্দায় বেরিয়ে ডাকলেন—রামলাল!

রামলাল এসে দাঁডাল। ডাক্তাব বললেন—তুমি এই দরজায় পাহারা থাকো। খুব সাবধান!

ওদিকে স্ট্রেচারে দীনুকে বয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালের লোকেরা। ডাক্তার তাদের অনুসরণ করলেন।

ওপাশ থেকে মোটরের শব্দ হল। দেখা গেল শম্ভু মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এদিকে দেখা গেল টেবিলের উপর দীনুকে শোয়ান হয়েছে।

ডাক্তার হাত ধুয়ে হাত মুছলেন।

তখন ইলেকট্রিক হয় নি মফস্বলে। জোর টর্চের আলো ফেলা হল ক্ষতস্থানে। ক্ষতটা বেশ গভীর। চাবিপাশের চুল তখন কাটা হয়ে গেছে। ডাক্তার দেখলেন ভালো করে। তারপর হাতে নিলেন সার্জারির যন্ত্র।

সেই মুহূর্তে—বাইরে একটা বজ্রপাতের মতো মেঘগর্জন ধ্বনিত হয়ে উঠল।

বাইরে তখন প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। ঘন ঘন বিদ্যুচ্চমকের মধ্যে বর্ষণ দেখা যাচ্ছে। গাছপালার বাতাসের মাতনের শব্দ উঠছে। তারই মধ্যে পড়ে আছে নিথর বারান্দাটা। ডাক্তার দীনুর প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ করে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। বর্ষণমুখর মেঘ ও অন্ধকাবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখের উপর বারেকের জন্য ভেসে উঠল—দীনুর সংগ্রামরত মূর্তি। বিদ্যুতালোকে দেখেছিলেন—একটা লোক লাঠি মারতে উদ্যত হয়েছে দীনুর মাথায়। দীনু উপুড হয়ে পড়ে আছে।

একজন নার্স এল।

বললে—ওর জ্ঞান হচ্ছে ডাক্তারবাবু—

—জ্ঞান হচ্ছে? ডাক্তার ঘুরলেন। দ্রুত এসে ঘরে ঢুকলেন।

দীনু তখন চিৎকার করছে—না—না—না!

ডাক্তার এসে পাশে দাঁড়ালেন, বললেন—দীনু, দীনু—ভয় নেই। দীনু!

—অ্যা—

—ভয় নেই, তারা পালিয়েছে। তুই হাসপাতালে রয়েছিস। দীনু!

—এঁ্যা ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ, আমি তোর চিৎকার শুনতে পেয়েছিলাম—

—আপনি বাঁচালেন আমাকে?

—হ্যাঁ। আমি গাড়ি না ঘোরালে তোকে ওরা মেরে ফেলতো!

—আমার ব্যাগ? সরকারী ডাক?

—আছে। সে নিতে পারে নি। ওঃ, যে জোরে আঁকড়ে ধরে ছিলি—!

দীনু আশ্বাসের সঙ্গে বললে—আঃ।

—তুই এখন ঘুমো। ঘুমের ওষুধ দেবে। এখন আর নয়।

—ডাক্তারবাবু!

—কী?

—তাকে ধরেছেন?

—কাকে?

—সেই—

—ও—সেই ডাকাতকে? না। ধরব কী করে? সে পালিয়ে গেল। গাড়ির আলো ঘুরতেই তোকে ছেড়ে বনের মধ্যে ছুটে চলে গেল। ওদের কি শুধু হাতে ধরা যায়? ভালো করে দেখতেই পেলাম না। ছায়াবাজীর মতো, ভোজবাজীর মতো মনে হল।

দীনু স্থির দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। আঘাত তার মাথার পিছনে। সে কাত ফিরে শুয়ে ছিল।

ডাক্তার একজন নার্সকে বললেন- ওকে বেডে নিয়ে যাও। ওষুধটা খাইয়ে দাও।

দীনু ডাকলে—ডাক্তারবাবু!

—কী?

—আমার কী হবে ডাক্তারবাবু? পুলিস—(কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল—দরদর ধারায় তার চোখ থেকে জল নেমে এল।)

ডাক্তার হেসে বললেন—কী হবে? তুই যে কাজ করেছিস তাতে সরকার তোকে পুরস্কার দেবেন রে। আমি সাক্ষী। ওঃ, তুই বীরের মতো লড়াই করেছিস। বুক দিয়ে মেলব্যাগ যেভাবে তুই ঢেকে ছিলি—এক মানুষ নিজের ছেলেকে ওইভাবে রক্ষা করতে পারে বুক দিয়ে ঢেকে।

দীনু হা-হা করে কেঁদে উঠল।

বাইরে মোটরের শব্দ হল।

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

এরপর দেখা গেল—আপিস ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন এস. পি., পোস্টাল সুপার, সাবইনস্পেক্টর পুলিস, পোস্টাপিসের লোক। ডাক্তারও রয়েছেন।

এস. পি. মেল ব্যাগের শীল পরীক্ষা করে দেখছেন!

পোস্টাল সুপার পাশ থেকে দেখে বললেন—সীল ভাঙে নি। ঠিক আছে।

ডাক্তার বললেন—ডাকাতদের তো ব্যাগ ছুঁতে দেয় নি দীনু। বুক দিয়ে ঢেকে পড়ে ছিল। মাথায় লাঠি পড়ল, তাতেও না। তখনও চীৎকার করছে—সরকার বাহাদুরের ডাক। খবরদার—। আমি গাড়িটা ফেরালাম। হেড লাইটের আলো পড়তেই—

এস. পি. পরীক্ষা শেষ করে ব্যাগটা নামিয়ে দিয়ে ডাক্তারের কথার মাঝখানেই বললেন—আপনার স্টেটমেণ্ট পরে নেব ডাক্তারবাবু। এরপর পোস্টাল সুপারকে বললেন—ব্যাগটা কেটে দেখুন। অন্তত ক্যাশ ব্যাগটা দেখুন, ঠিক আছে কিনা। ব্যাগের মধ্যে ক্যাশ স্টেটমেণ্ট নিশ্চয় আছে। কাটুন।

এস. পি. বেরিয়ে এলেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল আর-একজন সাবইনসপেক্টর ও কজন কনেস্টবল। কম্পাউণ্ডে ডাক্তারের এবং এস পি.-র মোটর। এস. পি সিগারেট ধরালেন। বললেন সাবইনস্পেক্টরকে—তুমি ডাক্তারের ড্রাইভারকে নিয়ে চলে যাও যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে—সেখানে মোতায়েন থাকো। কোনো কিছু নাড়াচাড়া না হয়।

সাবইনস্পেক্টর স্যালুট করে বললে—ইয়েস সার।

—ডাক্তারের ড্রাইভারকে নিয়ে যাও।

তখন সকাল হয়ে এসেছে। বর্ষণ ক্ষান্ত হয়েছে। টিপিটিপি মৃদু দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।

তারই মধ্যে হাসপাতালের আউট হাউস থেকে জমাদার-জমাদারনীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কারও হাতে ঝাঁটা। কারও হাতে বেডপ্যান।

দুটো উলঙ্গ ছেলে—একটা গর্তের মধ্যে জমা জলে লাফিয়ে লাফিয়ে কাদা জলে সর্বাঙ্গ চিহ্নিত করছে।

গাছের ডালে কাক বসেছে। ডাকছে। গাছের পাতা থেকে জল পড়ছে নিচে টপটপ করে।

গেটের ধারে একদল লোক জমেছে। বিস্মিত হয়ে দেখছে আর ভাবছে—হাসপাতালে পুলিস কেন?

পুলিস সুপার সিগারেট টানছেন—মধ্যে মধ্যে হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে জুতোর ডগার কাদা ছাড়াচ্ছেন।

পোস্টাল সুপার চামড়ার ক্যাশব্যাগ একখানা ইনসিওর্ড খাম হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন—বোধ হয় এইটের লোভে মিস্টার চৌধুরী, দি অ্যাটেম্প্ট ওয়াজ মেড। হাজার টাকার ইনসিওর। ব্যাগে টাকা সামান্যই ছিল—আড়াই শো। এভরিথিং ইজ্ ইনট্যাক্ট।

—ইয়েস্। দেখলেন এস. পি.।

ইতিমধ্যে গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া হল। এস. পি. হাত তুলে রওনা হতে বারণ করলেন।

পোস্টাল সুপার বললেন—হি হাজ্ সেভ্ড্ ইট্। ইয়েস্, হি হাজ সেফ্ড্ ইট্—ওকে আমি—

চলে যেতে উদ্যত হলেন। এস পি. বাধা দিলেন। নট্ নাউ, ওকে একটু সুস্থ হতে দিন।

আগে চলুন Place of occurrence-টা দেখে আসি।

তাঁরা গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি রওনা হয়ে গেল।

হাসপাতালের বারান্দা দিয়ে স্ট্রেচারে দীনুকে বয়ে নিয়ে হাসপাতালের বেডে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হল।

দীনুর চোখের সামনে অন্ধকার রাত্রির বর্ষণসিক্ত অরণ্য ভেসে উঠল।

ঘুমের ওষুধের নেশায় সে-ছবি এঁকেবেঁকে তালগোল পাকিয়ে গেল যেন। চোখ বন্ধ হয়ে এল।

নার্স একজন হাওয়া করছিল।

ওদিকে ঘটনাস্থলে গাড়িখানাকে দেখা গেল।

শম্ভু দেখালে ঘটনাস্থলটি।—ঠিক এইখানটায় স্যার। হ্যাঁ এইখানটায়। অনেকটা রক্ত পড়েছিল। বোধ হয় জলে ধুয়ে গেছে। তারা এই দিক দিয়ে বনে ঢুকে গেল আমাদের লাইট দেখে।

রাস্তা বেয়ে তখনও জল চলে যাচ্ছে।

এস. পি. তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলেন। পড়ে আছে শুধু লণ্ঠনটা। এবং মাথার ভাঙা টোকাটা।

বনের মধ্যে ঢুকলেন। সব চিহ্ন জলে ধুয়ে গেছে।

আবার ঘুরে এলেন ঘটনাস্থলে। লাঠির ডগা দিয়ে একটা জায়গায় জমে-

থাকা জলের বেরিয়ে যাবার পথ করে দিলেন। বেরিয়ে পড়ল—দুটি হাঁটুর ছাপ, দুটি-হাতের ছাপ।

দীনু যে উপুড় হয়ে ডাকের ব্যাগ আঁকড়ে পড়ে ছিল—এই তো! যে লোকটা লাটি মেরেছিল, সে ছিল এই দিকে—বনের ধার দিয়ে।

ঝুঁকে পড়লেন এস. পি.। সঙ্গে সঙ্গে S. I.। Postal Super-ও ঝুঁকে পড়ে দেখলেন।

S. P. বললেন—হুঁ। বুক দিয়েই জড়িয়ে ধরে রক্ষা করতে চেয়েছিল বটে। লোকটা প্রাণ দিয়ে লড়েছে। Yes, He is a brave man—

বিকেল বেলা—মেঘ তখন কেটে এসেছে। আকাশে কাটামেঘ এবং সূর্যালোকের সমারোহে আলোছায়ার খেলা। সেই খেলার ছায়া এসে পড়েছে তখন বিছানায় শায়িত দীনুর মুখের উপর। একদিকে Postal Super—। মাথার ধারে টেবিলের উপর ফল সাজিয়ে রেখে Postal Super বললেন—চিনতে পারছ আমাকে?

দীনু সভয়ে বললেন—হুজুর। হাত তুলে সেলাম করতে চেষ্টা করলে।

—থাক। তুমি ভালো হয়ে ওঠো। শিগ্‌গির ভালো হয়ে উঠবে—কোনো ভয় নেই।

হ্যাঁ হুজুর।

—খুব বাহাদুর তুমি! খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছ। সরকার তোমার উপর খুব খুশী হয়েছে। এর জন্যে তুমি রিওয়ার্ড পাবে। আমি লিখব।

দীনুর ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপতে লাগল। উত্তর দিতে পারলে না সে। অথবা দিলে না।

সাহেব Postal Super প্রশ্ন করলেন—কতজন ছিল তারা?

—আজ্ঞে?

—ডাকাতদের কথা জিজ্ঞাসা করছি।

সভয়ে অস্পষ্ট ভাবে বললে, ডা-কা-ত-রা?

—হ্যাঁ, কতজন ছিল তারা? কাউকে চিনতে পেরেছিলে?

অন্ধকারের মধ্যে হলেও খুব কাছে এসেছিল তো তারা?

বিহ্বলের মতো দীনু কাঁদতে লাগল।

—কাঁদছ কেন? কেঁদো না।

আমাকে মেরে ফেলাইতো হুজুর—মরে যেতাম আমি—

—না—না—না। তুমি শিগ্‌গির ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা তুমি ভাবো,

ভেবে দেখো,—যদি কারুর মতো মনে হয়—মনে করো। আমি আবার আসব। ফলগুলি তুমি খেয়ো। আবার আসব আমি।

সাহেব উঠলেন।

দীনু স্থির দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে পশ্চিমাকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ শান্তভাবেই বলে উঠল—হুজুর!

সাহেব ফিরলেন।—কিছু বলবে?

—হ্যাঁ, হুজুর। শান্ত ভাবেই সে জানালার দিকে চেয়ে কথাগুলি বললে।

—বলো, কি বলবে বলো!

এবার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। অতিকষ্টে বললে—হুজুর!

Postal super প্রতীক্ষা করলেন করলেন কয়েক মুহূর্ত—তারপর বললেন—বলো, কি ইচ্ছে হচ্ছে বলো?

আত্মসংবরণ করে দীনু বললে—'হুজুর, আমার ছেলে—'

চোখ দিয়ে জল গড়াল। সূর্যালোক প্রখর দীপ্তিতে মুখের উপর পড়ল দীনু মুখ ফেরালে।

সুপার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে জানালার ঘষা কাচের দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন—তোমার ছেলেকে দেখতে চাও?

অন্ধকার ছায়ার মধ্যে দীনু বললে—হ্যাঁ হুজুর। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

—বেশ তার জন্যে কী? আজই তোমার পোস্টাপিসের মাস্টারবাবুর কাছে তার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দীনুর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

সাহেব কাছে এলেন। হেসে বললেন—কাঁদছ কেন?

দীনু বললে—হুজুর!

সাহেব হাতের ফাইলখানা দেখিয়ে বললেন—এতে পড়ছিলাম; —এটা তোমার ফাইল, তোমার চাকরির গোড়া থেকে এ পর্যন্ত সব কথা লেখা আছে। পড়ছিলাম—তুমি ভয়ানক সাহসী লোক। মস্ত লাঠিয়াল। ভূত প্রেত ডাকাত কাউকে ভয় কর না। নবগ্রামে পোস্টাপিস হবার পর যখন পথে সুঁদীপুরের বটতলায় ভূতের ভয়ে ঠ্যাঙাড়ের ভয়ে রানার পাওয়া যায় নি—তখন ওখানকার জমিদারবাবুরা তোমাকে দিয়েছিলেন। আজ পনেরো বছর তুমি ডাকহরকরার কাজ করছ, জলে ঝড়ে—কোন কিছুতে এক দিন তোমার পাঁচমিনিট দেরি হয় নি। আজ তুমি ডাকাতের হাত থেকে সরকারী ডাক বাঁচিয়েছ—আঘাত

পেয়েছ কিন্তু সে তো খুব বেশী নয়। ক-দিনের মধ্যেই সেরে যাবে। তুমি কাঁদছ কেন?

দীনু স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল—

মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল তার অতীত দিনের কথা:

পনেরো বছর আগে—

নবগ্রামের খড়োচাল মাটির ব্রাঞ্চ পোস্টাপিস। কাঠের খুঁটি দেওয়া মেটে বারান্দা। সেই বারান্দায় বসে আছেন গ্রামের চার পাঁচ জন ভদ্রলোক, পোস্টাল ইনস্পেক্টর, দাঁড়িয়ে আছেন পোস্টমাস্টার, ওভারসিয়ার, পিওন এবং বারান্দার নিচে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পনেরো বছর কম বয়সের দীনু। দেওয়ালে একটা নোটিশ-বোর্ড, একটা নোটিশের মাথায় লেখা—1924—March।

প্রবীণ দাশরথিবাবু—সম্ভ্রান্ত সৌম্য চেহারা—তিনি বললেন—এ কাজ তোকে নিতে হবে দীনু। গ্রামের মান রাখতে হবে। সুঁদীপুরের বটতলার ভয়ে রাত্রে ডাক যায় না—তার জন্যে ডাক যেতে একদিন দেরি হয়, পেতে একদিন দেরি হয়—এতে গ্রামের অসুবিধে সঙ্গে সঙ্গে দুর্নাম। আমি জানি তুই পারবি।

দীনুর মনশ্চক্ষের সামনে বাবেকের জন্য অন্ধকার রাত্রিব সুঁদীপুরের বটতলা এবং অরণ্যঘন পথখানি ভেসে উঠল। বটগাছের ডাল দুলতে থাকে।

এই দৃশ্যের মধ্যেই দাশরথিবাবুর কথা শোনা গেল। তিনি বলেই চলেছিলেন—ও পাববে ইনস্পেক্টর বাবু। এই তো সেদিন আমার বড়ছেলেকে তার করবার জন্য রাত্রি আটটার সময় পাঠালাম বোলপুরে এখান থেকে, রাত্রি তিনটে না বাজতে ফিরে এল—তার করে তার রসিদ নিয়ে। ও আমার কৃষাণের ছেলে। লাঠিয়াল হয়েছে, কিন্তু সৎলোক—দাঙ্গা করতে পারে না। ধমকে ভয় করে—চোর ডাকাতদের ছায়া মাড়ায় না। যমকেও ভয় করে না। পাউড়েও খুব।

পথের দৃশ্য মিলিয়ে গেল—দীনু বাস্তবে ফিরে এল।

ইনস্পেক্টর প্রশ্ন করলেন—পাউড়েও খুব? তার মানে?

—ও। পাউড়ে মানে—পা যার উড়ে চলে ইনস্পেক্টর বাবু। মানে খুব জোরে হাঁটতে পারে। আমার ছেলে একবার মহলে ছিল—এখান থেকে পাঁচ কোশ রাস্তা—জরুরী খবর নিয়ে যেতে হবে—আবার ফিরতে হবে সঙ্গে সঙ্গে; মানে এক নাগাড় দশকোশ বিশ মাইল—তা দীনু চার ঘণ্টায় গিয়ে ফিরে এসেছিল।

—মানে ঘণ্টায় পাঁচ মাইল! বাঃ! দীনু মাথা নিচু করে বসে মাটির উপর খোলামকুচি দিয়ে দাগ কেটে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময় পোস্টমাস্টারের মেয়ে আট দশ বছর বয়স—সে ঘরের ভিতর থেকে উঁকি মেরে বলল—বাবা! চা তৈরী হয়েছে। আনব?

মাস্টার ঘুরে তাকিয়ে বললেন—আনো।

মেয়েটি চলে গেল।

মাস্টার পিওনকে বললেন—ফেলবে হয়তো। তুমি গিয়ে নিয়ে এসো।

পিওন ভিতরে চা আনতে চলে গেল।

দাশরথিবাবু ইনস্পেক্টরের কথার উত্তরে বললেন—ওকেই এ্যাপয়েন্ট করুন; ওর জন্যে দায়ী থাকতে হলে আমি থাকতে রাজী আছি। ডাকাত ঠ্যাঙাড়ে সেকালে ছিল একালে নাই। ভয়টাই আছে। কিরে দীনে, ডাকাতের ভয় আছে না কি? মানে, পথে রাহাজানির—?

দীনু নত মুখেই একটু হেসে বললে—আজ্ঞে না। সি-সব আর কোথা পাবেন? সে কালও নেই সে মানুষও নাই। তবে ওই দু-চার জনা আছে একলা-দোকলা দুব্যল ভালোমানুষ পেলে—চড়-চাপড়টা মেরে ভয় দেখিয়ে পুটুলী-মুটুলী কেড়ে-কুড়ে নিয়ে পালায়। তাও দিনে-দুপুরে। রেতে-বিরেতে নয়। সি-সব দানা দত্যির মতো মানুষগুলান ফৌত হয়ে গিয়েছে। একেবারে নিব্বংশ। পাপ করে কি কেউ বাঁচে? বাঁচে না!

—তা হলে তুমি পারবে বলছ? ইনস্পেক্টর বললেন।

এরই মধ্যে পিওন কাঁসার থালার উপর বসিয়ে চায়ের কাপ নিয়ে এল। পোস্টমাস্টার সেগুলি এগিয়ে দিলেন।

দীনু উত্তর দিলে—হুজুরদের হুকুম হলে পারব না ক্যানে? পারব।

—ভূত প্রেতের ভয়?

ফিক করে হেসে দীনু বললে—ভূত কোথা হুজুর? উ-সব নষ্ট-দুষ্ট মেয়ে পুরুষের কাণ্ড!

—ভূত বিশ্বাস কর না তুমি?

—রাম রাম বলতে বলতে চলে যাব হুজুর।

—বুঝে দেখো। সন্ধ্যের সময় এখান থেকে রওনা হয়ে বোলপুর পৌঁছতে হবে এগারোটার মধ্যে। আবার সেখান থেকে বেরুতে হবে তিনটের পর, এখানে পৌঁছুতে হবে ছটার মধ্যে। পারবে? ইতিমধ্যে চা খেয়ে শেষ করে কাপ নামিয়ে দিলেন। এবং সিগারেট কেস বের করে দাশরথিবাবুর সামনে ধরলেন।—নিন।

দীনু বললে—তা পারব বইকি। এই তো বোলপুর! হামেশাই যেছি আর আসছি!

সিগারেট ধরিয়ে ইনস্‌পেক্টর বললেন—সরকার বাহাদুরের ডাক। টাকা পয়সা ইনসিওর, রেজিষ্ট্রি। কত লোকের কত চিঠি। জল হোক ঝড় হোক—তোমাকে ডাক নিয়ে পৌঁছুতে হবে।

—তা ঠিক পঁহুচে দোব হুজুর। ঠিক দোব।

—হ্যাঁ! পৌঁছে দিতে হবে। পথে কোথাও একমিনিট দাঁড়াবে না, বসবে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতে থাকবে না। তুমি নিয়ে যাবে সরকার বাহাদুরের ডাক।

এবার একটু আতঙ্কিত হল দীনু কথাগুলির প্রভাবে। বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাশরথিবাবু বললেন—চোর আসুক ডাকাত আসুক—জান দিয়ে রুখবি হ্যাঁ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইনস্‌পেক্টর বললেন—বিপদের সময় মনে থাকবে তো এ-কথা? তখন ভয়ে ভুলে যাবে না তো? ডাক ফেলে পালাবে না তো?

দীনু হাত জোড় করে বললে—সব বেচে সবাই খায় হুজুর, ধরম বেচে কেউ খায় না, খেতে নাই হুজুর—আমি তা খাব না!

ইনস্‌পেক্টর ওভারসিয়র এবং পোস্ট মাস্টারকে বললেন—তা হলে ওকেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট দাও। আর রুট বদলে—এই পথ দিয়ে ডাক যাক, এবং সন্ধ্যের পর ডাক যাবে আবার রাত্রেই রওনা হয়ে ডাক এনে ভোরে পেঁাছবে। (দীনুর প্রতি) তুমি মাইনে পাবে মাসে পনেরো টাকা। ওভারসিয়ার বাবুর কাছে ফরমে তোমার টিপ ছাপ দাও। পেটী নাও কোট নাও—কেমন? মনে থাকে যেন সরকার বাহাদুরের ডাক বইবার ভার নিলে তুমি।

দীনু সরকারী কোর্তা পরে কোমরে পেটী পাথর ও পাগড়ি বেঁধে কাঁধে ঘুঙুর ঘণ্টা এবং বল্লম পরানো বাঁশের লাঠিটি নিয়ে অহঙ্কৃত ভাবেই নবগ্রামের অল্প কয়েকখানা ছোট কোকানওয়ালা বাজারের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরল।

পথে একটা দোকানের সামনে বাউল হরিদাস আলখাল্লা পরে একতারা বাজিয়ে গান করছিল—দীনু গান শুনে খুশী হল। বাবাজী একতারা হাতে সমবেত জনতার কাছে পয়সা চেয়ে ফিরতে ফিরতে দীনুর কাছে এসে দাঁড়াল। পাগড়ি কোর্তা পরা দীনুকে সে দীনু বলে চিনতেও পারে নি। চিনতে পেরে সবিস্ময়ে বলল—আঁ! দীনু!

দীনু একটি পয়সা বাবাজীর ভিক্ষা পাত্রে ফেলে দিয়ে বললে—হ্যাঁ গো

বাবাজী। চিনতে পারছ না নাকি? মুখের দিকে চেয়ে থেকে বাবাজী বললে—তা পারছি দীনু। এই পোশাক, পেটী কোর্তা পাগড়ি, এঁ্যা! তার উপর নগদ একটা পয়সা দিলি—ওরে বানাস্ রে!

চারিপাশের জনতার মধ্যে থেকে কেউ বললে—ও বাবারে। তাই তো বটে। দীনেই তো বটে! আমি বলি কে সরকারী চাপরাশী-টাপরাশী!

একজন বললে—বন থেকে বেরুল টিয়ে লালগামছা মাথায় দিয়ে!

দীনু ওদের কথা গ্রাহ্য না করেই বললে—চাকুরি পেলাম যে বাবাজী।

—চাকরি!

—হ্যাঁ গো; ডেকে দিলে—

—ডেকে দিলে?

—খাস সরকারী চাকরি! পোস্টাপিসের ডাকহরকরা। মাসে পনেরো টাকা মাইনে। তার ওপর এই কোর্তা পেটী পাগড়ি!

বাবাজী বললে—বলিহারি বলিহারি! পনেরো টাকা মাইনে! তার উপর কোর্তা পেটী পাগড়ী!

বলেই গান ধরে দিল—আহা, লাল পাগুড়ি বেঁধে মাথে

রাজা হলে মথুরাতে—
বাঁশী ছেড়ে দণ্ড হাতে বঁধু হলে দণ্ডদাতা
কলঙ্কিনী রাধায় দণ্ড দিলে মান থাকে কোথা?
লাল পাগুড়ী বেঁধে মাথে—
এখন আমি নালিশ করি—
মাখন চুরি বসন চুরি—
শেষে মন অপহরি—ফেরারী চোর গেল কোথা?
বেঁধে এনে বিচার কর—শুনব নাকো ছল নানাতা।
বঁধু তুমি রাজা হয়ে কেন হলে হায় বিধাতা—

গান শেষ করে হরিদাস তার চিবুকে হাত দিয়ে বললে—তাই জন্যে পয়সা দিলি আমাকে। হরিবোল হরিবোল। ভালো হবে রে তোর ভালো হবে।

একজন বললে—তা হলে এতদিনে নোটন চৌকিদারের কাছে হেঁট মাথাটা তোর উঠল।

দীনু বললে—উঠল মানে? ওর চেয়ে উঁচু হল গো! ও তো চৌকিদার; মাস্টারবাবু বললে—ওর তো ছোট গবরমেণ্টারের চাকরি। আমার চাকরি বড় গবরমেণ্টারের; ভারত গবরমেণ্টারের গো! হাঁ! তবে হ্যাঁ;— চাকরি ওর সুখের বটে। ঘরে শুয়ে শুয়ে জানলা খুলে এ—হৈ—এ—হৈ

বলে হাঁক মেরি চাকরি করা চলবে না। আমার চাকরি বুয়েছেন—সরকার বাহাদুরের ডাক—জল হোক—ঝড় হোক—বাজ পড়ুক—ঠিক সময়ে ডাক পৌঁছে দিতে হবে। আচ্ছা—চলি বাবাজী; আবার উদিকে টিকিস কেটে দেবে। মদের দোকানে গো!

ওদিকে দীনুর বাড়িতে—দীনুর স্ত্রী সদু অর্থাৎ সৌদামিনী দাওয়ায় বসে ভাত রাঁধছে। সেখানে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। মাটির হাঁড়ি মাটির কলসী মাটির ভাঁড় খুরি নিয়ে সংসার। কেবল একটা ঘটি চকমক করছে। চাঁদের আলোয় সেদিন ঝলমলে জ্যোৎস্না। উঠানটার একপাশে একখানা ছোট শাকের ক্ষেত। চারিপাশে বেড়া দেওয়া। একপাশে দুটি বলদ এবং দুটি গাই বাঁধা। এরা বসে রোমন্থন করছে।

একটু দূরে কোথাও থেকে শব্দ আসছে ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। একটু দূরেই একটা খোলা জায়গায় আট ন-বছরের ছেলে নিতাই এবং ক-জন পাড়ার ছেলে বাখারীর লাঠি নিয়ে লাঠি খেলছে তারই শব্দ ওগুলি।

দীনুর স্ত্রী রান্না ছেড়ে দাওয়ার প্রান্তে এসে দাঁড়াল।

চালের বাতা ধরে একটু ঝুঁকে ডাকলে—চিৎকার করেই ডাকলে—নেতা-ই। নে-তাই রে! আরে—অ নে—তা—ই।

উত্তরে এল শুধু ঠক্—ঠক্ শব্দ।

দীনুর স্ত্রী নামল উঠানে। আবার ডাকলে—নে—তা—ই!

উত্তর এল। ওই অবিশ্রান্ত ঠক্ ঠক্ শব্দের মধ্যেই উত্তর এল—কী!

—বলি করছিস কী? শুনে যা!

—লারব এখন। সময় নাই!

—সময় নাই লয়, শুনে যা!

—আমি যাব না—। এ্যাই ও! (ধমকটা দিল তার খেলোয়াড়কে)—

—তবে রে হারামজাদা—বজ্জাত—

বলতে বলতে সে এগিয়ে এল—এবার লাঠি খেলোয়াড়দের দেখা গেল। নগ্নকায় খাটো কাপড় মালকোছা মারা ছেলে কয়েকজন বেশ দক্ষতার সঙ্গে লাঠি খেলছে।

অ্যাই—ও। অ্যাই ও।

হ্যাই। হ্যাই। হ্যাই!

সঙ্গে সঙ্গে ঠক্ ঠক্ ঠকা ঠক্ ঠকাঠক্ লাঠিতে লাঠিতে সংঘর্ষ চলছে।

সদু-বউ এসে দাঁড়াল এবং ডাকলে—নেতাই। খেলা রাখ।

নেতাই উত্তর না দিয়ে খেলেই গেল—এবং প্রতিপক্ষের লাঠিতে ঘা মারার সঙ্গে হাঁক মেরে গেল—

হ্যাই লে। হ্যাই লে! হ্যাই হ্যাই হ্যাই। হ্যাই ও। হ্যাই—

প্রতিপক্ষ পিছন হঠছিল।

সদু কঠোর কণ্ঠে ডাকলে—নেতাই! ওরে হারামজাদা—

—ক্যানে রে হারামজাদী! হ্যাই ও। বলে—ঘুরে এসে নিজের কোটে দাঁড়াল।

—লাঠি রাখ শোন!

—না। না। না। ভাত এখন খাব না। যা!

—মেরে তোর হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করব বলছি। তোর বাবা এখনও আসে নাই—সেই যেয়েছে। বাবুদের লোক ডেকে নিয়ে যেয়েছে। দেখে আয় একবার।

—যেয়েছে আসবে। আমি এখন যাব না, যা।

—ওরে মুখপোড়া. চাপরাসী বলে গেল সরকারী হাকিম্ ডেকেছে। সরকারী হাকিম ডেকেছে, এতক্ষণ হয়ে গেল—দেখে আয়—

—পারব না আমি, সি মরুক গো!

—কি বললি? মরুক গো? তু মর।

—তু মর! তু মর! তু মর!

এর প্রতিক্রিয়ায় অন্য ছেলেগুলি থেমে গেল। একজন বললে—য্যা ক্যানে নেতাই। মা ডাকছে। কাল খেলব আবার।

নেতাই ক্রুদ্ধ ভাবে একমুহূর্ত মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে উল্টোমুখে হাঁটতে লাগল। সদু মনে করলে সে তার বাপের খোঁজে চলেছে। সে বললে—বাবুদের বাড়ি দেখবি। সেখানে না-পাস তো একবার তালশালে যাস—

নেতাই মুখ ভেঙিয়ে দিল—অ্যাই—অ্যাই—অ্যাই

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ওদের বাড়ীর দিক থেকে কারুর ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল—এ সদ্দ্ বহু! দীনবন্ধুকে পরিবার! এ—

সদু চমকে উঠল। নিতাই থমকে দাঁড়াল।

আবার হাঁক এল—এ নেটাইচরন—দীনাকে লড়কা

সদু ছেলের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—কে রে? ও নেতাই, পশ্চিমার লোকের মতো কে ডাকছে রে? পুলিস-মুলিস না ক্যারে?

নিতাই এবার ফিরল। এবং হাঁকলে—কে বটে হ্যায়?

আসলে ডাকছিল দীনু। তার একটু মদের নেশা লেগেছে। বাড়ির

উঠানের ধারে দাঁড়িয়ে ওই পাগড়ি পেটী কোর্তার সুযোগ নিয়ে হাতের বল্লম ও ঘণ্টাওয়ালা লাঠিটা ঠুকে কণ্ঠস্বর বিকৃত করে স্ত্রী পুত্রকে সানন্দ কৌতুক দেখাচ্ছে।—

—এ সদ্দ বহু। এ দীনুকে লড়কা। এ হারামজাদে!

ওপাশে উঠানের প্রান্তে দাঁড়াল এসে মা ও ছেলে।

নেতাই প্রশ্ন করলে—তুমি কে হ্যায়?

দীনু উত্তর দিলে—সরকারী লোক হ্যায়। গবরমেণ্টারকে লোক! চলো। তুম লোক কো যানে হোগা।

সদু চুপিচুপি ছেলেকে বললে—বল, বাবা বাড়িতে থাকতা নেই। বাবা আসে গা তখন আও!

নেতাই সে-কথা বলবার আগেই দীনু বললে—নেহি, নেহি! সরকারী হুকুম হ্যায়, তুম লোক—মা বেটাকে ডাকঘরকে থলিয়াকে ভিতর বন্ধো করকে চালান করে গা।

—চালান করে গা? কাহে ক্যানে?

—তোমার স্বামীকে চাকরি হুয়া—হ্যাঁ—ডাকহরকরাকে চাকরি—। এর পর সে হা-হা করে হেসে ফেললে।

এবার ছেলেটা ছুটে এসে বাপের পাগড়ির লেজটা ধরে টেনে খুলে ফেললে—এবং চিৎকার করে উঠল—ওটে মা-টে—বাবা-বাবা। বাবা পাগড়ি বেঁধে চলে এয়েচে!

দীনুর হাসি বেড়ে গেল। ছেলেকে সে কোলে তুলে নিলে। হাসতেই লাগল—হা-হা-হা—হা—হা—হা!

এবার সদু এগিয়ে এল—গালে হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বললে—অ মা-গো! ই সব কী গো? এঁ্যা?

—এই সব? কোর্তা?

—হ্যাঁ। তা পারতে ইটো কী? কোমরে?

—পেটী। পেতলের ইটো দেখেছ? খোদাই করা দেখেছ? এই দেখ।

এবার স্ত্রীর হাত ধরে দাওয়ায় প্রায় টেনে এনে কেরোসিনের ডিবেটা পেটীর সামনে ধরলে।

—দেখেছ? নেকা রয়েছে খোদাই করে?

—হ্যাঁ গো! কী নেকা রয়েছে গো?

—ডা-ক-হ-র-ক-রা। গবরমেণ্টারের লোক!

—ই তুমি পেলে কোথা?

—হু—হু ! যথাসাধ্য হরিদাস বাউলের গান নকল করে গাইলে—

আহা ! লাল পাগুড়ি বেঁধে মাথে—আজা হলাম মথুরাতে—

বাঁশী ছেড়ে দণ্ড হাতে—

যা-ছাই ভুলে গেলাম। এ্যাই এ্যাই—ই ছোঁড়ার কাজ দেখ দি-ই নি! পাগুড়িটা নিয়ে কি করে দেখ ! ধুলো লাগছে। ধুলো লাগছে।

নিতাই বাপের পাগড়িটা নিয়ে মাথায় বাঁধছিল। একটা পাশ লুটাচ্ছিল ধুলায়। সেই দেখে ছুটে গেল দীনু এবং পাগড়িটা কেড়ে নিল।

—ওঁরে বাবা ! এ গবরমেণ্টারের জিনিস। সব্বনাশ সব্বনাশ। এখুনি জরিমানা হবে আমার আর তোকে ধরে নিয়ে যাবে। সব্বনাশ !

—না। ওমুনি পাগুড়ি আমি লোব। না।

—কিনে দোব। ছোট মতন কিনে দোব। এ ছুতে নাই।

—এখুনি। এখুনি লোব আমি। না !

—এই দেখ। ক্ষ্যাপা ছেলের ক্ষ্যাপামি দেখ। আজ কোথা পাব। মাইনে পাই কিনে দোব। শোন শোন, সরকার বাহাদুরের ডাকঘরের নেসপেক্টর সাহেব নিজে ডেকে আমাকে ডাকহরকরার চাকরি দিলে। মাসে পনের টাকা মাইনে। শুধু রেতে ডাক নিয়ে যাব বোলপুর। আবার রেতেরেতেই ডাক নিয়ে ফিরে চলে আসব। বুঝলি ! দিনে একবেলা খাটব একবেলা ঘুমোব। বুঝলি। এই পেথম মাসের মাইনে পেলেই তোকে একটা কামিজ কিনে দোব —আর লাল শালুক একটা পাগুড়ি কিনে দোব। আর সদুকে—

—না। আজই দে কিনে। আজই লোব আমি—। নইলে ওইটো দে। দে-দে !

পাগড়ি ধরে টানতে লাগল।

—নেতাই !

—না-না-না।

—না লয় শোন। পাগুড়ি বাঁধলে ডাক বইতে হবে। এই দেখ এমনি করে। নিজে পাগড়িটা বাঁধলে—বল্লমটা ঘাড়ে করলে এবং উঠানে ডাকহরকরার পথ চলার অভিনয় করে ছুটতে লাগল—ঘণ্টা বাজতে লাগল। দীনু বলে গেল —সরকার বাহাদুরের ডাক। পাঁচ মিনিট দেরি করলে ডাকগাড়ি ছেড়ে দেবে। জল হোক ঝড় হোক বাজ পড়ুক থামবার উপায় নাই—হ্যাঁ। অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে সুঁদীপুরের বটতলার নিচে দিয়ে—

অন্ধকার রাত্রে বনপথের ভিতর দিয়ে ঝুন্ ঝুন্—ঝুন্ ঝুন্ ঘণ্টা বেজে চলেছে। দীনু ছুটছে ডাক নিয়ে। তাকে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার দিয়ে গড়া মানুষের মতো মনে হচ্ছে। সামনে সুঁদীপুরের বটতলা—

বটগাছের অন্ধকার তলায় মধ্যে মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ উঠছে। ডাল দুলছে। কেউ যেন দোলাচ্ছে।

দীনু বটগাছের তলায় আসতেই ঝরঝর শব্দে বালি কাঁকর ঝরে পড়ল। দীনু চলতে চলতেই হেসে উঠল।

খোনা স্বরে এবার প্রশ্ন হল—কেঁ—রে—?

দীনু হেঁকে বললে—সরকাব বাহাদুবের ডাক। আমি ডাকহরকরা নবগেরামের দীনু হে রসের নাগর!

—এঁ পঁথ দিঁয়ে হাঁটিস না। মঁরবি। সাঁবধান কঁরে দিঁলাম!

—আজকে রেতেই আবার ফিরব। দিব্যি রইল গাছ থেকে নেমে পথে দাঁড়িয়ে থাকিস। পারলে ঘাড়টা মুচুড়ে দিস!

চলতে লাগল দীনু। সুঁদীপুর পিছনে পড়ে রইল।

অনেকটা এগিয়ে বন শেষ হল। খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে শড়ক গেছে। পাশে গ্রাম। কুকুর চিৎকাব কবে উঠল।

দীনু গ্রাহ্য করলে না—চলল।

এরপর চলেছে একসারি গাড়ি, মাল নিয়ে চলেছে। গাড়ির চাকায় ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ উঠছে। তার পাশ দিয়ে তাদেব অতিক্রম করে সে চলল।

আরও খানিকটা এসে—শেয়াল ডেকে উঠল।

দীনু চলল।

খানিকটা পরেই বোলপুরের আলো দেখা গেল।

একটা ট্রেনের বাঁশি শোনা গেল।

দীনু আরো জোরে ছুটল।

শহবের মুখে ঢুকল দীনু।

এরপর সে এসে পোস্টাপিসেব দাওয়ায় উঠল।

বললে—হুজুর! মাস্টারবাবু!

ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে।

পিওনেরা চিঠিতে ঝপা-ঝপ ছাপ মেবে চলেছে। শব্দ উঠছে।

টেলিগ্রাফের যন্ত্রে টকটক শব্দ উঠছে।

দীনুর কথার উত্তরে ভিতর থেকে শব্দ এল—কে?

—নবগেরামের ডাকহরকরা হুজুর!

—নবগ্রামের ডাক?

—ঘরের মধ্যে পোস্টমাস্টার ঘড়ির দিকে তাকালেন। আপন মনেই বললেন, ন'টা বাজে নি এখনও? কটায় ডাক ছেড়েছিল? প্রশ্ন যেন নিজেকেই করলেন।

পিওন একজন দরজার গায়ে লাগান ছোট দরজাটা খুলে—মুখ বাড়িয়ে বললে—আন, ভিতরে আন।

দীনু ডাকব্যাগ ভিতরে এনে নামিয়ে সভয়ে বললে—ডাকগাড়ি চলে যেয়েছে হুজুর?

পিওন বললে—ডাকগাড়ি চলে যেয়েছে? এখনও তিন ঘণ্টা দেরি! বারোটায় ডাকগাড়ি।

—ওঃ! বেলগাড়ির বাঁশির ফুঁকুনি শুনে যে ভয় আমার লেগেছিল! ওঃ! একটু জল পাব হুজুর?

মাস্টার সবিস্ময়ে দীনুকে দেখছিলেন। এদিকে একজন পিওন ছাপ মেরেই চলেছে।

মাস্টার টেলিগ্রাফে হাত দিয়ে কল চালাতে চালাতে বললেন—ঘেমে তুই নেয়ে উঠেছিস! সারাপথ বুঝি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছিস? যা, ওই দিকে দেখ কুয়ো আছে, বালতি আছে। তুলে নিয়ে খেগে যা। কিন্তু একটু থেমে খাস বাবা। আর এত দৌড়ে আসিস নে।

দীনু চলে গেল।

পিওন বললে—নতুন লোক। পুরনো হোক দাঁড়ান তখন ঘুমুতে ঘুমুতে আসবে। নবগ্রাম থেকে রওনা হয়েই ঘুম শুরু হবে—এখানে এসে ঘুম ভাঙবে।

মাস্টার টেলিগ্রাফ শেষ করে কলে একটা সমাপ্তির টোকা মেরে বিড়ি ধরালেন। বললেন—তা মিছে বল নি। ওই গোবিন্দ, মহেশ্বরা এদের সঙ্গে মিশবে তো, তিন দিনে চলতে চলতে ঘুমনো তালিম করে দেবে!

আবার কলটা টক টক করে উঠল।

মাস্টার চটে গিয়ে বললেন—দূরো ছাই! আবার টকর টকর—! টকর টকরের নিকুচি করেছে। জ্বালালে রে বাবা! ব[illegible]রাই একটা বই কলটার উপর চাপা দিলেন।

বাইরে আবার ডাকহরকরার ঘণ্টার শব্দ হল।

একজন ডাকহরকরা ডাক নামালে বাইরে।

দীনু তখন দাওয়ায় বসে বিড়ি টানছে!

পিওন বেরিয়ে এসে বললে—কে রে? কে এলি?

নতুন হরকরা বললে—আমি গোঃ।

—মহেশ্বরা?

—হ্যাঁ গো।

—রতনপুর থেকে তোর আসতে এত দেরি? ওই দেখ নবগ্রাম থেকে

তোর আগে এসেছে—তোর চেয়ে দুকোশ রাস্তা বেশী! বলছি আমি ওভারসিয়ারকে দাঁড়া।

—মানুষ না ঘোড়া গো আমরা? ভারি বললেন যা হোক! আসছিই তো। পায়ের হাঁটনেই তো হেঁটে আসছি, না কী!

পিওন বললে—ও বুঝি পায়ের হাঁটনে হাঁটে না? বদমাস কোথাকার। পথে ক-বার বসেছিলি? ক-বার তামাক খেয়েছিস? ক-জনার সঙ্গে গল্প করেছিস?

মহেশ্বরা ডাক ব্যাগ ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বললে—ওই কথা তোমাদের। লাও লাও ডাক লাও। ভিতরে ঢুকল সে।

পিওন দীনুকে বললে—তুমি ওইখানে শুয়ে পড়হে। ঘুমিয়ে নাও। এখন সেই তিনটে পর্যন্ত ছুটি।

এদিকে সূর্যোদয় হচ্ছে। দূরে কোথাও শুধু করতাল বাজিয়ে টহলদার গেয়ে যাচ্ছে—রাই জাগো রাই জাগো বলে শুকসারী ডাকে। রাই জাগো—মিলিয়ে গেল ওই এক কলির গান। তখন সদু-বউ ছিটে বেড়ার দেওয়ালে খড়ের চাল গোয়াল ঘর থেকে গোরু বের করে বাইরে বাঁধছে। মার্চ মাস—ফাল্গুন শেষ হয়ে চৈত্র পড়ছে। পাশে একটা পলাশ গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে। নিম গাছে কচি পাতা দেখা দিয়েছে। দাওয়ার উপর বসে সদ্য ঘুমভাঙা নেতাই বাপের হুকোয় তামাক খাচ্ছে।

সদু গোয়াল ঘর থেকে বের হতে গিয়ে মাথায় ঠোক্কর লাগিয়ে উহু-হু বলে বসে পড়ল। নেতাই তাকিয়ে দেখে বললে—এতটুকু দুয়োরে এই মাথা করে বেরুচ্ছে হারামজাদী। আচ্ছা হয়েছে। অক্তপাত হয়েছে?

সদু ছেলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—মারব গিয়ে মুখে থাবড়া! তারপর উঠে দরজার দিকে তাকিয়ে বললে—এই ঘর ভেঙে আগে গোয়াল করব তবে আমার নাম সদু।

—মুড়ি দেটে। মুড়ি দে!

সদু উঠান অতিক্রম করে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘরে ঢুকল মুড়ি আনতে।

নেতাই ব্যর্থ অনুকরণে গাইতে চেষ্টা করলে—আই জাগো-আই জাগো—শুক-সারী ডা-কে।

সদু মুড়ি এনে নেতাইয়ের পাতা গামছাখানায় ঢেলে দিয়ে বললে, আই—মুড়ি খেতে খেতে একবার যা। দেখে আয়।

কী ?

তোর বাবাকে। ডাকঘরে যা।

নেতাই মুড়িসুদ্ধ গামছাখানা নিয়ে উঠে চলতে চলতে বললে—তোর পরান উথুলছে তো তু যা। আমি চললাম মৌফুল কুড়ুতে। বেলা হলে একটো পাব না।

—নেতাই।

নেতাই গান ধরলে—ও সায়েব আস্তা বানালে—

ছ-মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে—

ও সায়েব—

ওদিকে তখন নবগ্রামের পোস্টাপিসের ডাক কাটা হয়েছে।

দীনু বসে তামাক সাজছে একদিকে। পিওন চিঠি পড়ে ভাগ করে রাখছে।

পোস্টমাস্টার ক্যাশব্যাগ এবং রেজেস্ট্রি ব্যাগ মিল করছেন।—ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন গ্রামের পত্র-প্রত্যাশীরা।

দীনু বেরিয়ে এসে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে কলকে ধরে তামাক টানতে লাগল।

বিলাতী মাস্টার বাইরে থেকে বললে—দেখি দেখি ও প্যাকেটটা! ওটা আমার না হে রামলাল ?

অন্য একজন বললে—কী হে, ওটা কী হে বিলিতী মাস্টার ?

—হরস্কোপ, মানে কোষ্ঠি। জার্মানি থেকে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—জন্মের সন-তারিখ পাঠালে কোষ্ঠি করে পাঠাবে। তাই করে পাঠিয়েছে।

পিওনের কাছ থেকে কোষ্ঠীটি নিলে বিলিতি মাস্টার। এবং খুললে। কয়েকজন ঝুঁকে দেখতে গেল। মাস্টার বললে—না। কোষ্ঠি দেখবে কী ? না। গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল সে।

একজন বললে—বিলিতী মাস্টার! আচ্ছা নাম হয়েছে সরকারের। বিলিতী তালেই আছে।

পিওন দরজা থেকে মুখ বের করে বললে—থানা, থানার ডাক।

একজন কনেস্টবল ভিড়ের পিছন থেকে বললে—হটিয়ে সব, হটিয়ে।

ভিড় সরিয়ে এসে সে ডাক নিলে। এবং চলে গেল।

পিওন এবার ডাকলে—ইউনিয়ন বোর্ড। কে এসেছিস ? নোটনা রে!

নোটন চৌকিদার এগিয়ে এল—এই যে আজ্ঞে।

—এই ইউনিয়ন বোর্ড আর এগুলো তো পিডেন সাহেব দাশরথিবাবুর নিজের। ইস্কুলের কে রয়েছে?

দুটি ছেলে এগিয়ে এল।—দিন।

ছেলে দুটি ডাক নিয়ে চলে গেল।

একজন বললে—আমার কিছু আছে রামলাল?

—কে? গোপেশ্বরদাদা?

—হ্যাঁ ভাই! আমার চিঠি আজও আসে নাই?

—কই দাদা! দেখছি না তো!

—তা হলে? নারায়ণ নারায়ণ! আজও চিঠি পেলাম না ছেলেটার! চোখে খুব পুরু চশমা, গায়ে ফতুয়া, হাতে লাঠি ঠুকঠুক করে চলে গেলেন।

আর একজন হাঁকলে—ও রামলাল! শুনছ!

—হ্যাঁ—।

—আমি হে!

—বসুন সুরেশবাবু। বসুন। দিচ্ছি। তার আগে রমেন্দ্র মুখুজ্জে! —রমেনবাবু।

পিওন মুখ বের করে একখানি রঙিন চিঠি বাড়িয়ে ধরলে। রমেন এগিয়ে এল। পিওন এবং সে দুজনেই একটু হাসলে।

সুরেশ বললে—রঙিন খাম যে! অ্যাঁ! চোখের ভুরু দুটি নেচে উঠল।

পিওন হেসে বললে—খোসবাই আছে, ভুরভুর করছে।

—বকশিশ আদায় কর রমেনের কাছে। সুরেশ বললে।—প্রথম বউয়ের চিঠি! হ্যাঁ-হ্যাঁ! রমেন ফিক করে হেসে দ্রুত চলে গেল।

আবার সুরেশ বললে—দাও না রামলাল কাগজখানা; একবার দেখে নিই।

পিওন রামলাল একখানা খবরের কাগজ বের করে সুরেশের হাতে দিয়ে বললে—যত্ন করে খুলবেন মশায়; দেখবেন যেন লাট না খায়। পরের কাগজ —ভারি চটে যায়। রিপোর্ট করলে আমাদের বিপদ হবে।

এক তরুণ বাইসিক্লটি চেপে এসে দাওয়ায় পা রেখে বাইসিক্লে চেপে থেকেই বললে, রামলাল আমার ভারতবর্ষ প্রবাসী—

—আজ তো আসে নি বাবু।

—সে কি? আজ বাংলা মাসের ২রা হয়ে গেল হে! চিঠি?

—চিঠিও আজ নাই আপনার।

—ধুৎ তেরি। সে বাইসিক্ল হাঁকিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে সুরেশ কাগজ খুলে দেখেই বললে—ওয়ে বাপরে। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণের সিদ্ধান্ত! ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দিবার জন্ত গরমপন্থীদের সংকল্প। ১৯৩০ সালের পূর্বে মীমাংসা না হইলে আন্দোলন আরম্ভের ব্যবস্থা।

পাশের লোকজন ঝুঁকে পড়ল কাগজের উপর।—দেখি—দেখি।

মাস্টার ভিতর থেকে বললেন—গোলমাল করছেন কেন এত। আস্তে আস্তে পড়ুন না। রামলাল! দীনু কই? দীনু!

দীনু তামাক খেতে খেতে অন্তরালে চলে গিয়েছিল।

ঘরের ভিতর থেকে রামলাল হাঁকলে—দীনু! এই দীনু! কোথা গেলি রে?

মাস্টার বললেন—দেখ আবার চলে গেল কিনা। নতুন লোক। ওকে বলেছিলে—কাগজে টিপ দিতে হবে?

—সে তো কালই বলে দিয়েছি। ও দীনু!

অন্য দরজা দিয়ে দীনু ঘরে ঢুকল।—আজ্ঞে হুজুর, এই আছি আমি।

মাস্টার বললেন—আছিস! আচ্ছা। বলেই কাজে মন দিলেন।

—দে—দে এই কাগজে টিপ দিয়ে দে!

মাস্টার কাজ করতে করতেই বললেন—হ্যাঁ। ডাক এনে দিয়ে বসে থাকবি। সব মিল হয়ে গেলে কাগজে টিপ দিয়ে তবে ছুটি।

বাইরে জানালার ওপার থেকে কে বললে—দুখানা পোস্টকার্ড আর একখানা খাম দেবেন বাবু!

মাস্টার হাত বাড়ালেন—পয়সা। ওদিক থেকে একখানা হাত ঢুকল।

মাস্টার পয়সা দেখে বাক্সে ফেলতে ফেলতে পিছন ফিরেই বললেন—দীনুকে ঘাসের কথা বলেছ রামলাল। আমার গোরুর জন্যে এক বোঝা করে ঘাস আনবি দীনু। বুঝলি।

দীনু টিপ দিয়ে মাথায় আঙুলের কালি মুছছিল। সে প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে?

—এক বোঝা করে ঘাস আনতে হবে রোজ।

—ঘাস?

রামলাল বললে—হ্যাঁরে বাবা ঘাস। গোরুতে খাবে। যে হরকরা থাকে সেই আনে।

মাস্টার বললেন—আমি মাসে তোকে কিছু করে দেব। বুঝলি? তোরা না-দিলে আমার চলবে কি করে? ও-বেলা—সেই সন্ধ্যের সময় যখন ডাক নিয়ে যাবার জন্তে আসবি—তখন, তখনই আনলেই চলবে।

রামলাল বললে—যা-তা ঘাস আনিস না। ভালো ঘাস। সন্ধ্যেতে ঠিক সময়ে আসবি। কী, দাঁড়ালি কেন?

—ইগুলান নিয়ে যাব?

দীনু পকেট থেকে খান দুয়েক রঙচঙে খাম ও মোড়ক বের করলে।

রামলাল সবিস্ময়ে বললে—দেখি—দেখি। পেলি কোথা?

—পোস্টাপিসের সামনে পড়ে ছিল। বাবুরা ফেলে দিয়েছে—কুড়িয়ে নিলাম।

—হুঁ। রমেন্দর বউয়ের চিঠির রঙীন খাম। খোসবু উঠছে। এটা তো বিলিতী মাস্টারের জার্মানির কুষ্টির মোড়ক।

—লোব?

—তা নিয়ে যা। কিন্তু করবি কী?

—ছেলেটাকে দোব।

মাস্টার কাজ করছিলেন—হঠাৎ ঘুরে দীনুর দিকে তাকালেন—তারপর হাত বাড়িয়ে দেওয়াল থেকে একখানা শেষ-হয়ে-যাওয়া ক্যালেণ্ডার খুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ছেলে বুঝি ছবি ভালোবাসে? এই নে!

দীনু উজ্জ্বল আনন্দে দীপ্ত হয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতার্থ হয়ে হাত বাড়িয়ে ছবিখানা নিলে।

দীনু বেরিয়ে গেল।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে কাগজখানা মোড়কে পুরে হাতে করে ঘরে ঢুকল।

—এই নাও হে রামলাল। একেবারে ভাঁজে ভাঁজে মুড়ে ঠিক করে দিয়েছি। ধপ করে ফেলে-দিল। তারপর বললে—ও মাস্টার।

—হুঁ। বলো।

—বলব? বলে বলে তো মুখ শুকিয়ে গেল হে! রোজ রোজ আর কত বলব?

—পাঁজি।

—তা ছাড়া কি কারুর একখানা ইনসিওর আমাকে দাও বললে দেবে তুমি? পাঁজি একখানা—ওই বিজ্ঞাপনের একখানা পাঁজি আর একটা ক্যালেণ্ডার।

—দোব। এই গাদা দফনে যেদিন আসবে—সেদিন দোব।

—এই তো মেলাই এসেছে বাবু, দাও না একটা পাঁজি!

—আজ যদি না দাও তো আর চাইব না। আর দাবা খেলতেও আসব না। হ্যাঁ। এই নিলাম আমি একখানা। বলেই সে তুলে নিল।

—আরে আরে দেখে নাও, কার নামের নিচ্ছ। রামলাল দেখে দাও হে!

—এ কোথাকার কে—হরিলাল ঘোষ—সাকিন কুড়ুম শা—

বাইরে থেকে ওভারসিয়ার ডাক দিল—মাস্টারমশাই।

বাঁড়ুজ্জে তাড়াতাড়ি কাগিজ তুলে পেটের কাপড়ের তলায় গুঁজতে লাগল। এবং মাস্টারের বাড়ির ভিতর দিকে অগ্রসর হল।

মাস্টার কিন্তু চমকালেন না; তিনি হেসে উত্তর দিলেন—হরি হে রাজা কর। জয় ওভারসিয়ার বাবু! আসুন আসুন।

বাঁড়ুজ্জেকে বললেন—ভয় নাই। আমাদের মধুবাবু—ওভারসিয়ার। কিন্তু তার আগেই বাঁড়ুজ্জে সরে পড়েছে।

ওভারসিয়ার ঢুকলেন—বয়েস হয়েছে, শক্ত শরীর; এক হাতে লাঠি, কাঁধে ঝোলানো পোস্টাপিসের একটা হলুদ ব্যাগ। বলতে বলতে ঢুকলেন—হরি হে রাজা কর। কিন্তু হরি কানে কালা। শুনতে পান না। জীবনটা মাঠে মাঠে হেঁটেই কাটল। সিংহাসন বলতে দূরের কথা, কাঠের চেয়ারেও একদিন বসে আরাম করতে পেলাম না। টুলটা দাও হে রামলাল, বসি। একটু চা খাওয়ান মাস্টারমশাই।

বাইরে কথাগুলি বলে প্রায় শেষের দিকে ঘরে ঢুকল ওভারসিয়ার। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রাখলে।

রামলাল বাড়ির ভিতরের দিকের দরজায় মুখ বাড়িয়ে বললে—মিনু মা, দু কাপ চা চাই মা। ওভারসিয়ারবাবু এসেছে, খাবেন এখানে।

ওভারসিয়ার বললেন—উহু! উহু! তবে আর বললাম কী এতক্ষণ? এখুনি চা খেয়েই যাব—টিকুরী। ব্যাগ থেকে শালপাতায় মুখ মোড়া একটি ভাঁড় বের করলেন কথা বলতে বলতে। রামলালের হাতে দিয়ে বললেন—মিনুকে দিয়ে এস রামলাল। সিউড়ির মোরব্বা। রামলাল নিয়ে চলে গেল। তারপর ওভারসিয়ার আগের কথার জের টেনে বললেন—ঝামেলার কথা আর বলবেন না। টিকুরী থেকে আবার ফিরতে হবে আজই।

—আজই?

—হ্যাঁ। আপনাদের নতুন লাইন হয়ে রাত্রেই বোলপুর!

—দেখবেন। সুঁদীপুরের বটতলায় বলে ভূত আছে।

—ইংরেজ রাজত্ব মশায়! গভরমেন্ট সারভেন্টকে ভূতেও ভয় করে। আর ভূতের ভয় করলে কি এই চাকরি করা চলে! নতুন লাইনের রিপোর্টের জন্যে তাগাদা এসে গিয়েছে।

—চোখ বুজে রিপোর্ট দিয়ে দিন। মাস্টার বললেন।—লোকটা সাচ্চা!

সাচ্চা সে আচ্ছা মশায়! এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বোলপুর পৌঁছায়। বেটা ঘোড়ার মতো দৌড়োয়।

ঠিক এই সময়েই দূরে—শাঁক এবং উলুর ধ্বনি উঠল। এবং এই সময়েই রামলাল ও মিনু দুটি কাচের প্লেটে দুটি করে মোরব্বা এবং দু কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকে ওভারসিয়ারের হাতে দিল ও মাস্টারের টেবিলে নামিয়ে দিল।

মিনু বললে—জল লাগবে বাবা?

—লাগবে বইকি। হাত ধুতে হবে তো।

রামলাল ও মিনু চলে গেল। এঁরা মোরব্বা মুখে তুলে চিবুতে লাগলেন।

মাস্টার চিবুতে চিবুতে বললেন—আগের সে মোরব্বা আর নেই।

এর মধ্যে শাঁখ এবং উলু বেজেই চলেছিল। ওভারসিযার বললেন—সবই ভেজাল যে। যুগটাই যে ভেজালের। বলে প্লেটটা নামিয়ে রেখে বললেন—এত শাঁখ উলু? বিয়ে না কি? তারপরই বললেন—চৈত্রমাসে বিয়ে?

মাস্টার হেসে বললেন—রেজেস্ট্রির যুগ। চৈত্র মাসে বিয়েতেই বা বাধা কী?

—যা বলেছেন। চায়ে চুমুক দিলেন। তারপব বললেন—বোলপুর থেকে এখানে ফেরে কতক্ষণে বলুন তো?

মাস্টার বললেন—দীনুর কথা বলছেন? আমরা উঠবার আগেই ও এসে বাইরের বারান্দায় বসে থাকে। পাঁচটা কি পাঁচটার দু-চার মিনিট আগেই হবে। ওই দু ঘণ্টা—

ওদিক থেকে রামলাল জল নিয়ে ঢুকছিল।

এদিক থেকে রামলাল, রামলাল বলে চেঁচাতে চেঁচাতে হুড়মুড় করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন সুরেশ বাঁড়ুজ্জে। পরস্পর প্রায় ধাক্কা লেগে গেল। রামলালের হাতের জল পড়ে গেল।

ওভারসিয়ার পোস্টমাস্টার বলে উঠলেন, আরে আরে চিঠি ভিজল—চিঠি ভিজল।

পোস্টমাস্টার বললেন, কী যে তোমার কাণ্ড বাঁড়ুজ্জে। তারপর হঠাৎ চটে উঠে বললেন—কী? কী? রামলালকে নিয়ে কী দরকার? জল-টল ফেলে সুরেশ বসে পড়ে জল ওপাশ দিয়ে হাতে করে ছিটিয়ে দিতে দিতে বললে—

ভিজবে না ভিজবে না। ঠিক করে দিচ্ছি। এই নাও এই নাও। জল ছিটিয়ে ওদিকে ফেলে দিল। এই নাও। বাবাঃ—। কিন্তু রামলাল—তুই যা—যা এখুনি যা বকশিশটা আদায় করে নিয়ে আয়। যা—।

—কিসের বকশিশ? সুরেশ তুমি একটা আস্ত—কী বলব। এমন কর—

—যা বলবে বল—আস্ত উল্লুক যা বলবে। এমন করি সাধে! মস্ত বড় কাণ্ড। শাঁখ বাজছে শুনছ না—উলু পড়ছে শুনছ না? শিবু রায়বাবুর নাতির বেটা-ছেলে হয়েছে। শিববাবুর বাবাবুড়োকে নিয়ে চার পুরুষ। হৈ-হৈ কাণ্ড। গাঁয়ে মিষ্টি বিলুবে। নোটা চৌকিদার চিঠি নিয়ে গিয়েছিল—সে বেটা দু টাকা বকশিশ পেয়েছে। পিওনকে বকশিশের হুকুম হয়ে গিয়েছে। মাস্টারের বাড়িতে থালা-ভর্তি সন্দেশ আসছে। রামলাল তুই শিগগির যা। টাটকা টাটকা গেলে—বেশী পাবি। গরম গরম—বুঝলি না।

বাইরে থেকে জানালা দিয়ে একখানি হাত ঢুকল—ওপাশ থেকে বললে—একখানা পোস্টকার্ড মাস্টারবাবু।

একটি সভ্য কণ্ঠের কথা শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে—একখানা মনিঅর্ডার ফর্ম দেবেন আমাকে।

বরাবরই শাঁখ উলু বেজে যাচ্ছে—ক্রমশ কমে আসছিল অবশ্য। এবার থামল।

ওদিকে তখন দীনুর বাড়িতে উঠানে হুঁকো-কল্কে হাতে দীনু দাঁড়িয়ে আছে। উঠানের একপাশে দড়ি টাঙিয়ে একখানি ঘরের ছক পাতা হয়েছে, দড়ির পাশে পাশে দাগ টানাও হয়ে গেছে কোদালের কোপ দিয়ে। এক জায়গায় খানিকটা মাটি খোঁড়া রয়েছে! হুঁকো হাতে দীনু ঘাড় বেঁকিয়ে ঘরখানির ছক যেন পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে পরখ করে দেখছে।

উঠানের একপাশে দু বোঝা ঘাস পড়ে রয়েছে।

স্ত্রী সদু কাঁখে করে এক কলসী জল নিয়ে এসে দাঁড়াল।

বললে—এখনও সেই দাঁড়িয়ে রইচ? না বাপু! আচ্ছা মানুষ যা হোক।

দীনু বললে—আধহাত করে চারপাশে বাড়িয়ে দোব কিনা ভাবছি।

—বাড়িয়ে দেবা? ক্যানে? গোরুগুলার লেগে ছপ্পর খাট পেতে মশারি টাঙাবা না কি? বাড়িয়ে দেবে! সব তাতেই আদিখ্যেতা।

—ক্যানে? আদিখ্যেতা কী হল?

—হল না? বললাম গোয়ালের ছোট দুয়োরে মাথাটো ঠোক্কর লেগে কেটে যেয়েছে। আমি দিব্যি করেছি বর্ষার আগে নতুন গোয়াল করাব।

—তাই তো করছি।

—তাই তো করছি? তাই বলে আজই? বলে ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে। শোনবামাত্র দড়ি টাঙিয়ে বলে আজ বনেদের পত্তন করব। সারা রাত বলে ডাক রয়েছ, জেগেছ—

—দুর! সারা রাত ডাক বইতে হয় নাকি? রাত নটার সময় ডাক ফেলে দেলাম—বাস, তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুম। সেই তিনটে পর্যন্ত। শ্যাষ রাত। ভুলকো তারা ওঠা পর্যন্ত। তারপরে ডাক নিয়ে ফের রওনা। ভোর-ভোর লবগেরাম। চাকরি খুব সুখের সদু! তবে দুখও আছে।

সদু কলসী নিয়ে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হল।

বললে—দুখ আবার কী? সেটো কী বটে?

—ঘুম হয় না।

—ক্যানে? কলসীটা সে নামালে।

—ভাবি—ঘরে একা শুয়ে তু গুনগুন করছিস—

চৈত মাসে শিবদুগ্যা গাজনে নাচে জোড়ে।

এ হেন সুখের দিনে আমার বঁধু নাইকো ঘরে!

—মরণ। দায় পড়েছে আমার! অ্যাই—অ্যাই—ই ছোঁড়ার কাণ্ড দেখ।

অ্যাই—অ্যাই ওরে নেতাই অ্যাই—! ঘরের ভিতরের দিক লক্ষ্য করে কথা বলছিল সদু বউ। সে ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকল।—ভাঙবে রে, ভাঙবে।

ঘরের ভিতরে নিতাই শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। প্রচুর পরিমাণে মহুয়া ফুল খেয়ে বেশ যেন নেশায় মেতে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙ্গে এখন সে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে দু-হাতে একটা জলসুদ্ধ ছোট কলসী তুলে খাচ্ছিল—জলে তার বুক মুখ ভাসছিল। মা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই কলসীটা হাত থেকে খসে পড়ে ভেঙ্গে গেল।

সদু বললে—ভাঙলি তো?

ধুলামাখা গায়ে জল পড়ে চিত্রবিচিত্র নিতাই হি-হি করে হাসতে লাগল।

—হাসছে দেখ ক্যাপার মতো। অমুনি করে মৌফুল খায়? ছেলে একেবারে মদখেগো মাতালের মতো লাটাচ্ছে।

ছেলেটা তবু হাসতে লাগল।

দীনু ঘরে ঢুকে বললে—বকিস না এখন। আমানি খেতে দে ওকে। ঠাণ্ডা হবে। আর ঘুমুক; ঘুমুতে দে।

দেওয়ালের গায়ে ইতিমধ্যেই ক্যালেণ্ডারটি টাঙানো হয়েছিল, সেখানা খানিকটা বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। সেখানা সোজা করতে এগিয়ে গেল দীনু। বললে—এই দেখ, এটা আবার বেঁকালে কে?

সেখানা সোজা করে একটা ভাঁড় থেকে হাত চুবিয়ে খানিকটা তেল নিয়ে মাথায় ঘষতে ঘষতে বললে—আমি চান করে আসি। ভাত খেয়ে খানিকটা শোব। বুঝলি।

সত্ব বলে উঠল—ওই—ওই—এই দেখ—ই হারামজাদার আবার কাণ্ড দেখ।

নিতাই জল-পড়া জায়গাটার কাদার উপর শুয়ে পড়ছিল।

এবার দীনু তার হাতে ধরে ঝাঁকি দিয়ে টেনে বললে—নাঃ তোকে আর দু-চার চড় না দিলে চলছে না। বড় বেয়াড়া হয়ে গেলি। ওঠ। চল—চল আমার সঙ্গে চান করবি চল। নেতাই।

—যা, আমি যাব না।

—নেতাই! এবার একটা ঝাঁকি দিলে দীনু।

নেতাই থু-থু করে থুথু দিয়ে দিলে।

—নেতাই! ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠল দীনু।

নেতাই আবার থুথু দিলে।

দীনু ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে নিষ্ঠুর ক্রোধে হাত তুললে—মারবে সে ছেলেকে।

সত্ব ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে আটকালে।—না—না—না।

—না—না—ছাড়। তুই ওর মাথা খেলি।

—আমার তিনটে মরে ওই একটা। তোমার পায়ে পড়ি।

—সে তিনটে বুঝি আমার ছিল না? আমার বুঝি আরও তিনটে আছে? ছেড়ে দে, সত্ব ছেড়ে দে।

সত্বকে ঠেলে ফেলে নিতাইকে ঝাঁকি দিতে দিতে সে নিয়ে চলে গেল।

সত্ব বেরিয়ে এল দাওয়ায়। নামতেও গেল। কিন্তু কী ভেবে দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দিয়ে জল পড়ল না।

উঠানের পলাশ গাছটা থেকে একটি একটি করে ফুল ঝরে পড়তে লাগল।

হঠাৎ সত্ব এক সময় যেন সচেতন হয়ে উঠে ঘরের ভিতর ঢুকল এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাপড়ে ঢেকে কিছু নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে উঠল।

তাদের ঘরের মতোই ঘরদোর।

ডাকলে—বিলাসী! অ বিলাসী!

বিলাসী ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দিলে—কে?

—আমি লো! সত্ব। শোন একবার।

—কী? বেরিয়ে এল বিলাসী।

—কই এঁচোড়টো তু লে ভাই।

—ক্যানে? আমার তো রয়েছে। আমার রাখু যে তার নেতাইয়ের সঙ্গে ছিল। বাবুদের বাগানে দুজনাতে একসঙ্গে ঢুকেছিল যে। রাখু দুটো এনেছে।

—জানি। কিন্তু নেতাইয়ের বাবা আজ খুব-এগেছে। এর ওপরে যদি জানতে পারে যে পরের বাগান থেকে চুরি করে এনেছে তা হলে আর অক্ষে থাকবে না! তু আথ ভাই। বরং ব্যান্নন এথে একটুকুন দিয়ে আসিস। বুঝলি। যাই ভাটি আমি।

এঁচোড়টা ফেলে দিয়ে সে দ্রুতপদে ফিরে এল বাড়ি। সেখান থেকেই দেখতে পেলে খানিকটা দূরে দীনবন্ধু স্নান সেরে ছেলেকে স্নান করিয়ে কোলে করে নিয়ে ফিরছে। বাপ ছেলেতে ভাব হয় নি, ছেলে কাঁদছে, বাপের আর তোষামোদের বাকি নেই। ছেলেকে শালুক তুলে গলায় মাথায় জড়িয়ে দিয়েছে। মধ্যে মধ্যে চিবুকে কাতুকুতু দিয়ে হাসাতে চেষ্টা করছে।

সদু তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ভাত বাড়তে বসল।

ভাত বাড়তে বাড়তেই শুনলে—দীনু বলছে—বুঝলি কি না, তারপরেতে গোয়াল ঘরটা এবার তৈরি করেই আসছে বার একখানা কোঠাঘর করব। সোন্দর কোঠাঘর। চাকুরি তো ধর আস্তিরে। তাও নটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ঘুমুতে পাব। বাস সকালে এসে দিবিলোকে ঘর ছাউনির কাজ করতে পারব। দেয়াল বাড়ুইয়ের কাজ করতে পারব। চাকরির মাইনে পনেরো টাকা—ইদিকে সে ধর দিন এক টাকা। তিরিশ টাকা। ভাবনা কী! তোকে পাঠশালাতে ভত্তি করে দোব। নাইট ইস্কুলে! বুঝলি। হ্যাঁ, দিনে কাজ করবি। তোকে আমি আজ মিস্তিরীর কাজ শেখাব, বুঝলি। তা পরেতে তোর বিয়ে দোব। হ্যাঁ—। ওই পাশে তখন আর একখানা কোঠাঘর করব।—

সদু স্থির হয়ে শুনছিল! আনন্দে তার হাত অসাড় হয়ে গিয়েছিল। মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে দুটি চোখ দিয়েও গড়িয়ে এসেছিল জলের ধারা।

হঠাৎ চাল থেকে থপ করে একটা টিকটিকি মেঝের উপর খসে পড়ে তার এই তন্ময়তার আবেশ ভেঙে দিল।

ভয় পেয়ে যেন চমকে উঠল সদু, মৃদু স্বরে বললে—মা গো। তারপরই বললে, মর মর। যাঃ—যাঃ।

টিকটিকিটা পালিয়ে গেল।

সদুর হাত দ্রুত চলতে লাগল।

দু থালা ভাত দু হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে এল।

তখন দীনু ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে। নিতাই শান্ত হয়েছে—শালুক ফুলের ডাঁটিটা পাক দিয়ে মাথায় বাঁধছে, আর বলছে, আমাকে একটা দু চাকার গাড়ি কিনে দিস বাবা!

—দোব। বড় হ। দোব কিনে। আমি বুড়ো হলে পেনসিল্ দোব—তোকে ডাকহরকরার চাকরি করে দোব। তু তু চাকার গাড়িতে চেপে সোঁ—সোঁ করে ডাক নিয়ে চলে যাবি।

সহু হেসে বললে—তাই দেবে। এখন ভাত খাও।

দীনু এসে ভাতের থালার সামনে বসে বলতে লাগল—আমার মতো জ্যোস্না নাই, আঁধার নাই, খরা নাই, বর্ষা নাই, জল নাই, ঝড় নাই, শীত নাই, ওই সুঁদীপুরের ভূতুড়ে বটতলা দিয়ে ধুকুর-ধুকুর করে—

জ্যোৎস্নালোকিত বটতলা ও অরণ্যভূমির মধ্য দিয়ে দীনু ডাক নিয়ে চলে যায়।

অন্ধকার রাত্রিতে চলে যায়।

চলে গেলেই বটগাছে খরখর শব্দ ওঠে, ঝরঝর করে কিছু ঝরে পড়ে।

ঝড় ও বিদ্যুতের মধ্যে পার হয়ে যায় দীনু।

কোনো দিন দূরে শেয়াল ডাকে। কোনো দিন কুকুর ডাকে।

আধো-জ্যোৎস্না আঁধো-মেঘলার মধ্যে যেদিন যায়, সেদিন ময়ূর ডাকে।

শেষ চলে শীতের রাত্রে।

সেদিন প্রথমেই মাঠে কাটা ধান দেখা যায়। আকাশে জ্যোৎস্না। মধ্যে মধ্যে গাড়ির আঁট দেখা যায়। গোরুর গাড়ি খুলে দিয়ে পথে গাড়োয়ানেরা বিশ্রাম করে। মাঝখানে আগুন জ্বলে। তারপর অরণ্যভূম আরম্ভ হয়। সুঁদীপুরের বটতলা আসে। সেদিন ঝরঝর করে তার মাথাতেই ঝরে পড়ল কিছু। গাছে খরখর শব্দ উঠল। দীনু থমকে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে ডাকটা নামিয়ে লাঠিটা খুলে নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে একটা ঝুলে-পড়া ডালে সজোরে মারলে লাঠি।

ধপ করে কিছু পড়ল। দীনু ঝুঁকে দেখে সেটার লেজ ধরে টেনে তুললে। সেটা বেজী জাতীয় জানোয়ার। নাম খটাস্। গাছেই ওদের বাস। সারা রাত্রি গাছের ফল খায়—মানুষ গেলেই ডালে ডালে ছুটোছুটি করে। সেটাকে নিয়ে—ডাক কাঁধে তুলে আবার ছুটল দীনু।

এসে উঠল বোলপুর পোস্টাপিসে। ভিতরে সেই টেলিগ্রাফের টক-টক শব্দ। চিঠিতে মোহর মারার শব্দ উঠছে। বাইরে একটা আলো ঝুলছে। দীনু ডাক নামিয়েই সোৎসাহে বললে—মাস্টারবাবু।

—দীনু?

—সুঁদীপুরের বটগাছের ভূত মেরে এনেছি দেখেন।

—ভূত মেরে এনেছিস ?

—এই ত্তাখেন না কেনে ?

মাস্টার পিওন সব ভিড় করে এল।

—এটা কিরে ?—এঁ্যা।

—খটাস জানোয়ার মশায়। বুয়েছেন না, বেটারা গাছে একেবারে গেরাম শহর বানিয়ে বাসা বেঁধেছে। এতে বেটাদের মাতন লাগে। ফল খেয়ে বেড়ায়, ঝাঁপাঝাঁপি করে, নিচে দিয়ে মানুষের সাড়া পেলেই হুড়মুড় করে ছুটে পালায় গাছের কোটরে। খরখর শব্দ ওঠে গাছময়; আর পাকা ফল ঝরে ঝরঝর করে। কারুর মাথায় জলত্যাগ করে দেয়। আজ এক বছর মশায়—রাম রাম রাম রাম বলতে বলতে পার হয়েছি। বুক টিপটিপ করেছে। সে কী বলব বাবু। আজ বুয়েছেন না, জ্যোস্না ছিল, আর চোখে হঠাৎ পড়ে গেল। দেখি একটা ঝুলে-পড়া ডালে ছোট মতো কালো পারা কী নড়ছে—চোখ দুটো জুগ-জুগ করছে। আমি মশায় ডাক নামিয়ে—লাঠিখানা নিয়ে—জয়কালী বলে দিলাম ঝেড়ে। আর ধপাস করে পড়ল বেটা—।

হা-হা করে হাসতে লাগল সে।

মাস্টার বললেন—চামড়াটা আমাকে দিস বুঝলি। নুন দিয়ে বায়েনদের দিয়ে—পাঁঠার চামড়া যেমন করে দেয়—তেমনি করে দিস। কেমন ?

—দোব আজ্ঞে। নিশ্চয় দোব।

মাস্টার বললেন—তোর তো একবছর হয়ে গেল কাজ ?

—আজ্ঞে তা হল।

—আর একটা কাজ করবি ? এখান থেকে ইষ্টিশানে ডাক নিয়ে যাবি, আধার নিয়ে আসবি। এখানে ঘুমোস, ইষ্টিশানে ঘুমুবি। তবে হ্যাঁ—একঘণ্টা দু-ঘণ্টা বেশী জাগতে হবে। পারবি ? মাইনে আরও দশ টাকা পাবি।

ইতিমধ্যেই আরও চার-পাঁচজন হরকরা ডাক নিয়ে হাজির হল।

মাস্টার পিওন এরা ঘরে ঢুকল। মাস্টার দ্রুত গিয়ে টেলিগ্রাফে হাত দিল। পিওনেরা কাজে বসল। মোহর করা চলতে লাগল। দীনুর ডাক কাটা হতে লাগল। দীনু বসল।

বাইরে অন্য ডাক হরকরারা খটাসটাকে ঝুলিয়ে দেখতে লাগল।

একজন বললে—দীনু বাহাদুর বটে বাপু!

—হুঁ হুঁ—শুধু দীনু নয় দীনবন্ধু!

—খটাস মেরে নতুন চাকরি হয়ে গেল। চামড়া দিয়ে কাজ হাসিল।

—আমি একটো কাঠবিড়ালি মেরে আনব, দাঁড়া।

ভিতর থেকে পিওন ডাকলে—ডাক আন, সব কী গজর-গজর করছিস ?' ডাক আন। স্টেশন যেতে হবে। ডাকগাড়ির সময় পাল্টেছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট এগিয়ে এসেছে। ডাক আন।

দীনু স্টেশনে সেদিন ডাক নিয়ে গিয়ে—ডাকগাড়ি দেখে অবাক হয়। এত আলো! এত লোক!

পরের দিন সকালে ডাক পৌঁছে দিয়েই বাড়ি ফিরে সদুকে বললে।—সদু তখন ঘর নিকুচ্ছিল। পাশে একটি মাচাতে লাউয়ের লতা উঠেছে। লাউ ঝুলছে। চারিদিকে একটি স্বল্প সমৃদ্ধি ও শ্রী যেন ফুটি-ফুটি করছে।

গোয়াল ঘরটা তখন সম্পূর্ণ; চালের উপর নতুন খড় ঝলমল করছে।

দীনু ঘরের দিকে তাকিয়েই বললে।

—সদু!

—হুঁ। সদু নিকিয়েই চলল।

—হুঁ নয়, হুঁ নয়। শুধু হুঁ বললে হবে না।

—তবে কী বলব? কী হল?

—হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ বলতে হবে। এবারে কোঠা ঘর। ঘর হয়ে গেল। ফের নতুন চাকরি। বোলপুরেই পোস্টাপিস থেকে ইষ্টিশানটুকু ডাক নিয়ে যেতে হবে আসতে হবে। এই পা-খানেক পথ। বাস্ দশ টাকা মাইনে। আর সে ডাকগাড়ির সে কী শোভা সদু। ডাকগাড়ির কী শোভা! কী আলো! কত লোক! ঝলোমল করছে। কলকল করছে। ওঃ নয়ন সাথক হয়ে গেল।

ঘর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল নিতাই।

—আমাকে একটো পেন্টুল—হাফ পেন্টুল কিনে দিতে হবে বাবা। সে গলা ধরে ঝুলে পড়ল।

দীনু কোলে তুলে নিলে।

সদু বললে—আগে বড় ঘরের চাল ঝেড়ে ছাওয়া হোক, দাঁড়া।

দীনু বললে—হবে। হবে! সব হবে। আজই খড় বায়না করব। ধারে লোব। দুমাসে শোধ দোব। কুছ পরোয়া নাই। পেন্টুলও আমি কাল এনে দোব বোলপুর থেকে।

নিতাই বললে—লোটন কাকা কী বলে জান? কুছ পরোটা নেহি। বলে হি-হি করে হাসতে লাগল।

দীনু এগিয়ে গেল মাচার দিকে। একটি লাউ তুললে।

সদু বউ তখন নিকোনার কাজ শেষ করে উঠেছে। বললে—আহা-আহা কচি কচি—এখনও অনেক বড় হবে।

—পায়েস করতে কচিই ভালো। মাস্টারমশায়কে দিতে হবে, পায়েস করে খাবে। বুঝলি। নতুন চাকরিটা পেলাম! আর সনজেবেলা একটা নিয়ে যাব বোলপুরের মাস্টারের জন্যে। আমি দিয়ে আসি দাঁড়া।

নবগ্রাম পোস্টাপিসের সামনে ইট চুন সুরকি পড়ে আছে।

মাস্টার ঘরের মধ্যে কাজ করছেন। সুরেশ বাঁড়ুজ্জে বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছে। রামলাল চিঠির থাক গোছাচ্ছে ঘরের মধ্যে। দীনু বারান্দা অতিক্রম করে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

—মাস্টারমশায়।

—অ্যাঁ?

দীনু লাউটি নামালে।

রামলাল বললে—লাউ? এ যে নেহাত কচি রে।

—আজ্ঞে আমার গাছের। মাস্টারমশায় পায়েস করে খাবেন।

মাস্টার ঘুরে তাকালেন।—কিন্তু তোর পাঁঠা কী হল রে? লাউ দিয়ে সারছিস?

—আজ্ঞে না। এবারেই ধরম-পূজোতে, এই বোশেখ মাসে। সে-পাঁঠা আমি যতন করে খাইয়ে-দাইয়ে বেশ পুরুস্টু করে রেখেছি।

সুরেশ এসে ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে বললে—তার আগেই যে মাস্টার চলে যাচ্ছে।

—চলে যেছেন?

—আমার বদলির হুকুম হয়ে গেছে দীনু। মাস্টার বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।

রামলাল বললে—এই সপ্তাহেই চলে যাবেন।

সুরেশ বললে—দে দে, তার আগেই লাগিয়ে দে বাবা? ধরমের নামের পাঁঠা দে গাজনেই শিবের কাছে—খাজ্জিং জিং জিং করে দে। বলো শিবো ধরমজ্জো—যে ধরম সেই শিব।

দীনু বললে—আপুনি চলে যেছেন বাবু! হতাশার সুরে অকৃত্রিম বেদনার সঙ্গে কথা কটি বললে সে।

মাস্টার বললেন—চাকরির এই নিয়ম দীনু। তোদের পোস্টাপিস বড় হল—সাব-পোস্টাপিস হল;—দেখছিস তো—ইট চুন সুরকী এসেছে, পাকা থামের বারান্দা হবে। পাকা মেঝে হবে। আমি ব্রাঞ্চ পোস্টাপিসের মাস্টার, এখান থেকে চলে যেতে হবে। আবার যে আসছে—সেও দু বছর চার বছর থেকে চলে যাবে। আবার নতুন মাস্টার আসবে। এই নিয়ম।

সেই নিয়মানুসারে—নতুন পোস্টমাস্টারকে দেখা যায় নবগ্রাম পোস্টাপিসে।

মাস্টার খিটখিটে ডিস্‌পেপটিক লোক। বয়স হয়েছে। দেখা যায় অপরাহ্ণে পাকা বারান্দায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। দেওয়ালে কতকগুলি মোটা হরফে লেখা নোটিশ টাঙানো হয়েছে—সেগুলি পড়ে দেখছেন।

"ডাক বিলির সময় কেহ ভিতরে ঢুকিবেন না। বাহিরে গোলমাল করিবেন না।"

"খাম পোস্টকার্ড টিকিট বিক্রয়ের নির্ধারিত সময়ের বাহিরে পোস্টেজ বিক্রয় হইবে না।"

"মনিঅর্ডার রেজেষ্ট্রির জন্যে নির্ধারিত সময়—১০টা হইতে ১২টা। ১টা হইতে ২টা।"

"যে কোনো কাজই থাকুক, মাস্টারমশায় বলিয়া ডাকিয়া বিরক্ত করিবেন না।"

বিনা প্রয়োজনে পোস্টাপিসের কাউণ্টারে কেহ ঢুকিয়া ঘোরা-ফেরা করিবেন না। কাজে আসিয়া ও তর্ক তকরার বা চিৎকার করিবেন না"—

ঠিক এই সময়ে এক বোঝা ঘাস মাথায় করিয়া দীনু প্রবেশ করিল এবং বারান্দার অপর দিকে দুম করিয়া ফেলিয়া দিল।

মাস্টার চমকিয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন। তারপরই সামলাইয়া লইয়া চিৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন—Who are you? What's that? কোন হ্যায় তুম? কেয়া হ্যায় উ?

দীনু বিহ্বল হইয়া বলিল—হুজুর।

- কে তুমি? কে? এ সব কী?

—আজ্ঞে হুজুর আমি দীনু ডাকহরকরা।

—দীনু ডাকহরকরা? রানার? কিন্তু এসব কী? ঘাস কেন পোস্টাপিসে?

—আজ্ঞে আপনকার জন্যে- -

—What? আমার জন্যে—? ঘাস নিয়ে কী করব আমি? আমি ঘাস খাই? আমার জন্যে—ঘাস?

—আজ্ঞে, হুজুরের গোরুর জন্যে।

—নো! নো। হুজুরের গোরু নাই। শোনো আমার গোরু-টোরু নাই। ঘাস আমার দরকার নাই। ঘাস কোনো দিন চাই না আমার। এসব কোনো দিন আনবে না।

- আজ্ঞে, আর আনব না হুজুর।

—হুজুর ? হুজুর কী ? What do you mean by হুজুর ? আমি হাকিম নই। জমিদার নই। স্যার, স্যার বলবে।

বিহ্বল হয়ে গেল দীনু। সে সভয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার !

অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে এবার মাস্টার বললেন—এখন, উঠাও ! উঠাও !

দীনু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাস্টার বলিলেন—ঘাস। ওই ঘাসের বোঝা। উঠাও। বাইরে ফেলে দিয়ে এস ! যাও !

দীনু ঘাসের বোঝা তুলে ফেলতে গেল।

মাস্টার রাস্তার দিকে সুমুখ ফিরলেন।

ফিরেই দেখলেন—কম্পাউণ্ডের সীমানায় দাঁড়িয়ে সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

বললে—কী চাই ? এখন পোস্টাফিস বন্ধ। কাল সকালে—To-morrow morning please, এখন যান। তারপর দীনুকে বললেন—আরও বাইরে দীনু —আরও বাইরে ফেলো ; Outside the Compound—

বলেই ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দেন।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে দীনুকে বললে—লোকটার কিছু হজম হয় না দীনু।

দীনু বললে—ওরে বাপরে সাক্ষাৎ দুর্বাসা মুনি গো।

আবার পোস্টমাস্টার বদল হয়। নতুন পোস্টমাস্টার বন্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন।

পোস্টাপিসেরও পরিবর্তন দেখা যায়। পোস্টাপিসের আর খড়ের চাল নাই। এ্যাজবেস্টস বা টিন হয়েছে। দেওয়ালের নতুন পলেস্তারা হয়েছে ; লেটার বক্সের মুখটি এখন পিতলের, ঝকঝক করছে। নোটিশ বোর্ডটিও নতুন। যে জানালায় পোস্টেজ বিক্রি হত মনিঅর্ডার হত সে জানালাটি এখন Expanded metal দিয়ে ঘেরা হয়েছে ; কাউণ্টারের চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দেওয়ালের গায়ে পুরানো মাস্টারের টাঙানো নোটিশবোর্ডগুলির আর একটিও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তার পরিবর্তে মোটা রকম কয়লা দিয়ে কেউ লিখে দিয়েছে—দুর্বাসা gone।

দরজা খুলে নতুন মাস্টার বেরিয়ে এলেন। পিছনে সুরেশ। বেশ নধর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, পান চিবুচ্ছেন আর হুঁকো টানছেন। এবং ঘন-ঘন ফু ফু করে করে কিছু, বোধকরি পানের কুচি জিভের ডগা থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন। বেরিয়ে এসেই পচ্ করে পানের পিক্ ফেললেন, ফু-ফু-ফু করে নিক্ষে বার কয়েক হুঁকোয় টান দিলেন। দীনু তাঁকে প্রণাম করলে। মাস্টার

দেওয়ালের লেখাটা অর্থাৎ 'দুর্বাসা gone' পড়ে খি-খি শব্দে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন—কী বললেন সুরেশবাবু, দীনু দুর্বাসা নাম দিয়েছিল? এঁ্যা দীনবন্ধুর পেটে পেটে এত?

আবার মাস্টার পরিবর্তন হয়।

এবার পোস্টাপিসের পরিবর্তনের মধ্যে সামনে একটি সুরকীঢালা রাস্তা এবং বাউণ্ডারীর চারিপাশে ফেন্সিং দেখা যায়। বাকি সব তাই আছে।

কম্পাউণ্ডের মধ্যে একখানি টোপরওয়ালা গাড়ি নামানো। গরু দুটো ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে।

পুরানো হৃষ্টপুষ্ট পান-খেকো তামাক-খেকো মাস্টার চলে যাচ্ছেন। বারান্দায় টিনের ট্রাঙ্ক, পুরানো দড়ি দিয়ে বাঁধা চামড়ার সুটকেস, প্যাকিং বাক্স, বিছানার বাণ্ডিল নামানো। সেগুলির বাঁধন পরীক্ষা করে দেখছে পিওনেরা। পিওন এখন দুজন। ভবেশ এবং হরিহর। দীনু জিনিসগুলি গাড়িতে তুলছে। গাড়িখানি দীনুরই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন নতুন পোস্টমাস্টার নিত্যানন্দবাবু। আর দাঁড়িয়ে আছে নিত্যানন্দবাবুর পনেরো ষোল বছরের ছেলেটি। সুন্দর-দেখতে, ভালোবাসার মতো ছেলে।

পুরানো মাস্টারের হাতে হুঁকোটি আছে। পচ্ করে পিচ্ ফেলে বার দুই থু-থু করে বললেন—চলি ভাই নিত্যানন্দবাবু, good bye. কোনো ভাবনা করবেন না। জায়গা ভালো। থু-থু-থু। ওর নাম কী? এরা লোক ভালো। ভবেশ হরিহর goodman সব। ভবেশ শুধু দূরের গ্রামের চিঠি এর ওর হাতে দিয়ে দেয—বলে দিয়ে দিয়ো। মধ্যে মধ্যে কমপ্লেন হয়। থু-থু। আর হরিহর বাসায় গেলে ফিরতে দেরি করে। newly married কিনা। দ্বিতীয় পক্ষ।

হরিহর বললে—কী যে বলেন বাবু?

পুরানো মাস্টার গ্রাহ্য না করেই বলে গেলেন—আর দীনু, দীনবন্ধুর জয়জয়কার হোক। ওর ঋণে পড়তেই হবে। আমার তো শোধই হবে না।

দীনু এসে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—আজ্ঞে না বাবা, উ কথা বলতে নাই, আমার অপরাধ হবে।

—হয় তো হবে দীনবন্ধু সে তোর হবে! কিন্তু আমি না বললে অপরাধ আমার হবে। উঁহু-উঁহু ভবেশ, ভেঙে যাবে বড় সাধের হুঁকো আমার, ওভাবে নয়;—ওটাকে বরং বিছানার মধ্যে দাও বাবা! তারপর আবার নিত্যানন্দবাবুর দিকে ফিরে বললেন—তবে একটি বিষয়ে সাবধান। সে বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বুঝেছেন! খুব সামলে থাকবেন!

সকলেই অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। দীনু শঙ্কিত বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিত্যানন্দবাবু বললেন—You mean this runner—this chap ?

—Yes—This chap, এই দীনবন্ধু থু-থু থু! খুব সামলে থাকবেন নইলে একটি মোক্ষম নাম দিয়ে দেবে আপনার। look, দেখুন—এই দেওয়ালে। থু-থু-থু!

নিত্যানন্দ দেওয়ালের দিকে তাকালেন—দেখলেন সেখানে উপরে লেখা—

দুর্বাসা gone—তারিখ 30th April 1934. তার নিচে লেখা—পাঁচুঠাকুর going-1938 15th September.

পুরানো মাস্টার ব্যাখ্যা করে দিলেন—দুর্বাসা মুনি হলেন আমার আগের যিনি, শিবেনবাবু। আর পাঁচুঠাকুর মানে ভূতে পাওয়া মানুষ হলাম থু থু-থু— আমি। এ-সব নাম দীনুর দেওয়া। আপনাকেও একটি দেবে থু-থু-থু! মানে—

হঠাৎ ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন—যাও তো বাবা খিলিকয়েক পান নিয়ে এস তো। আর কড়া জর্দা থাকে তো খানিকটা। হ্যাঁ।

ছেলেটি চলে যেতেই মাস্টার বললেন—আমার পুত্র পরিবার নাই, কিন্তু আপনার ছেলে, সেতো ধরুন—আমারও সন্তান তুল্য। থু-থু-থু। ওর সামনে বলব কেমন করে যে মদ খাই আমি। সন্ধ্যে বেলা কাজ-টাজ সেরে বুঝলেন—কর্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলা আমি মশাই কারণ একটু পান করি। থু-থু একটু মানে বেশ। এখানে আমার ওই সুরেশটা জুটেছিল। মধ্যে মধ্যে থু-থু বে-এক্তার হয়ে বমি-টমি করে সে নরকে পড়ে থাকতাম। সকালবেলা এ নিজেরই ঘেন্না হত বিছানা দেখে। কী করব নিজেই কাচতাম। কাকে বলব? তা দিত একদিন দেখে ফেলে। থু-থু-থু। সেই দিন থেকে ও আমাকে একদিন আর ওসব নাড়তে দেয় নি। কাচত আর বলত পাঁচু-ঠাকুব আমাব দুধ তুলেছেন। থু-থু থু খুব সাবধান আপনারও একটা নাম দেবে।

বলেই তাঁর মার্কামারা খি-খি-খি হাসতে লাগলেন।

সে-হাসির ছোঁয়াচ লাগল সকলকে। মায় দীনু পর্যন্ত মুখ নামিয়ে খু-খু-খুখ শব্দে হাসতে লাগল।

মাস্টার জের টেনে বললেন—বলে কী·পাঁচুঠাকুর আমার দুধ তুলেছেন।

বলেই আবার হাসি—অর্থাৎ আমি পেঁচোয় পাওয়া কচি ছেলে।

এই মুহূর্তটিতেই পোস্টাপিসের ভিতর থেকে ক্লক ঘড়ি বেজে উঠল— ঢং ঢং ঢং ঢং।

মাস্টার চমকে উঠলেন—একি চারটে? হ্যাঁ চারটেই তো! ওরে বাপরে

দশটায় যে ট্রেনরে বাবা। ও দীনু, ছেলে তোর এল কই ? থু-থু-থু ! ট্রেন ফেল হলে যে সারারাত থু-থু-থু স্টেশনে ভাপাতে হবেরে বাবা।

নিত্যানন্দবাবু বললেন—রাস্তাও যে অনেকটা। দশ মাইলের উপর। আর তো দেরি করা উচিত নয়।

ভবেশ পিওন বললে—তোরও যেমন কাজ দীনু, ছেলে গাড়ি নিয়ে যাবে তাকে রেখে তুই গাড়ি আনলি—

দীনু চঞ্চল এবং অপ্রতিভ হয়ে উঠল। বললে—এল না গো কিছুতেই, বললে—তুমি গাড়ি নিয়ে যাও ; আমার কাজ আছে খানিক—

হরিহর বললে—আজ তো বেটার টেরি কাটা আর হৈ হল্লোড় করা। কাজ আছে ? দেখ দেখ এগিয়ে দেখ !

দীনু সদর রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল দেখবার জন্যে ; যেতেযেতেই বললে—কী করি বলেন ? সময়টা যে আমাদের ভাঁজো পরবের কিনা ! প'শু থেকে পরব আরম্ভ। সে আবার পরবের মাতব্বর ! তারপর যেন নিজেকেই বললে—কানে কিলিয়ে বলে দিলাম। বললে—আমি গেয়েছি বলে—। ঠিক টা'য়েনে যাব আমি—

সে এসে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে ঘাড় উঁচু করে সামনের দিকে চেয়ে রইল। সামনে তার বাজারের রাস্তাটা। লোকজন চলছে, বিচিত্র নিঃশব্দ বাজারের সে-ছবি। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও নিতাই নেই।

এদিক থেকে হরিহর ব্যঙ্গ করে বললে—ঠিক টায়েনে যাব ; বেটার ট্যাঁকে যেন ঘড়ি ঝুলছে দশটা।

ইতিমধ্যে নিত্যানন্দবাবুর ছেলে পান এবং দোক্তা নিয়ে এসে দাঁড়াল। পুরানো মাস্টার সেগুলি ডিবেতে পুরতে লাগলেন, একটা পান একটু দোক্তা মুখে নিয়ে পচ্‌ করে পিক্ ফেলে বললেন—আঃ এ যে খ ্ মতিহার।

দীনু বলে উঠল—ওঃই,—ওঃই এসে যেয়েছে। দূরে বাজারের মধ্যে একখানা সাইকেল দেখতে পেয়েছে সে। নিতাই আসছে সাইকেল চড়ে।

নিশ্চিন্ত হয়ে সে ফিরে এসে গাড়ির চারিদিক দেখে নিয়ে বললে—আর কিছু পড়ে-টড়ে নাই তো বাবু ?

বলতে বলতেই সদর রাস্তায় সাইকেলে চড়ে এসে হাজির হল দীনুর ছেলে নিতাই। আঠারো-উনিশ বছরের সদ্যযুবক নিতাইচরণ। মাথায় খুব বাহারের শৌখিন টেরি। গায়ে একটা বাহারের গেঞ্জি। গলায় একটা তক্তি। কব্জিতে একটা কারের বেড়। পরনে টাইট করে মালকোঁচা বেঁধে কাপড়। কানে একটা পোড়া সিগারেট। সাইকেল চালিয়ে এল সে এবং তার পিছনে চড়ে

এল আর একটি সঙ্গী। সাইকেল থেকে নেমেই সাইকেলটা তার সঙ্গীর হাতে দিয়ে বললে—নাই বারোটা আত হতে আমি নিচ্ছক ফিরব। বুঝি! তু সব ঠিক করে আকিস। অভীন কাগজের মালা যেন ভালো করে গাঁথবি। উপাড়ার চেয়ে ভালো হ'চাই। হ্যাঁ! সঙ্গী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সাইকেলে চড়ে চলে গেল।

দীনু তিরস্কারের সুরেই বললে—তোর আকেলটা কেমন বল দিই নি? চারটে বেজে গেল। আমরা ভেবে সারা।

নিতাই উপেক্ষাভরে বললে—চারটে বাজল তো কী হল! কাজ থাকলে করব কী? আক্কেল আক্কেল! আমার নাই!

তারপর খোলা গোরু দুটোর গলার দড়ি দু হাতে ধরে গাড়ির দিকে টেনে আনতে আনতে আপন মনে গজর-গজর করতে লাগল—কোন সময়ে কোন তান তার ঠিক নাই। প'ন্ড থেকে ভাঁজো পরব। আজ যা বোলপুর গাড়ি নিয়ে।

দীনু বললে—লে-লে, গাড়ি তোল। মেজাজ খারাপ করিস না।

নিতাই একটা গোরুকে পিঠে হাতের গুঁতো দিয়ে বললে—বেকুব বেহদ্দা গোরু কোথাকার। ইদিকে। ইদিকে। অঁই—অঁই—। আবার দিলে গুঁতো। টেনে নিয়ে এল সে গোরু দুটোকে, গাড়িতে বাঁধলে—তারপর বললে—ল্যান—চড়ে বসেন।

পুরানো মাস্টার পচ করে পিচ ফেলে গাড়িতে পা দিয়ে বললেন—মিলিটারি মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা কর বাবা নিতাই! ভয় লাগছে আমার।

নিতাই হেসে ফেলে বললে—ল্যান—ল্যান চড়েন। মেজাজ খারাপ করে দেয় বাবা। ছাখেন ক্যানে—।

মাস্টার চড়ে বসে বললেন—চলি নিত্যানন্দবাবু, নমস্কার। ভবেশ হরিহর—

নিত্যানন্দবাবু বললেন—নমস্কার!

ভবেশ হরিহর হেঁট হয়ে নমস্কার করলে। দীনুও করলে।

নিতাই গাড়িতে উঠে গোরু দুটোর পেটে দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের গুঁতো এবং পিঠে আঙুলের টিপুনি দিয়ে—নাকের ঘড়র এবং জিভে ক্যা-ক্যা শব্দ করে গাড়িটাকে চালিয়ে দিলে।

মাস্টার নিত্যানন্দবাবু বললেন—এইটিই তোমার ছেলে দীনবন্ধু?

দীনু বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওই একটিই ছেলে বুঝি!

দীনু অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললে—আজ্ঞেন তাই বটে। কটা ছেলে মরে ছেলেটা হয়েছিল—মায়ের আদরে খানিক বেয়াড়া হয়ে যেয়েছে। তার ওপরে এখানে এয়েছিল একজনা ট্যাক্সিওলা—তার কাছে মোটর ধ' মোছা করতে লেগে অমুনি হল। বলে মোটর চালা শিখব। আর ওই বদ মেজাজ—

হরিহর বলে উঠল—শুধু ছেলের দোষ দিলে কী হবে? মায়ের দোষ দিলেই বা হবে ক্যানে? তুমি আদর কম দাও নেকি? ছেলে বললে সাইকেল লেবে—তাই দিয়ে দিলে—

—সি আজ্ঞে পুরনো সাইকেল—। তিরিশ টাকা নিয়ে দিলেন ওপরস্থার বাবু—

—খুব সস্তায় দিয়েছে ওভারসিয়ারবাবু। ওটা ফেলে দিলে কেউ নিত না। নতুনে পঁচাত্তর টাকা দাম। চড়েছে আট বছর—। বুয়েচেন বাবু, দীনুর স্বভাবই ওই। ছেলে বলতে অজ্ঞান। এই বয়সে একটা মেয়ে হয়েছে। তার নাম রেখেছে সম্মানী। ওঃ তার আবার কত। ব্যঙ্গ করে হলেও মিষ্টভাবেই বললে সে কথাটা। ঠিক এই মুহূর্তটিতেই সদর রাস্তায় হন্তদন্ত হয়ে এল সুরেশ বাঁড়ুজ্জে। থমকে দাঁড়িয়ে সে কম্পাউণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললে—এই যাঃ। চলে গেল মাস্টার?

বলেই ছুটতে লাগল—মাস্টার! মাস্টার! মাস্টার হে!

ভবেশ বললে—বাঁড়ুজ্জে বোলপুর পর্যন্ত যাবে তুলে দিতে।

নিত্যানন্দবাবু বললেন—এই বুঝি সুরেশ বাঁড়ুজ্জে?

ভবেশ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

একজন রানার ডাক নিয়ে এসে ঢুকল।

হরিহর বললে—রামনগরের ডাক এসে গেল—।

মাস্টার পোস্টাপিসের ঘরের দিকে ঘুরলেন।

দীনু রাস্তার দিকে পা বাড়ালে।

হরিহর এবং ভবেশের কথায় মনে সে আঘাত পেয়েছিল। নিতাইয়ের কথায়-বার্তায় ভদ্রজনদের কাছে সে অপ্রস্তুতও হয়েছে। এই দুইয়ের প্রতিক্রিয়ায় রাগ হয়েছে তার সতুর উপর। ফেরার সময় পদক্ষেপের ভঙ্গিতেই সে রাগ তার একটু পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ফিরছিল সে তাদের পাড়ার পথ ধরে।

রাঢ় বাংলার অচ্ছুত পল্লী।

মাটির দেওয়াল—খড়ের চাল—বাঁশের খুঁটি-দেওয়া পরচালা বা বারান্দাওয়ালা ছোট ছোট ঘর। উঠান রাঙা মাটি দিয়ে নিকানো। চারিপাশে কোনো পাঁচিলের ঘেরা নেই। তারই মাঝখান দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ।

পথের উপর উলঙ্গ ছেলেরা ঘুরছে, খেলছে। পতিত জায়গায় ছাগল চরছে।

বাড়ির উঠানে মুরগী চরছে। একপাশে গোরু বাঁধা রয়েছে। কোনো বাড়ির উঠানে কোনো মেয়ে কোনো মেয়ের উকুন বাচছে। কোনো বাড়িতে চালায় ঢেঁকিশালে মেয়েরা ধান কুটছে।

পথের ধারে পুকুরে হাঁস চরছে। পথের পাশে একটু দূরে একটি উৎসবের আয়োজন দেখা যায়। একটি গাছতলায় ভাঁজোর বেদী বাঁধা রয়েছে।

গাছের তলায় মাটির একটি বেদী। বেদীটিকে ঘিরে চারিপাশে চারটি খুঁটি। রঙীন কাগজ মোড়া।

সামনেটা চমৎকার করে নিকানো। সেখানে তরুণ-তরুণীরা ভিড় করে রয়েছে।

একটি তরুণ ঢোল বাজাচ্ছে। একজন বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে।

কোনোদিকেই দীনুর ক্ষুব্ধ মন আকৃষ্ট হল না। সে সটান এসে উঠল বাড়ির সম্মুখে।

দীনুর বাড়িতে এখন একখানি কোঠাঘর হয়েছে। পাশে সেই গোয়াল-ঘরটি। একপাশে দুটি গাই বাঁধা।

গাছতলায় দীনুর ছ-সাত বছরের মেয়ে সম্মানী খেলা করছে।

সে কাদার তাল দিয়ে ভাত-তরকারি রান্না করছে। স্ত্রী সদু দাওয়ায় বসে রয়েছে, তার সামনে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিলাসিনী তরুণী। তাকে দেখে দীনু থমকে দাঁড়াল। তারপর বললে—মেয়েটি ক্যা বে সদু?

সদু মেয়েটিকে বললে—রেতে এসে আবার খেয়ে যাবে। এখন ওই আথহরিদের বাড়িতে থাক গা!

দীনু আবার বললে—কে বটে মেয়েটা—? কথা কানে যায় না না কি?

মেয়েটি ঝাপটা মেরে পাশ ফিরে তাকিয়ে বলল—আমি ভাঁজো নাচতে এয়েচি। নিতাই আমার বন্ধু নোক। সে আমাকে নিয়ে এয়েচে। তুমি কে?

—ভাঁজো নাচতে এয়েছ?

হ্যাঁ। সিউড়ি থেকে। তুমি কে? এমন কথা ক্যানে?

সদু বললে—যাও মা, তুমি যাও। উ হল নিতাইয়ের বাবা।

—অ। তা এমন লাটসায়েবের মতো মেজাজ ক্যানে?

বলেই সে যেন হেলেদুলে গা দুলিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল!

দীনু বললে—তুই—সদু—তুই এর জন্যে দায়ী!

—কী, বলছ কী? হল কী তোমার?

—কিছু বলি নাই। তোর ছেলে এলে বলিস ই সব চলবে না। আমার সহ্য হবে না।

বলেই আবার বলল—তারও সহ্য হবে না সত্য। যা ধরমের সহ্য হয় না তা কারুর সহ্য হয় না। বলিস তাকে।

ছোট মেয়েটা খেলা ছেড়ে মা-বাপের কথান্তর শুনছিল। এবার তার বাপের কথা শেষ হতেই সে ছুটে বাপকে জড়িয়ে ধরে বললে—

—বাবা আমি ধরমপুজো দেখতে যাব।

—ধরমপুজো এখন লয় মা। সে সেই বোশেখ মাসে। এখন পথ ছাড়। যাই।

—না। তুই যে বললি। ধরম-ধরম-ধরম। আমি যাব।

—ই ধরম সে ধরমঠাকুর লয় মা। ই ধরম বড়া কঠিন মা—বড়া ভীষণ! ছাড় পথ ছাড়। চান করে এসে খেয়ে ছুটতে হবে। ডাকের দেরি হয়ে যাবে। ছাড়—সরকার বাহাদুরের ডাক।

সরকার বাহাদুরের ডাক নিয়ে দীনু চলে যায় ভাদ্র মাসের রাত্রিতে। রাত্রিটি অন্ধকার হলেও কিন্তু বর্ষণমুখর নয়। সুঁদীপুরের বটতলা। বহুদূরে শোনা যায় ভাঁজো-পরবের ঢোলের শব্দ।

আজ চারিদিকের গ্রামেই এই ভাঁজো পরবের উৎসব লেগেছে। বন পার হয়ে প্রান্তরের মধ্যে পথে দীনু এসে পড়ল,—সেখানেও শুনল ভাঁজো-পরবের ঢোল-কাঁসীর শব্দ। এবার গ্রাম কাছে। বাজনার শব্দ স্পষ্ট। দীনু কিন্তু চলেছে তার নির্দিষ্ট গতিতে। পথে ওদিক থেকে আসছিল একদল পথিক। একজন প্রশ্ন করলে—কে?

দীনু উত্তর দিলে—ডাক। সরকার বাহাদুরের ডাক!

বাজনা বাজতে লাগল।

নবগ্রামেও বাজনা বাজছে। ভাঁজো-পরবের আসরটি জমে উঠেছে।

সেখানে ভাঁজো-তলায় একটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে তাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে একটা হেজাক বাতি।

আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্থানটি।

ভাঁজোর বেদী সাজানো সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রচুর শালুক এবং পদ্মফুল ও নানান ফুলে সাজিয়েছে।

চারিদিকে আমের শাখা এবং কাগজের ফুল দিয়ে বেড় দিয়েছে।

মেয়েপুরুষ ভিড় করে বসেছে। মেয়েরা মাথার খোঁপায় ফুল পরেছে। গলায় মালা পরেছে।

ছুটি মেয়েতে গলা-ধরাধরি করে হাসছে। পুরুষেরা রঙীন গেঞ্জি পরেছে—মাথায় রঙীন গামছা বেঁধেছে। কেউ কেউ কোমরেও বেঁধেছে। কানে ফুল পরেছে। গলায় মালা।

নিতাই মাথায় জড়িয়েছে শালুক-ডাঁটির মালা। তার সঙ্গে অন্য ফুলের মালা। কানে ফুল। গলায় মালা। সে বাজাচ্ছে বাঁশি। একজন বাজাচ্ছে ঢোল।

নাচছে বাসিনী—অর্থাৎ শহর থেকে আসা সেই রঙ্গিনী মেয়েটি। সেও সেজেছে যতখানি পাবে। তার কোমর পর্যন্ত ফুলের মালা দুলিয়েছে সে।

কতকগুলি মেয়ে বসে একসঙ্গে ধুয়ো গাইছে।

আমার ভাঁজোর গলায় দোলে পঞ্চফুলের মালা—
কপালে সিঁদুর-টিপের ছায়ায় ভুবন আলা—
ও-আমার ভাঁজো সুন্দরী।

তারা থামতেই সব থামল। বাজনা বাঁশি নাচ সব।

এবার গান ধরলে নিতাই—

আমার মনের রঙের ছটা তোমায় ছিটে দিলে না।
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হায়—সে জল পাতা নিলে না।
টলোমলো টলোমলো—
হায় সখি সে পড়ে গেলো—
ও হায় চোখের জলের মুক্তোছটা মাটির বুকে ঝলে না।
মাটি হলে গলে মন—মানিক হলে গলে না।
আমার মনের রঙের ছটা—

শেষ লাইনে এসেই বাজনা বেজে উঠল দ্রুত তালে।

সঙ্গে সঙ্গে বাসিনী ওই নাচুনী মেয়েটি বেদীটিকে বেড়ে নাচতে শুরু করে দিলে।

মেয়েরা ধরে দিলে ধুয়ো। ধুয়ো শেষ হতেই বাজনার সমের সঙ্গে আবার সব স্তব্ধ।

এবার ওই বাসিনী ধরলে গান—

যে রঙ তোমার মিশে গেল
নীল যমুনার জলে হে—
সে রঙ গিয়ে লেগেছে যে
লাল শালুকের ফুলে হে।
সেই শালুকে মন মানিয়ো—
সকল দুখো পাসরিয়ো—

থালি মনের সিঁদুর-কৌটা—

তাও দিও ফেলে হে—

নিত্য নতুন ফুটবে শালুক—

বাসী ঝরে গেলে হে ॥

শেষ কলিতে এসে আবার বাজনা বাজল—বাঁশি বাজল ; মেয়েটি দ্রুততালে ঘুঙুরের শব্দে মুখর করে তুললে ভাঁজো-তলা।

এর মধ্যে একসময় ভোরের পাখিদের ডাক বেজে উঠল—কলস্বরে।

সকলে তাকাল উপরের দিকে।

দেখা গেল আলোটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। রাত্রির অন্ধকার ছাপিয়ে ভোরের আলোর আভাস জাগছে। উর্ধ-আকাশে আলোর ছটা বেজেছে। আবার বেজে উঠল পাখির ডাক। একটা গাছের মাথা থেকে পাখি পাখা মেলে বেরিয়ে পড়ল। আর একটা গাছ থেকে কাক এসে বসল পথের উপর।

পোস্টাপিসের সামনের যে সড়কটা সেই সড়কটার উপর। সামনে একটা বাঁক। সেই বাঁকের ওপারে শোনা গেল ঝুন-ঝুন শব্দ। বাঁকে মোড় ফিরে দেখা দিল দীমু ডাকহরকরা। কাঁধে ডাক নিয়ে দীমু নবগ্রাম ফিরছে।

ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন শব্দ তুলে দীমু এসে পোস্টাপিসের কম্পাউণ্ডে ঢুকবার মুখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পোস্টাপিসের পাশে একটা ঝোপের আড়ালে পোস্টমাস্টার নিত্যানন্দবাবুর প্রিয়দর্শন ছেলেটি বৈঠক দিচ্ছে।

প্রিয়দর্শন ছেলেটির সুগঠিত সুন্দর দেহখানি সদ্য ব্যায়ামচর্চায় সুন্দরতম হয়ে উঠেছে।

কিশোর ছেলেটির পরিপুষ্ট পেশীগুলি থেকে একটি পৌরুষব্যঞ্জক মহিমা বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন।

দীমু ডাক কাঁধে করেই এসে সেখানে দাঁড়াল। একপাশে দুটি মুগুর নামানো ছিল—সে দুটি নেড়ে দেখলে।

ছেলেটি—ছেলেটির নাম অমর—বৈঠকের মধ্যেই তাকিয়ে দেখলে দীমুকে। একটি স্মিত হাসিতে তার মুখ ভরে গেল ১কিতের জন্য। তারপর আবার গম্ভীর হল সে। ব্যায়াম শেষ করে এসে দীমুর কাছে দাঁড়াল।

দীমু বললে—আপুনি রোজ করেন বাবু?

হেসে ঘাড় নেড়ে ছেলেটি সায় দিয়ে জানালে—হ্যাঁ।

দীমু বললে—ই খুব ভালো। খুব ভালো। এমন বাঁধবে শরীর!

অমর বললে—আমাকে একটু আড়াল দেখে কেউ দেখতে না পায় এমন একটা জায়গা দেখে একটা আখড়ার মতো করে দেবে দীমু?

দীনু খুব খুশী হয়ে বললে—দোব। তার আর কী? ওই পিছন দিকে—খিড়কীর পুকুরের উপর বটগাছের তলায়—দোব করে! আজই দোব।

উ-হু। আরও একটু আড়াল চাই। বাবা যেন দেখতে না পান।

—ক্যানে বাবু? বাবু ই সব ভালোবাসেন না বুঝি?

—না। আজকাল ভদ্রলোকের ছেলে এ-সব করলে পুলিসে বড় হাঙ্গামা করে কিনা। তাই বাবা চান না। তুমি একটা ভালো জায়গা দেখে—

ঠিক এই কথাটির পরই বাড়ির ভিতর থেকে—নিত্যানন্দবাবুর ডাক শোনা গেল।—ভবেশ, উঠেছ? ভবেশ? ভবেশ!

ভবেশ সাড়া দিল—আজ্ঞে!

অমর মুগুর দুটোকে নিয়ে দ্রুত চলে গেল বাড়িটাকে বেড় দিয়ে। যাবার সময় বলে গেল—বাবাকে বোলো না। কেমন?

মাস্টার বললেন বাড়ির ভিতরে—হরিহর আসে নি? ডাক? ডাক আসে নি?

দীনু ফিরল। সেও একটু চকিত হয়েছে। সে এসে ডাকঘরের বারান্দার উপর ডাকটা নামিয়ে ডাকলে—বাবু?

এদিকে সদর রাস্তা থেকে কম্পাউণ্ডে এসে ঢুকল সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

বাঁড়ুজ্জে বললে—হ্যাঁ রে দীনু, শুনে এলি কিছু বোলপুরে?

যুদ্ধ লেগেছে আবার? হিটলার লাগিয়ে দিয়েছে?

পোস্টাপিসের দরজা খুলে বের হলেন নিত্যানন্দবাবু।—সুরেশবাবু! এত সকালে?

যুদ্ধ। যুদ্ধ লেগেছে শুনছি! সারারাত কাল ঘুমুই নি।

—কাগজ? হাসলেন নিত্যানন্দবাবু।

দীনু ডাক নিয়ে ঘরে ঢুকল।

দীনু ফিরল তাদের পাড়ার পথে। তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে। সাতটা বেজে গেছে। পাড়াটা আজ নিঝুম। ভোর পর্যন্ত ভাঁজো গান করে সকলে শুয়েছে—ঘুম ভাঙে নি। পথের ছড়ানো ফুলগুলি পড়ে আছে।

অদূরে ভাঁজো-তলা।

সেখানটাও জনশূন্য। দীনু একবার তাকিয়ে দেখলে। এখনও হেজাকটা জ্বলছে।

ভাঁজোর বেদীর সাজসজ্জা ভাঙা বাসরের মতো বিশৃঙ্খল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল দুখানা পা। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে রয়েছে। দীনু সন্তর্পণে এগিয়ে গেল। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখলে গাছের

ওপাশে যার পা বেরিয়ে আছে সে নিতাই-ই বটে। নিতাই একা নয়, আরও একজন রয়েছে! পরক্ষণেই শুনতে পেলে—নারী কণ্ঠে কেউ বলছে—

—বলেছি তো। গানেই তো জবাব দিয়েছি হে।

বলেই অতি মৃদু স্বরে গেয়ে দিল—নিতি নতুন ফোটে শালুক বাসী ঝরে গেলে হে! বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

সে বাসিনী। বাসিনী এবং নিতাই গাছতলায় গত রাত্রি সেই সাজেই গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে।

বাসিনী আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

নিতাই কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলছে।

নিতাই বলল—না। নিত্য নতুন শালুক আমার চাই না। আমি তোকে চাই।

—লারব ভাই।

—ক্যানে?

—তোমাদের যা ঘর-দুয়োর—থাকবার ছিরি—ই কষ্টে থাকতে আমি লা'র..।

—আমি পরাণ পণ করে খাটব বাসিনী।

—কী? ওই তো বাবা করে ডাক-হরকরাগিরি—তুমি কি করবে চৌকিদার? না মুটেগিরি?

বাসিনীর হাতটা ধরে নিতাই বললে—আমি মোটর চালানো শিখেছি,—লাইসেন্স করাব—ডেরাইবার হব আমি—

—বেশ তখন যেয়ো আমার কাছে।

দীনু আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে চলে গেল।

বাড়ি গিয়ে দেখলে সদু এবং নেয়ে সন্ন্যানী তখনও ঘুমুচ্ছে।

সে মাথায় হাত দিয়ে দাওয়াতে বসল।

কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে নিজের কপালে দুটো চাপড় মেরে বললে—এই। এই। এই! তারপর আবার কপালে হাত দিয়ে ঝিমোতে লাগল।

আবার মুখ তুলে ঘুমন্ত সদুর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূঢ় কণ্ঠে ডাকলে—শুনছিস। এই! এই!

সদু পাশ ফিরে শুয়ে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বললে—ঘরের ভেতরে সব ঠিক করে একেছি নিয়ে খাও ক্যানে।

—খাও ক্যানে? পিণ্ডি খাবার লেগেই আমি হা-হা করছি বটে।

—তবে কী? আমি এখন উঠতে নারব! সত্নর শেষ কথাগুলি জড়িয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল।

দীনু নিষ্ঠুর ক্রোধে ঘুরে চুলের মুঠো ধরতে গেল; গিয়েও হঠাৎ ক্ষান্ত হল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তোকে দোষ দিয়ে মেরে-ধরেই লাভ কী? যার যা মতি; যার যা নেকন!

বলে ঘরে ঢুকে ঢেকে-রাখা মদের ভাঁড় থেকে খানিকটা মদ খেয়ে, থালায় রাখা মুড়ি মুখে ফেলে চিবুতে চিবুতেই গামছায় সেগুলি ঢেলে নিয়ে মাথাল মাথায় দিয়ে কাস্তে হাতে বেরিয়ে এল। গোরুগুলি শুধু মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—চললাম তোদের লেগে ঘাস আনতে! শুধুমুখে দাঁড়িয়ে আছিস! কী করব বল—তোদের কপাল আর আমার কম্মফল।

চলে গেল সে মাঠে। সেখান থেকে বোঝা বেঁধে ঘাস কেটে নিয়ে ফিরবার সময় মাঠের ধারের আমবাগানে একটি গাছতলায় বোঝা ফেলে সে জিরুতে বসল। গামছাটা দিয়ে মুখ মুছে ঘুরিয়ে বাতাস কবতে লাগল। অনেক পুরনো আমবাগান। ছায়া সেখানে নিস্তবঙ্গ। দু-চাবটি পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। দু-চারটি পাতা খসে পড়ছে। তা ছাড়া একটানা উঠছে ঝিঁঝির ডাক। মধ্যে মধ্যে কাঠবিড়ালীরা ছুটোছুটি কবছে।

দীনু গাছে ঠেস দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল। আপন মনেই বললে—চলে যাব আমি বিবাগী হয়ে—মরুক গা সব—আমি আর এমন করে—

হঠাৎ বাগানের ওদিক প্রান্ত থেকে বাইসিক্লের ঘণ্টার ঝুন-ঝুন শব্দ শুনে চকিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

চারিদিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে—কে? এ আমবাগানে সাইকেল নিয়ে--কে?

হঠাৎ তার নজরে পড়ল—দূরে একটি গাছের গায়ে পায়ের ভর দিয়ে চেপে বসে রয়েছে পোস্টমাস্টাববাবুর ছেলে অমর। তার সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধবে দাঁড়িয়ে আর একটি সমবয়সী ছেলে। দীনু বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

ওদিকে হ্যাণ্ডেল-ধরা ছেলেটি আবার ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল; অমর গাছের তলায় তলায় মাথা গুঁড়ি করে সাইকেল চালিয়ে এদিক দিয়ে এগিয়ে আসবার পথে দীনুকে দেখে আবার একটা গাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। হেসে বললে—দীনু!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘাস কাটতে এসেছিলাম গোরুর জন্যে। কিন্তু আপনি

এখানে বাবু! বিস্ময়ের তার আর অবধি ছিল না। কারণ এই বাগানটাকে ভয়ের জায়গা বলে সকলে এড়িয়ে চলে।

অমর হেসে বললে—শুনলাম নাকি এই বাগানে তোমাদের ভূত আছে? দিনের বেলাতেও কেউ আসে না! তাই দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি এই সারারাত ডাক বয়ে এসে এখন আবার কী করতে এসেছ?

দীনু বললে—কী করব বলেন? গোরু কটা আছে, অবোলা জীব। ভগবতী! ভাদ্দ মাস। খড় নাই। কী খাবে?

ও—। ওই ঘাস কেটেছ বুঝি? ওঃ অনেক কেটেছ!

—আপুনি কিন্তু ই বাগানের সেই ওদের কথা নিয়ে হাসি তামাসা করবেন না বাবু! ঠাঁইটা সত্যিই বড় খারাপ। আমরা এই বাইরে বাইরে যাই আসি।

—কেন? ভূত মেরে ফেলে? কিন্তু ভূত যে আমি মানি না দীনু! আচ্ছা চলি। বলেই সে সাইকেল চালিয়ে খানিকটা গিয়ে আবার ফিরল, দীনু তখনও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিরে এসে বললে—তুমি যেন বাবাকে এ-কথা বোলো না দীনু। কেমন? ভারি রাগ করবেন তিনি।

—কিন্তু তিনি যদি শুধোন বাবু? যদি শুধোন—হ্যাঁরে দীনু, তোর সঙ্গে ওই গলায় দড়ের আমবাগানে আমার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? তাহলে?

অমর তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে—মিথ্যে কথা বলতে পারবে না? আচ্ছা, বাবা না জিজ্ঞাসা করলে তুমি বোলো না। কেমন? তাতে তো মিথ্যে বলা হবে না।

—আজ্ঞে বেশ। তা বলব না!

অমর বললে—তা হলেই হবে। একটু চুপ করে থেকে বললে—জান দীনু, খুব ছেলেবেলায় আমার মা মরে যান। বাবাই আমাকে মানুষ করেছেন। সেইজন্য আমার জন্যে ভারি ভয়। একটুতেই দুঃখ পান!

দীনু বেদনা অনুভব করলে। সঙ্গে সঙ্গে ভারি ভালো লাগল তার এই ছেলেটির বাপের প্রতি ভালোবাসা। সে তাড়াতাড়ি বললে—না—না—বাবু, আমি নিজে থেকে কখনো বলব না। আর—আর বাবু যদি শুধোনও তবে চুপ করে থাকব। বুয়েচেন! পেড়াপীড়ি করলে বলব—কবে বলেন দিকি? কোন বাগান বলেন তো? এক রকম করে এড়িয়ে যাব। আর বলব—না—না বাবু, আপনি দুঃখ পান সেই কাজ দাদাবাবু কখুনও করবেন না। সে ছেলেই নয়!

—আচ্ছা—আচ্ছা। আমি চলি!

বলে অমর চলে গেল।

দীনু তার গমনপথের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘাসের বোঝাটা তুলতে উদ্যত হল। অমর যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখে আবার ফিরল। নামল সাইকেল থেকে ; বললে—তুলে দেব ?

বলেই সে ধরলে বোঝাটার একটা প্রান্ত এবং অবলীলাক্রমে তুলে দিলে।

বিস্মিত হয়ে দীনু বললে—আপনার তো খুব গায়ের জোর দাদাবাবু !

—খুব ? হেসে উঠল অমর। তারপর সে আবার সাইকেল চড়ে চলে গেল।

বাড়ী ফিরেই সে রাগে ঘৃণায় যেন পাথর হয়ে গেল।

বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে সেই রঙ্গিণী মেয়েটা বাসিনী প্রায় তুফান তুলেছে। সদু প্রায় হতবাক হয়ে বসে আছে। পাড়াপড়শীরা জমেছে।

বাসিনী বলছে—তোমাদের ছেলে এনেছে আমাকে। পাঁচ টাকা নগদ দেবার কথা। সে না দিলে তোমাদিগকে দিতে হবে। আর চড় মেরেছে আমাকে। তার দরুন দশটাকা দিতে হবে আমাকে। নইলে আমি থানাতে যাব। ডায়রী করে কোর্টে গিয়ে নালিশ করব ! আমাকে চড়।

সদু বললে—বেশ সি আসুক। তুমি বস।

বাসিনী বলবে—বসব ? না। টাকা দাও আমার। আমি চলে যাব এখুনি।

দীনু এতক্ষণে মাথার বোঝাটা ফেলে সামনে এগিয়ে এল।—কী, হয়েছে কী ? তুমি চেঁচাও ক্যানে গো বাছা ?

দীনুর মেয়ে সম্মানী ছুটে এসে ভয়ার্তভাবে বললে—থানায় যাব বলছে বাবা।

—যাক থানায়। থানায় কোর্টে লাটসাহেবের কাছে যেখানে যাবে যাক। চলে যাও তুমি। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে চেল্লায়ো না।

—রাস্তায় রাস্তায় চেল্লাতে চেল্লাতে যাব আমি। নালিশ করে জেলে দোব। ডাকহরকরাকে চামচিকে সরকারী চাকরে বলেছি—তাতেই আমার বাপ-সোহাগে ছেলের মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। আমার গালে ঠাস করে চড়।—আচ্ছা—।

বলেই সে হনহন করে বেবিয়ে যাবার জন্য ফিরল।

দীনু তাড়াতাড়ি এগিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললে—দাঁড়াও।

মেয়েটা ঘুরল—কী ? সেও যেন ফণা তুলে দাঁড়াল।

—তুমি ক্যানে তা বললে ? ডাকহরকরা চামচিকে সরকারী চাকরে ?

—তোমার ছেলের আমাকে বিয়ে করবার সাধ ক্যানে ? আমি বললাম—আমাকে পুষবে ক্যামনে ? তা বলে—ডেরাইবারীর লাইসেন লেবে, মটর

চালাবে। আমি বললাম—লাইসেন করাতে টাকা লাগবে যে শ দরুনে। যোগাড় কর। তা বলে বাবার কাছে আদায় করব। তাতেই ঠাট্টা করে বলেছিলাম ; তা আমার গালে ঠাস করে চড় ? আমি নালিশ করব।

দীনু বললে—নিয়ে যাও তোমার টাকা ! দাঁড়াও এনে দিচ্ছি আমি।

বলেই সে হনহন করে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

এসে হাজির হল সে-গ্রামের প্রধান ব্যক্তি—তার পূর্ব মালিকের বাড়িতে। যিনি তাকে লাগিয়েছিলেন ডাকহরকরার কাজে।

সেখানে তখন জমাট মজলিস।

প্রধান ব্যক্তি তামাক খাচ্ছেন ; সুরেশ বাঁড়ুজ্জে যুদ্ধের সংবাদ পড়ছে। আরও দু তিনজন বসে আছে।

সুরেশ বলছে—এ যা লাগল—তা বুঝতাছ না তোমরা।

একজন বললে—তুমি পারছ ?

—নিশ্চয় ; কুরুক্ষেত্র ! এবার কৌরব কুল মানে—আমাদের এঁরা—বুয়েছ —হুঁহুঁ—হিটলার ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়বে। দেখনা কী লিখছে—বারুদ স্তূপে অগ্নিসংযোগ। একেবারে বিস্ফোরণ। দেখ না কী হয়। ধাঁ ধাঁ করে চলে আসবে বাবা—কুইক মার্চ, হেঁটে নয়—এবার যান্ত্রিক বাহিনী। গড়গড করে।

দীনু এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

কর্তা বললেন—ধানের দর আজই নাকি আট আনা চড়ে গেল ?

—আট আনা ? দশ আনা। সাড়ে দশ আনা। লাফিয়ে লাফিয়ে চড়ছে। চড়ছে। একজন বললেন।

অন্যজন বললেন—যে যেমন পারছে। বুঝছেন না। কোমর-বেঁধে বাঁধাই করতে লেগেছে।

দীনু বললে—বাবু।

কর্তা এবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন—দীনু ! কী রে ? এমন সময় ? এখন তো মাইনের সময় নয় ? গাড়ী ভাড়ার টাকা জমিয়েছিস বুঝি ?

অন্য সকলকে এর পর বললেন—দীনু আমাদের ভারি সঞ্চয়ী। মাইনের টাকাটি পোস্টাপিসে পেলেই যাবার পথে অদ্ধেক টাকা আমার কাছে জমা দিয়ে যায়।

সুরেশ বললে—এইবার আরও জমবে। বুয়েছেন না—মজা তো চাকরদের। মাইনে বাড়বে এবার তার উপর যে ইনকে লাপের ঠেলা।

একজন বললে—ইনকেলাপ ? যুদ্ধের সময় ট্যা ফো করলে বন্দুক চালিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে ! ইনকেলাপ।

কর্তা বললেন—তোমরা থামো হে! লোকটা দাঁড়িয়ে আছে—কি বলছে শুনতে দাও।

দীনু বললে—আজ্ঞে বাবু, কটা টাকার প্রয়োজন আছে। পনেরটা টাকা লোব। ভারি দরকার!

—নিয়ে যা। সরকার, দীনুর জমা টাকা থেকে পনেরোটা টাকা দাও তো।

বাড়ি এসে টাকা পনেরোটা বাসিনীর হাতে দিয়ে দিলে।

বাসিনী তখন গাছতলায় বসে ছিল স্তব্ধ হয়ে। কৌতূহলী প্রতিবেশিনী প্রতিবেশীরা তখন অধিকাংশই চলে গেছে।

টাকাটা দিয়ে বললে—যাও!

বাসিনী টাকাটা নিয়ে একবার ঘুরে তাকিয়ে সকলকে দেখে নিয়ে তার অভ্যস্ত চলনে হেলে-দুলে চলে গেল।

দীনু সতুকে বললে···সি কোথা? সি শুয়োরের বাচ্চা?

—জানি না। কোথা গিয়েছে—আমাকে বলে গিয়েছে?

—যা, উয়োর সঙ্গী-দিগে বল গা, ডেকে দেবে। বল গা আমি ডাকছি।

—সি আসবে যখন মন। তুমি চানটান কর; ঠাণ্ডামাণ্ডা হও। মাথা গরম কোরো না—লায়েক ছেলের ওপর। উ আমার ভারি রবিমানী?

—রবিমানী? শুয়োবের বাচ্চা কোথাকার! শুয়োরের বাচ্চার আবার রবিমান! (গোঁয়ারতুমি) গঁরতুমি—শুয়োরে বাচ্চার থাকে গঁরতুমি! এক নম্বরের গঁর কাঁহাকা। অ্যাঁ—মেয়েটাকে চড় মেরে দিয়েছে?

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ শুনছিল কথা। সে এবার এসে বাপের কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলে—এই বাবা!

দীনু গ্রাহ্য না-করে সতুকে বললে—ডাক ডাক, বলব না কিছু; ডাক। শুনছিস!

মেয়েটা উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলে—এই! এবার হাত দিয়ে খোঁচা দিলে।

দীনু বললে—দিব্যি করে বলছি, আমি কিছু বলব না। ডাক। বাবাকে চামচিকে বলায় বেটার আগ! বলিহারি রে বেটা শুয়োরের বাচ্চা। ডাক। তার কণ্ঠস্বরে খুশীর সুর উপচে পড়ল। সতু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল ঘব থেকে।

মেয়েটা এবার বিড়ালীর মতো পিঠে খামচে দিয়ে ডাকলে—এই বাবা! শুনতে পেচিস না কি?

দীনু বললে—অ-হ-হ। খামচাস ক্যানে—? অ্যাঁ!

মেয়েটা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাপের পানে।

দীনু বললে—তু কাঠবিড়ালি না কি ? নখের ধার দেখ !

মেয়েটা বললে—দাদাকে তু শুয়োরের বাচ্চা বলছিস ক্যানে ?

—বলবে না ? তোর দাদা নিশ্চয় শুয়োরের বাচ্চা !

—দাদা শুয়োরের বাচ্চা তো—তু কী ? তুই তো দাদার বাবা ?

—কী বললি ? সকৌতুকে সবিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দীনু বললে—কি বললি ? অ্যাঁ ? বলে হা-হা শব্দে উচ্চ হাসিতে যেন ভেঙে পড়ল।

ঠিক এই সময়টাতেই নিতাই মত্ত অবস্থাতেই এসে বাপের পায়ে হাত দিয়ে বার বার প্রণাম করে বললে—পেনাম, পেনাম। তুমি আমার বাবা। তোমাকে পেনাম ! আর কখুনও এমন কাজ করব না।

ওঠ, ওঠ। পেনাম করতে হবে না, ওঠ !

নিতাই বললে—উ তোমাকে চামচিকে বললে ক্যানে ? আমি মেরে দেলাম চড়।

—আমি তার টাকা দিয়ে দিয়েছি। খুশী হয়ে দিয়েছি। কিন্তু খবরদার—ওই উসব মেয়ের ছাঁ (ছায়া) মাড়াবি না। ও সব মেয়ে পাপ। সাক্ষাৎ পাপ ! দুনিয়ার সব সয়, পাপ সয় না। পাপ বাপকে ছেড়ে কথা কয় না।

—দিব্যি করছি। ভগমানের দিব্যি মা-কালীর দিব্যি।

দীনু ছেলেকে ধরে দাওয়ায় বসিয়ে প্রায় জোর করে শুইয়ে দিয়ে বললে—শো। এখন ঘুমো। সারা দিন ঘুমো। সদু, দে দিইনি একখানা পাখা। বলে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সদু পাখা এনে দিতেই পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বললে—খুব ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে দোব তোর। লক্ষ্মীর মতো মেয়ে। মদ-টদ ছাড়। মন পাতিয়ে কাজকর্ম কর—

নিতাই বললে—কালীর দিব্যি, ভগমানের দিব্যি—

দীনু পাখাখানা রেখে দুই হাত জোড় করে প্রণাম জানালে। সম্মানী পরিত্যক্ত পাখাখানা নিয়ে বাতাস দিতে লাগল।

দীনু তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখে ঠেকিয়ে কাঠবিড়ালির ডাক অনুকরণ করে ডেকে উঠল।

চিক-চিক-চিক-চিক !

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের গায়ে সস্নেহে থামচে দিলে।

মেয়েটা অভিযোগের সুরে বললে—উঁ ই অ-মা—

দীনু বললে—হুঁ—আমি এখন কাঠবিড়ালির বাবা ! বড় কাঠবিড়ালি যে ! বলেই আবার ডাকলে—চিক-চিক-চিক-চিক ! হুঁ-হুঁ।

মেয়েটা বললে—যাঃ।

দীনু বললে—শুয়ারের বাচ্চা আচ্ছা হ্যায়। বদমাস মেয়েটাকে ভাগায়া হ্যায়। মা-কালীকে দিব্যি কিয়া হ্যায়! জয় মা-কালী দে শত্রু ত্যাল দে, চান করে আসি!

সুরে গাইতে গাইতে সে বেরিয়ে গেল—মনো চাহে যাও হে তুমি—আমি যাইব না; কেলি কদমতলায় বৃন্দে গো!

সেই রাত্রেই সে ডাক নিয়ে গিয়ে বোলপুরে রেল-প্লাটফর্মে মেল-ব্যাগগুলি নামিয়ে একটা আলোর থামের নিচে এসে বসল, ওই গানটিই গাইতে গাইতে এল গুনগুনিয়ে—

মনো চাহে যাও হে তুমি—আমি যাইব না,
কেলি কদমতলায় বৃন্দে গো!
মানিক পেলে তুমিই নিবে আমি চাইব না—
কালো মানিক কালায়—বৃন্দে গো!

সঙ্গী অন্য রানারটি আগে থেকেই এসে বসে ছিল। আপন মনে খোলাম-কুচি দিয়ে দাগ টেনে ঘর আঁকছিল—সে মুখ তুলে হেসে বললে—আজ ভারি খুশী দীনু ভাই! গান গাইছ লাগছে?

—সি আমলের ভাঁজো গান মনে পড়ে যেল দাদা। ওঃ কী গানই ছেল! সেই উবেলা থেকে গো!

—তা বটে। তা হবে নাকি একদান বাঘবন্দী? ঘর আমি এঁকে একেছি।

—তা বস! তার আগে ভাই একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে কিন্তুক।

সঙ্গী খোলামকুচির গুটি সাজাতে সাজাতে বললে—বল! কথা কী বল!

—একটি ভালো কন্যে দেখে দিতে হবে। ভা—লো কন্যে। বুয়েচ। বেটাটার আমি বিয়ে দোব!

—কন্যে? তা তোমার ভাবনা কি? মেলাই কন্যে!

—মেলাই তো বটে। কিন্তু সো-ন্দ-র কন্যে চাই। আমার বেটার আবার নাক-খানিক উঁচু! বুয়েচ!

—সো—ন্দো—র কন্যে! তোমার বেটার নাক-খানিক উঁচু! ভালো করে ভেবে দেখতে হয়! সো-ন্দ-র কন্যে!

—হ্যাঁ—ভাঁজোতে নাচতে-মাচতে পারে। বেশ রহলা-কহলা—বুয়েছ মানে—চোখোল-মুখোল মেয়ে চাই; বেটার উঁচু নাকে দড়ি বেঁধে ঘুরুতে পারা

চাই। তা-পরেতে একটা-দুটো বেটাবেটি হলে তখন আমি নিশ্চিন্তি ; তখন ঘোড়ার মুখে কাঁটা লাগাম!

—হুঁ। ব—সে বসে তখন মজা দেখ ক্যানে!

দীনু বললে—শুধু মজা দেখা? তা দিগে উস্কে দিয়ে মজা দেখব! হুঁ। হুঁ! লাও—এই চললাম আমি। আমার ছাগল! চালো।

—এই এক কাট!

মুসাফেরখানায় তখন স্টল-ওয়ালা হাঁকছে—চা গ্রোম।

একটা ফেরিওয়ালা হাঁকছে—পান বিড়ি।

যাত্রীরা শুয়ে আছে।

ওদিকে ঘণ্টা পড়ে গেল—ঢনো-ঢনো-ঢনো-ঢনো।

মেলট্রেন আসছে।

প্লাটফর্মের উপর ওই ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে ইঞ্জিনের সার্চলাইট পড়েছে।

দীনু এবং অন্য রানার দুজনেই খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

অন্য রানারটি হাত তুলে আড়ামোড়া ছেড়ে বললে। উঠো মুসাফের বাঁধো গাঁঠেরি—চলো এখন—পাঁচ কোশ পথ—ঝুন-ঝুন-ঝুন-ঝুন—

ঝুন-ঝুন-ঝুন-ঝু—ঘণ্টার শব্দ তুলে দীনু ভোরবেলা এসে ঢুকল নবগ্রামের ভিতর।

একটা কুকুর উঠল ঘেউ ঘেউ করে।

দীনু বললে—যা মলো। রোজ দেখেও চেনো না? ওরে বাবা, সরকারী ডাক! ভাগো বেকুব কাঁহাকা!

সামনেই একটা চায়ের দোকানের উনোনটা রাস্তার উপর ধোঁয়াচ্ছে।

একজন পুলিস কর্মচারী বাইসিক্ল চড়ে তাকে অতিক্রম করে চলে গেল।

একটু পরেই ইস্কুল। পাশে বোর্ডিং।

সেখানে দুজন কনেস্টবল দাঁড়িয়ে।

দীনু বিস্মিত হয়ে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। এত ভোরে এখানে পুলিশ! আবার চলতে লাগল।

একটু এগিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকাল। আবার চলল।

পোস্টাপিসের সামনে এসে তার বিস্ময় উঠল চরমে।

পোস্টাপিসের সামনে কজন কনেস্টবল। কোয়ার্টারের দরজাতেও একজন।

বারান্দায় নিত্যানন্দবাবু দুজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন।

পিওন ভবেশ দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

সদর রাস্তায় ভয়ার্ত মুখে ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

সুরেশ একটু এগিয়ে এসে—মৃদুস্বরে বললে—অ দীনু, মাস্টারের ছেলেকে ধরতে এসেছে পুলিসে রে।

দীনুও মৃদুস্বরে সবিস্ময়ে বললে—অমরবাবুকে ?

—হ্যাঁ রে। সাংঘাতিক ছেলে। বোমা পিস্তল—স্বদেশী !

—না বাবু। মিছে কথা।

—মিছে কথা নয় রে ; নইলে সে পালাবে কেন ?

—পালিয়েছে ?

—হ্যাঁ ! হ্যাঁ। পাখি রেতেই ফুরুত ধা।

ওদের কথায় ছেদ পড়ল বুটের শব্দে। বুটের শব্দ উঠতেই ওরা চুপ করল। ওদের সামনে দিয়ে কনেস্টবলেরা চলে গেল। পিছনে অফিসারেরা।

একজন অফিসার থমকে দাঁড়ালো।

—বোলপুর থেকে ডাক আনছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুষ্ককণ্ঠে দীনু উত্তর দিলে।

—মাস্টারবাবুর ছেলেকে পথে দেখেছ ? বাইসিক্লে চড়ে—

—আজ্ঞে না হুজুর।

—হুঁ। যাও, ডাক নিয়ে ভেতরে যাও।

চলে গেলেন তিনি। দীনু ডাক নিয়ে ভিতরে গিয়ে বারান্দায় ডাক নামালে ! মাস্টার তখন ঘরের ভিতর মাথা নিচু করে ঢুকছেন।

পিওন বললে—ঘরে—বাইরে আর ডাক নামাবি না।

দীনু মৃদুস্বরে বললে—অমরবাবুকে ওরা—

পিওন বললে—হ্যাঁ, চেঁচাস না !

বাড়ি গিয়েও দীনু চুপ করে ছিল। স্তব্ধ হয়ে।

মনটা তার খারাপ হয়ে গেছে। অমরবাবুর মতন ছেলে—!

স্ত্রী সদু গোরুগুলিকে খাবার দিচ্ছিল। সম্মানী একটা বাছুরকে দড়ি ধরে টানছিল। গায়ে হাত বুলোচ্ছিল। দীনু বসতেই সম্মানী ছবি চিঠি ছবি চিঠি—বলে ছুটে এসে বাপের হাত থেকে দুখানা রঙীন খাম টেনে নিয়ে শুঁকে বললে—কা সোন্দর সুবাস, দেখ মা !

সদু মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে এইভাবে স্তব্ধ দেখে বললে—এমন করে বসলা যি গো ? কী হল ?

দীনু উত্তর দিলে না।

সদু বললে—জ্বর-টর হইছে না ক গো ?

মেয়েটা বললে—এই বাবা আ কাড়্ ক্যানে! বাবা!

দীনু বললে—চ্যাচাস না রে চ্যাচাস না। পরানটো আমার ছাড়া-ছাড়া করছে। চ্যাচাস না।

ঠিক এই সময়েই বাড়ি ঢুকল নিতাই। আজ তার চেহারা দিব্য ফিটফাট। বাপকে দেখে বলে—আইচ ফিরে? কাণ্ড শুনেছ? তোমার মাস্টারবাবুর ছেলের?

—শুনেছি! তাই বলছেলাম—পরানটো আমায় ছাড়ো-ছাড়ো করছে।

—ওই গলায় দড়ের আমবাগানটো একবারে তছনছ করছে পুলিসে। মাটি খুঁড়ছে। বলে বোমা-বন্দুক লুকোনো আছে।

দীনু চমকে উঠল। মনে পড়ে গেল তার আমবাগানে অমরের ঘোরাঘুরির কথা। ছেলের মুখের দিকে একবার চকিতভাবে তাকিয়ে সে মাথা নিচু করলে।

সদু বললে—তা তু যে গেলি ঘাস কেটে আনতে, ঘাস কই?—

নিতাই বললে—উ আমি পারব না। বাবা—যে ভাদুরে গরম আর সুঙসুড়ি! আর জোঁক কী? এই বড় বড়!

দীনু বললে—দে, আমার কেদে দে সদু। আর মুড়ির গামছা।

নিতাই বললে—যেতে হবে না। সি আমি বলে দিয়ে, অতন দিয়ে যাবে।

সদু বললে—অতন দিয়ে যাবে, পয়সা লেবে না?

দীনু উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল। মদের ভাঁড়, কাস্তে, গামছা বাঁধা মুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল।

নিতাই তখন বলছে—সি টাকা আমি দোব দোব।

—তু দিবি?

হঁ তো কি? দোব কি—একটো টাকা দিয়ে দিয়েছি আ।

—টাকা তু কোথা পেলি?

—আজারা মানিক কোথা পায়?

সদু বললে—টাকা উ কার কাছে ধার করেছে। শুধোও তুমি ওকে। সেই ভোরে উঠে কোথা যেয়েছিল। যখন ফিরল তখন—ওর কোঁচড়ে টাকা ছিল।

দীনু বললে—নিতাই! শাসনের সুরেই সে বললে।

নিতাই বললে—অই তুমি চোখ আঙাতে লাগলে দেখি! বেশ করেছি—আমি ধার করেছি। আমি ওজকার করে শাধ দোব।

—হঁ। ভাঁজোর সেই মেয়েটাকে যেমন ওজকার করে দিয়েছিলি টাকা—তেমনি করে দিবি!

—দোব! দোব! দোব! মটর ডেরাইবারির লাইসেন্ লি—তারপর

দিই কি না দেখো! লাইসেন করতে আমার শ দুই-আড়াই টাকা লাগবে—তুমি দাও। দেখো আমি কত ওজকার করি!

—টাকা আমার নাই নিতাই। মটর ডেরাইবারির বাসনা তু ছাড়।

—সি আমি ছাড়ব না। টাকা তুমি দাও চাই নাই দাও বলতে বলতেই সে বেরিয়ে চলে গেল।

সতু ব্যাকুলভাবে ডাকলে—নেতাই। অ—নেতাই!

সন্ন্যাসী ছুটে খানিকটা গিয়ে ডাকলে—দাদা—!

দীনু সতুকে গম্ভীর স্বরে বাধা দিয়ে বললে—খবরদার ডাকবি না! খবরদার। যেখানে মন যাক উ!

সতু বললে—তা উ যদি ডেরাইবার হয়—তো টাকা দাও ক্যানে তুমি। একটো ছেলে—

—একটো ছেলের জন্মে সতু—মাসে মাসে দশ টাকা বারো টাকা করে বাবুর কাছে জমিয়ে বছরে বছরে দশ কাঠা পাঁচ কাঠা করে পাঁচ বিঘের ওপর জমি করেছি। কোঠাঘর করেছি—ছেলে-বউ শোবে। ডেরাইবার হলে সে জমি আমার ঠায় শুকিয়ে পড়ে থাকবে—চাষ হবে না। লইলে বেচে খেয়ে দেবে উ। ডেরাইবার আমি দেখেছি। ওতে শুধু ধরম লয় সতু, জাতসুদ্ধ যাবে। আর টাকাও আমার নাই। জমি কিনে পঞ্চাশ টাকা ছিল—তা থেকে পনের টাকা এনে সেই রঙ্গিণীকে দিয়েছি। টাকা আমার নাই। থাকলেও—

কথাটার উপরেই উঁচু গলায় কথা বলে প্রবেশ করল ভবেশ পিওন।

—দীনু, অ দীনু!

—পেওনবাবু! হঠাৎ—? বাবুর ছেলে?

পিওন ভবেশ চিঠির তাড়া হাতে ব্যাগ কাঁধে ডাক বিলি করতে বেরিয়েছে। পথে দীনুর বাড়িতে এসেছে। বললে—সে তো পালিয়েছে। ধরা পড়ে না পড়ে, তার কপাল। এখন মুশকিল হয়েছে দীনু, মাস্টার বড় মুষড়ে গিয়েছেন।

—আহা—তা—আর যাবেন না?

—আজ হাটের দিন ছিল—হাট হয় নাই। আমার বিটি আছে ভিন গাঁয়ে। হরিহরের জ্বর। তু বাবা তোর ঘরে লাউ-টাউ কি কুমড়ো-টুমড়ো থাকে তো নিয়ে যা। আর মাছ পো-খানেক। আর তুই বাবা আজ ওখানেই থাকিস। বুঝেছিস? সুরেশ বাঁড়ুজ্জে আছে, তুইও থাকিস।

—আজ্ঞে বেশ! এখুনি চললাম আমি।

দীনু পোস্টাপিসে এল একটি লাউ, কিছু বেগুন, কিছু লাউয়ের শাক এবং মাছের খাড়ুই হাতে করে। বেলা প্রায় বারোটা।

বাইরের বারান্দায় নিত্যানন্দবাবু এবং সুরেশ বসে আছে। সুরেশের হাতে কাগজ।

মাস্টার বলছেন—ও ছেলের আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি, বুঝেছেন বাঁড়ুজ্জে।

সুরেশ বললে—না—না—না। ও কী বলেছেন? এখন তো এসব ঘরে-ঘরে গো। রায়বাহাদুরের ছেলে বন্দেমাতরম্ বলে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে! পালিয়েছে আবার দু দিন পরে ফিরবে। তখন ধরে-পড়ে—

—উহুঁ! এ-ছেলেদের জাত আলাদা বাঁড়ুজ্জে। আমার ছেলে বলে বলছি না—

ঠিক এই মুহূর্তেই দীনু জিনিসগুলি নিয়ে দাঁড়াল।

মাস্টার কথায় ছেদ টেনে বললেন—এ-সব আবার কী আনলি রে? ভবেশ বলে গেল বুঝি? কেন আনলি বাবা? দরকার ছিল না। কে রাঁধবে বল? আমার আর খেতে ইচ্ছে নাই।

বাঁড়ুজ্জে বললে—আমি রাঁধব মাস্টার, আমি রাঁধব। যা—যা দীনু, বাসার ভেতর রাখ গিয়ে। আর উনোন টুনোনগুলো দে দেখি ঠিক করে। বেটারা উনোনসুদ্ধ খুঁড়ে দিয়ে গিয়েছে।

দীনু চলে যাচ্ছিল।

মাস্টার পুরানো কথার জের টেনে বললেন—ও-ছেলে গুলি খেয়ে মরবে, নয় কাউকে গুলি করে ফাঁসিকাঠে ঝুলবে, নয়তো বোমা-টোমা করতে গিয়ে নিজের হাতে মরবে। নয়তো—

একটু থেমে বললেন—ধরা পড়ে ডাকাতি ষড়যন্ত্র রাজদ্রোহ অপরাধে আন্দামান যাবে। মরবার সময় ছেলের হাতের জলও আমি পাব না বাঁড়ুজ্জে, আগুনও না!

খেতে বসে মাস্টার সেই কথার জের টেনে বললেন—বুঝেছ বাঁড়ুজ্জে, সংসারে যে-জিনিসের যে-অঙ্গের যত মূল্য তারই যন্ত্রণা তত বেশী।

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—মাস্টারবাবু! মাস্টারবাবু!

মাস্টার বললেন—দেখ তো দীনু, কে? বল আমি আসছি!

দীনু বারান্দার একপাশে বসে ছিল চুপ করে। শুনছিল কথা। বাঁড়ুজ্জে মাস্টারকে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিল। তরকারির থালা এবং একখানা হাতা হাতে সামনে বসে ছিল। উঠানে একটা কুকুর বসে ছিল উচ্ছিষ্টের আশায়। দুটো কাক বসে ছিল অদূরে।

দীনু উঠে চলে গেল।

বাঁড়ুজ্জে বললে—আর একখানা মাছ দিই। ওই ভাত কটা ভাঙুন।

মাস্টার বললে—গলা দিয়ে যাচ্ছে না বাঁড়ুজ্জে! বলেই পাতের মাছখানা কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বললেন—নে, খা।

দীনু ফিরে এসে বললে—কজনাই দাঁড়িয়ে আছে, মনিঅটার করবে। ধানের মহাজন নন্দী মশায় সুদ্ধ অয়েচেন। তেনার আবার ইনসিওর আছে।

মাস্টার উঠে পড়লেন।

বাঁড়ুজ্জে হাঁ-হাঁ করে উঠল।—উঠবেন না। অম্বল, অম্বল—দিই।

মাস্টার উঠে বললেন—লোকের কাজ আমাম দুঃখু মানবে না বাঁড়ুজ্জে। তার ওপর ছেলেটা যা করে গেল—তাতে সামান্য খোঁচাতেই আমার চাকরি চলে যাবে ভাই!

আঁচাতে আঁচাতে বললেন—তুই যেন ভাত নিয়ে যাস দীনু। আর সকাল সকাল আসিস বাবা। ভবেশ কখন ফিরবে, কে জানে, হরিহরের জ্বর। ডাক বাঁধা—চালান—সব আজ আমার এক হাতে!

গামছায় ভাতের থালা বেঁধে নিয়ে দীনু মাস্টারের বাসা থেকে বেরিয়ে এল। তখন পোস্টাপিসের বারান্দায় পাঁচ-সাত জন লোক জমে রয়েছে।

কেউ মনিঅর্ডার করছে। কেউ করবে রেজেস্ট্রী।

ঘরের ভিতর মাস্টার টাকা বাজাচ্ছেন। মনিঅর্ডারের টাকা বাজিয়ে নিচ্ছেন। শব্দ উঠছে।

ওদের মধ্যেই রয়েছে চাল-ধানের মহাজন নন্দী মশায়।

তিনি একখানা ইনসিওর-করা খামের শীলমোহর ভালো করে দেখছেন।

ওদিকে বাজারের মধ্যে কোথাও হচ্ছে বাউলের গান। গানটি শোনা যাচ্ছে, বাউলকে দেখা যাচ্ছে না।

বাউল গাইছে

"মনরে আমার হায় শুনলি না বারণ।

সোনার হরিণ ধরতে গেলি—ঘরে হল সীতা হরণ

হায় শুনলি না বারণ!

জীবন-সুতোয় বুনিস যে ফাঁদ সেই ফাঁদেতেই হয় মরণ।

আপন রসের সুতোয় বোনা ফাঁদেই হয় মরণ।

সেই মুহূর্তে উঠল আর-একটা শব্দ। আকাশে এরোপ্লেনের শব্দ।

সশব্দে একখানা প্লেন উড়ে গেল।

দীনু সবিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

সদর রাস্তা ধরে সজোরে ভাঙা সাইকেল চালিয়ে চলে গেল নিতাই।

সে আস্ফালন করতে করতেই গেল—চল—তু কত জোর যাবি। চ—ল।

দীনু ডাকলে—অই—অই—নেতাই! অই।

নিতাই তখন বেরিয়ে চলে গেছে।

বাড়িতে এসে দীনু স্ত্রীকে বললে—নেতাই এলে বলিস, জমিতে জল আছে কিনা দেখতে। বাবু আমার সাইকেল চড়ে উড়োজাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে!

সদু বললে—উড়োজাহাজের সঙ্গে পাল্লা?

—হ্যাঁ। সি একেবারে বোঁ বোঁ করে চক্ষের নিমেষে চলে গেল।

সদু বললে—উড়োজাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে? এখুনি যিটো যেস?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

—হেই মা গো!

—তাকে তু বলিস,—জমির জল না দেখে এমন করে সাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ালে আমার সঙ্গে ভালো হবে না—বলে দেলাম।

—সি উ সব দেখতে পারবে না, সে তুমি আগই আর ওযই! সি চাকরি পেয়েছে।

—চাকরি?

—হ্যাঁ, ওই মহাজনদের গদিতে-মদিতে না কোথা বটে বাপু। তাগিদে-টাগিদে ফরমাস-টরমাস করবে—মাসে বারো টাকা মাইনে।

—বারো টাকা মাইনে? মাসে যি তার মদ লাগে দশ টাকা। দু টাকাতে প্যাটের ভাত, চুলের ত্যাল, ওই বাহিরে গেঞ্জি ফের[illegible] দু টাকায় হবে? বলে দিস—আমি আর একটি পয়সাও দোব না, খেতে দিতেও [illegible]রব।

বলেই সে চলে গেল তার বল্লম পেটি নিয়ে, জামাটা কাঁধে ফেলে।

তখন সূর্য পাটে বসেছে।

নিজেদের পাড়ার প্রান্তে বেনেপুকুরের পাড়ের উপর দিয়ে যে-পথটা সেই পথ ধরে চলছিল। পূর্ব পাড়ে উঠলেই পশ্চিম পাড়ের ওপারে অবারিত মাঠ। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য তখন অস্তোন্মুখ। লাল আলো পড়েছে মাঠে। মাঠের পথ ধরে আলোর পটভূমিকে পিছনে রেখে বাউল চলেছে তার হাতের একতারা বাজিয়ে আপন মনেই ওই গানটার শে[illegible] লাইন গাইতে গাইতে—

রসের সুতোর ফাঁদ পাতিলি—

নিজেই নিজে ধরা দিলি—

ও তোর রসের নাচন কোঁদন—শেষ হল হায় কাঁদন।

ও মন শুনলি না বারণ।

এখন ফাঁদ কেটে হ প্রজাপতি নইলে তো আর নাই বাঁচন।

কাঁদিস না মন অকারণ।

দীনু দাঁড়িয়ে শুনলে। বাউল দূরে চলে গিয়ে আমবাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সূর্য তখন সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। পাখি কলরব করে উঠল।

সূর্য ডোবে, আবাব ওঠে।

সূর্য উঠছে। পাখি কলরব করছে।

দীনু ডাক নিয়ে পোস্টাপিস কম্পাউণ্ডে ঢোকে।

কম্পাউণ্ডের ফুলগাছে ফুল ফুটেছে। প্রজাপতি উড়ে বেডাচ্ছে। ফুলে বসে মধু খাচ্ছে।

ভবেশ পিওন ভিতব থেকে দরজা খুললে।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে এল বাইরে থেকে।

আরও দু-একজন ডাক দেখার লোক এল।

সাইকেল চডে এল নিতাই। দীনু তখন ভিতরে।

নিতাই নেমেই দরজার মুখে এসে দাঁডাল—নিতাই? কী রে? বাড়ির সব—

নিতাই বললে—ভালো আছে। আমি পেওনবাবুকে ডাকছি। ওই নতুন মাড়োয়ারী বাবুর এনসেয়োর আছে কিনা শুধোব। বাবু পাঠালে।

দীনু সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরলে।

ঘরের ভিতর পিওন ভবেশ তখন ডাক কাটছে।

মাস্টার নিত্যানন্দবাবু বাসার ভিতর থেকে ঘরে ঢুকছেন।

দীনু বললে—একটুকুন তাড়াতাড়ি করেন বাবু। আমাকে মাঠে যেতে হবে। আউশ-ধান খোড়ের সময়, জল না থাকলে সর্বনাশ হবে।

দীনু মাঠের মধ্যে ঘুরে বেডায় কোদাল হাতে। আলোর উপর পড়ে রয়েছে ঘাসের বোঝা।

আর গুনগুন করে—আহা—

রসের সুতোর ফাঁদ পাতালি

নিজেই নিজে ধরা দিলি—

হায়—হায় তাই বটে। বলে একটা জল বের হওয়া গর্তে দু কোদাল মাটি

কেটে দিয়ে পা দিয়ে চেপে দিতে লাগল। আর বলতে লাগল—কাঁকুড়ির জ্বালাতে অস্থির রে বাবা! অ্যাই—অ্যাই—অ্যাই! লাথির সঙ্গে সঙ্গে অ্যাই—অ্যাই শব্দগুলি তার মুখ থেকে বের হল তালে তালে।

আকাশে ছায়া নেমে এল। সেখানে মেঘ জমেছে।

মাঠ থেকে ফেরার পথে—বেনেপুকুরের পাড়ে গাছতলায় একটি মেয়ে বসে ছিল—; ঘাসের বোঝা মাথায় দীনু তাকে দেখে চমকে উঠল! এ যে সে সেই রঙ্গিনী বাসিনী।

মেয়েটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে বাঁ হাতে কপালের একগুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে পাক দিচ্ছে; চোখের দৃষ্টি তার সেই চুলের গুচ্ছটির দিকে; এবং মৃদু মৃদু হাসছে।

দীনু হনহন করে চলতে শুরু করলে। ম্লান হয়ে গেছে দিনের আলো। আকাশে মেঘ ঘন হয়েছে।

বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মৃদু গর্জন হল মেঘের।

বাড়িতে এসে কোদালখানা রেখে ঘাসের বোঝাটা সশব্দে ফেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে যদি নিতাইকে দেখতে পায়।

মেঘাচ্ছন্নতার মধ্যে সদু সেদিন উঠানে বসে কাটারি দিয়ে একটা শুকনো ডালকে কেটে জ্বালানী তৈরী করছিল।

সন্মানী কোমরে হাত দিয়ে নেচে গাইছিল—নিত্য নতুন ফোটে শালুক,—বাসী ঝরে গেলে হে!

দীনু এসে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে—কেটে ফেলাব।

মেয়েটা ভাঁ করে কেঁদে ফেললে।

সদু অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে—ওই. তুমি ক্ষ্যাপলা না কি?

—হ্যাঁ আমি ক্ষেপেছি। সি কোথা?

—ক্যা?

—তোর বেটা?

বলেই হনহন করে বেরিয়ে গেল।

সে গেল মাড়োয়ারীর গদীতে।

লোকজন ধান বোঝাই গাড়িতে চারিদিক ভর্তি। ঢালা ধান পড়ে আছে, চারিদিকে লোকজন ব্যস্ত হয়ে ধান ঢাকছে তালপাতার চাটাই দিয়ে। বৃষ্টি আসবে।

বারান্দায় গদীতে বসে আছে মাড়োয়ারী। পাশে কর্মচারী লিখছে।
মাড়োয়ারী ইন্‌সিওর-খামে শীল করছে।
দীনু এসে ডাকলে—নেতাই?
একজন কুলীকে জিজ্ঞাসা করলে—নিতাই? নিতাই কোথা মলীন্দ?
—নেতাই? সি আজ ছুটি নিয়ে যেল যি! এই তো যেল। (বলেই হাসলে)
—তু হাসলি ক্যানে মলীন্দ?
—হাসলাম এমনি। তবে তাকে খুঁজো না? পাবে না!
—হ্যাঁ। তাই সে বলে যেন আমাদিকে।
—হুঁ!
আবার সে হনহন করে চলল।

এল সেই পুকুরপাড়ে গাছতলায়।
কিন্তু কোথায় বাসিনী? কোথায় নেতাই?
চারদিকে চেয়ে দেখলে সে। কই?
হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দে সে চমকে উঠল—সে হাসি বাসিনীর।
খানিকটা দূরে আর একটা ছায়াঘন গাছতলা। সেই গাছতলা থেকে বাসিনী হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে এল। তার পিছনে পিছনে তাকে ধরতে ছুটে এল নিতাই।
দীনু উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিয়ে উঠল—নেতাই!
নেতাই থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরে তাকাল।
দীনু আবার ডাকলে—নেতাই!
এবার ওদিক থেকে ছুটে এসে বাসিনী নিতাইয়ের হাত ধরে টানলে, বললে—ধ্যেৎ—। এস।
দীনু চিৎকার করে উঠল—আজ থেকে আমি জানব আমি নির্ব্বংশ, জানব তু মরেছিস!
বলেই সে পিছন ফিরল। পিছনে ভেসে এল বাসিনীর খিলখিল হাসি।

ইতিমধ্যে নামল বর্ষণ। পুকুরের জলে চড়বড় শব্দে জলের ধারা পড়তে লাগল।
বাড়ি এসে দাওয়ায় বসল কয়েক মুহূর্তের জন্য। বর্ষণ হচ্ছে। তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে।
মেয়েটা বললে—বাবা!

দীনু বললে—খেলা করগা যা। জ্বালাস না।

বলেই সে উঠল। কণ্ঠস্বরে তার একসঙ্গে ক্ষোভ এবং হতাশার সুর।

সদু সভয়ে বললে—কোথা যাবা?

দীনু উত্তর দিলে না। সেই বর্ষণের মধ্যেই চলে গেল।

মালিকের বাড়িতে এল সে। তখনও রিমিঝিমি বর্ষণ হচ্ছে।

মালিক তখন একলা বসে আছেন। সামনে কাগজ পড়ে আছে।

কাগজের হেড লাইনে লেখা—"থানার মালখানা ভাঙিয়া বন্দুক লুট।"

দীনু মালিকের পায়ে ধরে বললে—জমি আমার চাই না বাবু, জমির সাধ আমার মিটেছে। জমি নিয়ে আমাকে টাকা দ্যান। তিন শো টাকা!

—জমি বেচে দিবি?

—ছেলে মটর চালাবার লাইসেন করবে। কোম্পানীকে লাগবে। ফি· লাগবে!

—বেশ—তাই নিস। যা জমা করেছিলি তাই নিস, জমি আমি নেব।

বাড়ি এসে সদুকে বললে—তাকে বলিস, লাইসেনের টাকা আমি দোব। কিন্তু বাসিনীকে ছাড়তে হবে। বলিস, নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলব। বুঝেছিস, বলিস!

আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মৃদু মেঘ গর্জন হচ্ছে। তার সঙ্গে নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের মধ্যে চলে দীনু ডাক নিয়ে।

অন্ধকারের মধ্যে চলে শুধু লণ্ঠন।

আর ঝুনঝুন শব্দ। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায় সেই আলোতে চলন্ত দীনুর পিছনটা দেখা যায়।

ক্রমে আরম্ভ হয় বন। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আরম্ভের দৃশ্যটি ফুটে ওঠে।

ডাক্তারের গাড়ি চলে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে ঘন অন্ধকারে গড়া মূর্তির মতো একটা মূর্তি পাশ থেকে এসে দীনুর সামনে দাঁড়াল।

মাথায় পাগড়ি, মুখে ফেটা বাঁধা। সে এক দুর্বোধ্য মূর্তির মতো। হাতের একটা লোহার ডাণ্ডা উদ্যত করে—চাপা গলায় বললে—রোখকে।

দীনু চিৎকার করে উঠল—খবরদার—।

সে বল্লমটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে।

হাসপাতালে বিছানায় শায়িত বিহ্বল দীনুকে নাড়া দিয়ে নার্স বললে—

—কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার।

দীনু আবার বললে, সরকার বাহাদুরের ডাক!

নার্স দিলে মুখে-চোখে জলের ছিটে।

দীনুর সম্বিত ফিরল—সে বললে—অ্যাঁ? অ্যাঁ।

—কী হল। চিৎকার করছিলে কেন?

দীনু বললে—না। চীৎকার করি নাই। ওই কথাগুলান মনে করছেলাম—তাই—

অপ্রতিভের মতো হাসলে।

বুটের শব্দ তুলে প্রবেশ করলেন—এস-পি। ইনসপেক্টর। কনেস্টবল।

ঢুকবার মুখেই এস-পি কথা-কটি শুনেছিলেন। তিনি বললেন—মনে করতে চেষ্টা করছিলে? good! তোমার সাহস আছে। একটু চেষ্টা করলেই মনে পড়বে সব।

তারপর চারিদিকে চেয়ে দেখে বললেন—জানালাটা খুলে দাও তো। অন্ধকার হয়ে গেছে বড্ড।

কনেস্টবল জানালা খুলে দিতেই আলো হয়ে উঠল ঘর।

দীনু চমকে উঠল। সাহেবকে বললে—সেলাম হুজুর!

নড্ করে—সাহেব বললেন—এখুনি তুমি বলছিলে মনে করছিলে সব—মনে পড়েছে?

- আজ্ঞে হ্যাঁ। অভিভূতের মতো সে বললে।

—কী হয়েছিল? ডাক্তারবাবু বলেছিলেন কয়েক মিনিটের ব্যাপার—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী হয়েছিল? কোথা থেকে এল তারা? ডাক্তারের গাড়ির আলাতে রাস্তার উপর কাউকে দেখতে পাও নি।

—আজ্ঞে না।

—তা হলে বনের ভিতর থেকে এসেছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই বটতলার ওইখানে—

—হুঁ। সুঁদীপুরের বটতলা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কত জন? ক-জন ছিল তারা? ডাক্তার বলেছিলেন, একজনকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ কী? ক-জন ছিল?

—আজ্ঞে?

—ক-জন ছিল—মনে করে দেখ!

—আজ্ঞে অন্ধকার, সি লাফ দিয়ে এসে ছামনে—

—কে সে?

—আমি হাঁকিয়ে উঠলাম খবরদার বলে -

সে স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ দিয়ে গড়িয়ে এল দুটি জলের ধারা—

—কেঁদো না, কেঁদো না, কান্নার কিছু নাই। নিজে বেঁচেছ, ডাক বাঁচিয়েছ। সাহসী লোক তুমি, কেঁদো না।

দীনু তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললে—আজ্ঞে না।

—এখন বল, সে লোকটা কে? অন্ধকার হলেও খানিকটা নিশ্চয় চেনা যায়।

দীনু স্তব্ধ হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল।

—বল! দীনু! ধমকের সুরে ডাকলেন এস-পি।

দীনু চমকে উঠল।

—বল। তুমি তাকে চেন! চিনতে পেরেছ! অন্ধকারেও তুমি তাকে চিনেছ! বল।

তার খুব কাছে এসে বললেন—পোস্টমাস্টারের ছেলে।

দীনু চমকে বলে উঠল—হুজুর—

—তার হাতে যেটা ছিল—সেটা লোহার ডাণ্ডা নয়, রিভলভার পিস্তল। তারই নলটা তোমার ডাণ্ডার মতো মনে হয়েছে।

দীনু কেঁদে উঠল—আজ্ঞে না। আজ্ঞে না। আজ্ঞে ' হুজুর।

—তবে কে বল। অন্ধকার হলেও তুমি তাকে ছিনেছ—

—সি—সি—হুজুর—সি—।

তার মনশ্চক্ষের সামনে আবার ভেসে উঠল।

অন্ধকার বনভূমে কঠিন সংগ্রামের ছবি।

সে বল্লম খুলতে চেষ্টা করছে। বলছে—সরকার বাহাদুরের ডাক—। ক্রুদ্ধ তার কণ্ঠস্বর।

আক্রমণকারী আবার চাপা গলায় বললে—মাড়োয়ারীর দু-হাজার টাকার ইনসেওর আছে। আমি লোব—।

—কে ? দীমুর কণ্ঠস্বর যেন বসে গেল।

উত্তর হল—আমি ! দাও।

—না—না—না। চিৎকার করে উঠল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হয়ে পড়ল ডাকের উপর। আক্রমণকারী ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকের ব্যাগ টেনে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলে।

আবার সে চিৎকার করে উঠল আরও জোরে—না—!

ওদিক থেকে এসে পড়ল মটরের হেডলাইট।

পড়ল আক্রমণকারীর পিছন দিকে। বটের ঝুলে পড়া ডালের ছায়া পড়ল তার উপর। সে হাতের ডাণ্ডাটা তুললে হিংস্র আক্রোশে। পড়ল সে ডাণ্ডা। মোটরের আলো এগিয়ে এল। আক্রমণকারী ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বনের মধ্যে।

দীমু একটা চীৎকার করলে—ন-আ-আ—।

ওই চীৎকারের সঙ্গে সুর রেখেই—এস-পি বললেন—না। তুমি মাস্টারের ছেলেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছ ! বল—সে মাস্টারের ছেলে।

—না। না।

—হ্যাঁ। আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি।

—না হুজুর—মিছে আমি বলতে পারব না—সে—সে আমার—আমার ছেলে !

—তোমার ছেলে—

দীমুর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নিতাইয়ের ফেটা ও পাগড়ি-বাঁধা মুখ ভেসে বড় হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন।

সেই দিকে তাকিয়ে দীমু বললে—সে নেতাই।

চারিদিকে বেজে উঠল মেঘের গর্জন।

দ্বিতীয় পর্ব

ঘরের ভিতরটা দীমু ওই কথাই বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রখর বিদ্যুতালোকের ঝলকে ভরে গেল।

মেঘের গম্ভীর গর্জনে সব যেন থরথর করে কেঁপে উঠল।

ঘরের জানালাগুলি ঝড়ের বেগে আছাড় খেয়ে বন্ধ হয়ে গেল। আলোয় ভরা ঘরখানা অন্ধকার হয়ে গেল। আই-বি ইনস্পেক্টর এবং কনেস্টবল প্রায় ছুটে গিয়ে জানালা দরজা বন্ধ করে দিলে।

এস-পি দীর্ঘ এবং ব্যস্ত পদক্ষেপে বের হয়ে গেলেন।

বারান্দা অতিক্রম করে চললেন তিনি। বাইরে মেঘাচ্ছন্ন দুর্যোগময়ী প্রকৃতির অন্তরালে সূর্যাস্তের পরের অন্ধকার নামছে। বাইরে দীনুর চিৎকারে কয়েকজন নার্স কম্পাউণ্ডার বেরিয়ে এসে বিস্মিত দৃষ্টিতে ঘরটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

দুজন নার্স পরস্পরের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল।

এস-পি চলে যেতেই একজন বললে—ডাকাত ওর ছেলে?

—স্বীকার করলে?

—চুপ!

কারণ এবার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন ইনস্পেক্টর।

ইনস্পেক্টর চলে যেতেই প্রথম মেয়েটি বললে—এরা সন্দেহ করেছিল রেভুল্যশনারীদের কাণ্ড বলে। তা, ও বললে, না সে আমার ছেলে!

অপর মেয়েটি বললে—মা গো!

ওদিকে বৃষ্টি নামল।

এস-পি হাসপাতালের এদিকের বারান্দা থেকে অপর দিকে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল পোশাকপরা সদাপ্রস্তুত অফিসার ক-জন।

বললেন—আপনি নবগ্রামে চলে যান। এ্যারেস্ট নিতাই দাস—দীনুর ছেলে।

Start immediately. It is already late—

বর্ষণ-মুখর মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে সামনে রাস্তার আলো জ্বলে উঠল। বিদ্যুৎ চমকাল, মেঘ ডাকল।

এই বর্ষণমুখরতার মধ্যে দাওয়ার উপর একটি হ্যারিকেন জ্বেলে উদাস নেত্রে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে সদু। তার চোখের কোণ থেকে ঝরে-পড়া দুটি জলের ধারার উপর আলোর ছটা পড়ে চিক্‌চিক্ করছে!

বাইরে থেকে কেউ ডাকলে—নিতাই! নিতাই!

সদু উঠে দাঁড়াল—কে গো!

—আমি। পিওন।

ভবেশ এসে দাঁড়াল—মাথায় ছাতা, হাতে লণ্ঠন।

—কী বাবু? সি কেমন আছে? খবর কিছু আর আইচে!

—এসেছে খবর। ভালো আছে। জ্ঞান হয়েছে। নিতাইকে দেখতে

চেয়েছে। আমাদের সায়েব বোলপুরে তার করেছেন। নিতাইকে পাঠাতে বলেছেন। কাল সকালেই যেতে হবে। সে কোথা ?

—সে তো বাড়িতে নেই বাবু! সেই কাল দোপর বেলাতে কোথা চলে যেয়েচে। আজও তো ফেরে নাই।

তখন সেই দীমুর ডাকবওয়া পথ ধরে—বনের মধ্য দিয়ে চলে আসছে পুলিসের গাড়ি। গাড়িতে কনেস্টবল বোঝাই। সামনে ড্রাইভারের পাশে দুজন অফিসার। হেডলাইটের আলো অন্ধকারকে ভেদ করে সন্ধানী দৃষ্টি হেনে চলে আসছে। অফিসাররা স্তব্ধ, তাদেরও স্থির দৃষ্টি সামনের আলোর দিকে নিবদ্ধ।

একটা রেল-স্টেশনে—টিনের শেডের নিচে একেবারে একপ্রান্তে একটি লোহার থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে এক মূর্তি। মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত একখানা কাপড় শীতের দিনের র‍্যাপারের মতো ঢাকা। খানিকটা পিছনে শেডের মাঝখানে ছোট একটি স্টলে ক-জন লোক চা খাচ্ছে, বিড়ি টানছে। পিছনে অনেক দূরে ট্রেনের সার্চ লাইট।

স্টেশনটির নাম রাজবাঁধ। প্লাটফর্মের গায়ে কাগজে নামটি ফুটে রয়েছে।

ট্রেনটি এসে দাঁড়াল। সল্প কয়েকজন লোকের সঙ্গে লোকটিও এগিয়ে এল।

সার্চ লাইটের আলোয় এবার চেনা গেল লোকটি নিতাই। সার্চলাইট সমেত ইঞ্জিন আগে চলে যেতেই সে এগিয়ে এল ট্রেনের দিকে। পিছনে প্লাটফর্ম যেখানে অন্ধকার সেই দিকে। অন্ধকারের মধ্যেই সে উঠল ট্রেনে।

ট্রেনের গার্ড বাঁশি বাজাল।

ট্রেন হুইসিল দিল।

এদিকে হাসপাতালে গভীর রাত্রে স্তব্ধ দীমু নিষ্পলক দৃষ্টিতে ছাদের দিকে চেয়ে শুয়ে রয়েছে।

বাইরে বর্ষার ব্যাঙের ডাক উঠছে। ঘরে আলোর চারিদিকে পোকা উড়ছে। দরজার গোড়ায় টুলের উপর একজন কনেস্টবল ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

একজন নার্স বারান্দার ওপাশ থেকে জুতোর একটি একক শব্দ তুলে এসে ঘরে ঢুকল।

এসে দাঁড়াল—দীমুর পাশে।

দীনু তবু তেমনি স্থির, সেই নিষ্পলক দৃষ্টি এতটুকু ফিরল না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে।

নার্স সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—এ কী? তুমি—তুমি ঘুমোও নি? দীনুর কণ্ঠস্বর থেকে বের হয়ে এল—উঁ—হু!

—ঘুমের ওষুদ দিলাম—তবু ঘুম আসছে না?

—উঁহু!

নার্স একটু জল ভিজিয়ে তুলো দিয়ে কপালটা ভিজিয়ে দিলে; মাথায় একটু দিয়ে দিলে। তারপর বললে—একটু জল খাও।

—উঁ—হু!

—তা হলে চোখ বোজো, ঘুমুতে চেষ্টা কর। চোখ বন্ধ কর।

দীনু চোখ বন্ধ করলে।

নার্স চলে গেল। পাখাটা বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

দীনুর চোখ আবার খুলে গেল। এবার নিঃশব্দে জলের দুটি ধারা গড়িয়ে এল চোখ থেকে।

দূরে কোথায় ঘড়িতে টাওয়ার ক্লকে—ঢং ঢং ঢং শব্দে তিনটে বেজে গেল। একটা কুকুর ডেকে উঠল কোথায়। একটা প্যাঁচা ডাকল। খানিকক্ষণ ঝিঁঝির শব্দ হল। সাপে ব্যাঙ ধরার শব্দ উঠতে লাগল। তার মধ্যেই ওই ব্যাঙের ক্লান্ত কাতর শব্দই রূপান্তরিত হয়ে বাজল ঢং ঢং ঢং ঢং অর্থাৎ চারটে। বাইরে আকাশ ফরসা।

সকাল হলো। ভোর বেলা—

দীনুর বাড়িতে তখন পুলিস এসেছে। ঘিরেছে। দূরে দূরে পাড়ার লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। উঁকি মারছে।

সদু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে দাওয়ায়। একজন দারোগা প্রশ্ন করলেন—নিতাই সেই পরশু বেরিয়ে আর ফেরে নি?

সদু ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে বললে—না মশায়!

—কোথায় গিয়েছে? বল!

—জানি না মশায়!

—কে জানে! তোমার স্বামী?

—আজ্ঞে না। সেও জানে না। সে বাসিনী বলে একটা মেয়ের সঙ্গে কোথা গিয়েছে।

—বাসিনী!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কে বাসিনী ?

—জানি না মশায়। শহর থেকে নেতাই তাকে ভাঁজো নাচতে এনেছেল। তার লেগে ওর বাবার সাঁতে ঝগড়া ; আমি কত বলেছি—তা সি শোনে না। তার বাবা সি দিন মেয়েটার সাঁতে দেখে তাকে বলেছিল—আজ থেকে আমি জানব আমি নিব্বংশ। তবু মানে নাই—সেই মেয়েটার সাঁতেই চলে যেয়েছে।

হুঁ !

ওদিক ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন আর একজন অফিসার। বললেন—নাথিং ফাউণ্ড। নো ট্রেস। চল।

ওদিকে নিতাই চলেছে সেই ট্রেনে।

গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের একটা ট্রেন। হঠাৎ ট্রেনটা সিগন্যাল না পেয়ে ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালের বাইরে দাঁড়িয়ে গেল।

প্যাসেঞ্জাররা মুখ বের করে দেখছে। নিতাইও দেখছিল।

জায়গাটার চেহারার সঙ্গে বাংলাদেশের সাদৃশ্য নেই। পাহাড় দেখা যাচ্ছে। দূরে বন-রেখা।

নিতাই হঠাৎ উঠল এবং দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দু-চার জন লোক নিচে নেমে দেখছে। কেউ দাঁতন ভাঙছে। সেও নামল। খানিকটা মাঠের দিকে গেল। একবার ফিরে দেখল ট্রেনটার দিকে।

তারপর—রেলের সীমানার তারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপারে বেরিয়ে হনহন করে চলতে লাগল।

পিছনে হঠাৎ সিটি বাজল। সে আবার পিছন ফিরলে। দেখলে সিগন্যাল পড়েছে। গাড়ি হুস করে ধোঁয়া ছেড়ে নড়ল। চলল।

সে আবার পিছন ফিরে চলল। দ্রুত বেগে। তারপর ছুটতে লাগল। ট্রেনটা চলে গেল।

সে ছুটল। কাঁধে সেই ব্যাগটা, যে-ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বাসিনীর সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছিল।

সকালবেলায় ঠিক প্রায় সেই সময়েই—দীনুর বেডের সামনে—পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে তাকে বলছিলেন—বলেছ সে তোমার ছেলে ?

দীনু সেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতেই তাকিয়ে ছিল। সে উত্তর দিল না।

তিনি আবার ডাকলেন—দীনু ! দীনু !

—আঁ।

—তুমি বলেছ—ডাকাত তোমার ছেলে?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে দীনু।

—তুমি ঠিক চিনতে পেরেছিলে? সঙ্গে সঙ্গেই দীনু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

সুপার তাঁর কথাসূত্রে একসঙ্গেই বলে গেলেন—অন্ধকারে ভুল হয়নি তো?

দীনু ঘাড় নাড়লে—না।

সুপার ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে বোধ করি সবিস্ময়ে দীনুর কথাই ভাবছিলেন।

দীনু মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বললে—মিছে কী করে বলব?

ঘাড় নাড়তে লাগল শুয়ে শুয়ে—ধীরে ধীরে—'না' 'না'-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল সে।

সুপার তার গায়ে হাত রাখলেন—তোমার যে জ্বর হয়েছে দীনু। দীনু একটু বিষণ্ণ হাসলে।

—এ যে বেশ টেম্পারেচার। ডাক্তারবাবু!

তিনি বেরিয়ে গেলেন ব্যস্ত ভাবে।

ওদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে—অরণ্যভূমের প্রান্ত দেশ। সেখানে একটা গাছতলায় উপুড় হয়ে ধুলোর ওপর শুয়ে আছে নিতাই। সর্বাঙ্গে ধুলো। মাথায় সেই ব্যাগটা। হঠাৎ সে মুখ তুললে। অস্তমান সূর্যের আলো তার মুখের উপর পড়ল। তার চোখ থেকে জলের ধারা গড়াচ্ছে।

আবার সে মুখ গুঁজলে—মনশ্চক্ষে দেখলে সেই অন্ধকার রাত্রের বাপের ডাক-ব্যাগ আঁকড়ে-ধরা ছবি!

সে আবার ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর উঠল। চলতে লাগল।

দূরে কোথায় বয়লারের সিটির শব্দ হল।

সে চমকে উঠে দাঁড়াল।

এদিকে টাওয়ার ক্লকে ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং! পাঁচটা।

থানায় দারোগা, এস-পি, ইন্সপেক্টরের সামনে বাসিনী বসে আছে।

সে বলছে—আমি জানি না মশায়—সে কোথা! আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি। ভগবানের দিব্যি করে বলতে পারি।

সে কথাগুলি বলছে—বিনয়ের সঙ্গে বটে কিন্তু সপ্রতিভতা আছে তার মধ্যে।

—ভগবানের দিব্যি করে?

—কালী দুর্গা হরি যার দিব্যি কর্তে—

—চোপ রও হারামজাদী—

চমকে উঠে বাসিনী থেমে গেল।

—কালী দুর্গা হরি—! ব্যঙ্গ করে বললেন এস-পি।—তুই জানিস।

—আমি জানি না। আমি জানি না। হুজুর আমি জানি না। সে আমার কাছে আসত; আসত—দুটাকা একটাকা দিত। আমার সঙ্গে ভালোবাসা হয়েছিল। আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি চাই নাই। বলেছিলাম—ওই ওদের ঘরে থাকতে আমি লারব—

—হ্যাঁ—তোকে চড় মেরেছিল। তুই ওর বাবাকে গাল দিয়েছিলি।

—হ্যাঁ। সত্যি কথা। কিন্তু তার পরেতে আবার সিদিন আমার কাছে এসে পাঁচটাকা নগদ দিয়ে ভাব করে গিয়েছিল। বিয়ে করতে চেয়েছিল। বলেছিল টাকার যোগাড় করছে—লাইসেন লেবে মটর ডেরাইবারির। আমি সেদিন না বলেছিলাম। কিন্তু রাতে ভেবে দেখলাম—চুপ করে গেল সে।

—কী বল!—এই। বল!

—হুজুর আমার সন্তান হবে। উরিরই সন্তান। তাই সোকালে আমি নিজেই গিয়েছিলাম তার কাছে। তার বাবা আমাকে দেখতে লারে; তাই গাঁয়ের ধারে গাছতলায় বসে কথা পাকা করে নিয়েছিলাম। সে আমাকে নিয়ে দূর-দেশে চলে যাবে কোন শহর বাজারে। বলেছিল—টাকার যোগাড় তার হয়েছে; কাল সকালেই টাকা নিয়ে সে আমার কাছে আসবে। আমাকে তৈরী থাকতে বলেছিল। গাছতলা থেকে বেরিয়ে আমি চলে আসছি।—একটুকুন জল খাব হুজুর।

—জল দাও।

কনেস্টবল জল দিল একটা অ্যালুমিনিয়মের গ্লাসে।

জল খেয়ে বাসিনী আবার বললে—যখন চলে আসছি—তখন উয়োর বাবা দেখতে পেয়েছিল, একটা পুকুরের পাড় থেকে হুজুর সি ডেকেছিল। আমার ভয় হয়েছিল—বাবার কাছে গেলেই তার মন পালটাবে। বাবাকে ভারি ভালোবাসত। তাই আমি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছেলাম আমার বাড়ি পর্যন্ত। সাঝে পর্যন্ত আটকিয়ে রেখে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওর বাবা সাঝের সময় ডাক নিয়ে যায়। আর বলেছেলাম, ভোরে আমি তৈরী থাকব। সে যেন টাকার যোগাড় করে নিশ্চয় আসে। কিন্তু সি আসে নাই। আমি আর কিছু জানি না হুজুর। কিছু জানি না। আমার কুক্ষিতে সন্তান আছে, হুজুর তার দিব্যি!

—চল, ওকে হাসপাতালে নিয়ে চল। দীনুর সামনে।

হাসপাতালে দীনুর প্রবল জ্বর।

সে প্রলাপ বকছে।

নার্স মাথায় আইসব্যাগ ধরে বসে আছে।

দীনু চিৎকার করলে—খবরদার।

তার হাত-পা শক্ত হয়ে উঠল। উঠে বসতে চাইল।

নার্স চেপে ধরলে।

কয়েক মুহূর্তপর বলে উঠল—না—না—না! নেতাই—না।

আবার কয়েক মুহূর্তপর বললে—না—না—না। মাস্টারবাবুর ছেলে নয়। সি আমার ছেলে। সি নিতাই। মিছে কথা বলতে পারব না। পারব না!

হঠাৎ দেখা গেল দরজার মুখে দাঁড়িয়ে এস-পি।

তার পিছনে অফিসারেরা এবং বাসিনী!

এস-পি ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন—ডিলিরিয়াম? ভুল বকছে? নার্স বললে—হ্যাঁ সার।

—টেম্পারেচার হয়েছে?

—একশো দুই।

দীনু বলে উঠল—নেতাইরে! ও নেতাই! নেতাই!

এস-পি নিজেই পাখাটা বাড়াবার চেষ্টা করলেন।

দীনু হতাশ কণ্ঠে বললে—যাঃ নেতাই হারিয়ে গেল।

তারপরেই বললে—ও বাবা কী অণ্ডকার।

এস-পি বেরিয়ে গেলেন।

ঘন অন্ধকার অরণ্যের মধ্য দিয়ে—

শিল্যুট মূর্তির মতো একটি মূর্তি চলেছে। দূর আকাশের গায়ে চিমনীর মুখে আগুন।

লক্ষ্য তার সেই দিকে।

পরদিন সকালে এস-পি অফিসে ইনস্পেক্টারকে বললেন—মেয়েটাকে ছেড়েই দাও। একটু স্তব্ধতার পর বললেন—ও এর বেশী কিছু জানে না। ছেড়ে দাও। বলে দাও কোথাও যেন না যায়। কীপ ওয়াচ? এস-পি ইনস্পেক্টর চলে গেলেন। ঘণ্টা বাজালেন। আর্দালীকে বললেন—নিরঞ্জনবাবু।

আই-বি নিরঞ্জনবাবু এসে দাঁড়াবা মাত্র বললেন—এইটে—সারকুলেশনের জন্যে আজই টু অল রেলওয়ে স্টেশন—পোস্ট অফিসেস—আদার পাবলিক প্লেসেস ; ফটোগ্রাফ থাকলে ভালো হত কিন্তু উপায় নেই।

কাগজটা হাতে দিলেন।

আই-বি বললে—Postal department-এর চিঠিটার—? বলতে চাইলে কী জবাব দেব—বা কী করব ?

এস-পি বললেন—সারটেনলি। দীনু মাস্ট বি রিওয়ার্ডেড। আমরাও কিছু রিওয়ার্ড দিতে চাই পুলিশ থেকে। লোকটা—

তাঁর মনশ্চক্ষে রোগশয্যায় শায়িত দীনুর সেই ছবিটুকু ভেসে উঠল—না। মিছে কথা আমি বলতে পারব না। মাস্টারবাবুর ছেলে নয়। সে—সে আমার আমার ছেলে।

এস-পি বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সামনে লনে অজস্র ঘাসের ফুল ফুটেছে।

নবগ্রাম পোস্টাপিসে নিতাইয়ের বিবরণ সম্বলিত সারকুলারটি টাঙানো রয়েছে নোটিশ বোর্ডে।

সেটি পড়ছে—সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

বিজ্ঞপ্তি

৫০০ টাকা পুরস্কার

ফেরার আসামী নিতাইচরণ দাস—বয়স কুড়ি বাইশ লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। রঙ কালো—সবল স্বাস্থ্য—গলায় হারে বাঁধা রূপোর তক্তি।

নিত্যানন্দবাবু বেরিয়ে এসে বললেন—পড়ছেন ?

—হ্যাঁ।

বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—এমন বাপের ছেলে, ছোঁড়াটা এ কী করলে বলুন দেখি !

নিত্যানন্দ বললেন—আমার দিকে চেয়ে দেখুন না। আমার মতো ভীতু, সরকারী গোলাম—আমার ছেলে—

—সায়েব না দীনুকে অমরের নাম করতে বলেছিল ?

চাপা গলায় বললে সুরেশ।

—হুঁ। কিন্তু সে তা করেনি।

—দীনুকে না কি রিওয়ার্ড দেবে ?

—হ্যাঁ। আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আড়াইশো টাকা। আর পুলিসও বোধ হয় দেবে!

একজন পিওন ডাক হাতে—রেজেস্ট্রী ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে গেল!

নিত্যানন্দ বললেন—দীনুর বাড়ির একবার খোঁজ নিও ভবেশ!

সুরেশ আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই নোটিশটা পড়তে লাগল—"৫০০ টাকা পুরস্কার।"

ওদিকে দীনু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। তার মাথাটা কামানো। সেখানে একটা ক্ষতচিহ্ন।

তার সঙ্গে একজন সাব ইনস্‌পেক্টর অব পুলিস।

একটা রূঢ়দর্শনা জমাদারনী একটা বেড প্যান পরিষ্কার করে নিয়ে ফিরছিল।

সে বললে—যাচ্ছো? হাসপাতালসে ছুট্টি?

দীনু ম্লান হেসে বললে—হ্যাঁ।

—তোহ্‌রা বেটা? বেটাকে পতা মিলল? না মিলল?

বলতে বলতেই দীনু তাকে অতিক্রম করে চলে গেল।

মেয়েটা বলতে বলতে গেল—না মিলেসে—উ বেঁচেসে। তু আচ্ছা বাপ!

সাব-ইনস্‌পেক্টর ধমক দিলেন—এই! যাও আপনা কামসে যাও।

তাকে নিয়ে এল জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে।

পোস্টাল-সুপার, পুলিস-সুপারও উপস্থিত সেখানে।

ডি-এম তাকে একটি থলি হাতে দিয়ে বললেন—সরকার বাহাদুর তোমাকে এই আড়াই শো টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। আর এই পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছেন—পুলিস থেকে। তোমার সাহসের জন্য, কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য: সবচেয়ে বড় কথা তুমি তোমার নিজের ছেলেকে বাঁচাবার জন্যও সত্য গোপন করনি, মিথ্যা অন্যের নাম করনি, এই দুর্লভ সততার জন্যে তোমাকে দিচ্ছেন। ধর।

দীনু কলের পুতুলের মতোই নিলে। হেঁট হয়ে নমস্কার করলে।

এস-পি বললেন—হ্যাঁ। সাহস থাকলে এবং দেহে শক্তি থাকলে ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। হয়তো লড়াই করে রুখতেও পারে। লড়াইয়ের মধ্যে মরতেও পারে। কিন্তু—।

পোস্টাল-সুপার বললেন—তোমার জন্যে এক মাসের ছুটি স্যাংশন করেছি।

দীনু বললে—ছুটি?

—হ্যাঁ। বিশ্রাম নাও।

—বি-স্ সেরাম!

—হ্যাঁ। শরীরটা সারা দরকার!

—আজ্ঞে বেশ!

দীনু গ্রামে ফিরল।

ঠিক প্রবেশমুখেই থমকে দাঁড়াল।

সামনেই সদর রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। দু পাশে দোকানদানী। লোকের ভিড়।

দূরে দেখা যাচ্ছে—একটা দোকানের সামনে বাউল গান করছে—

কুল আর, কলঙ্ক নিয়ে, কি করি হায়, বলবে কে সে?

কুলে আমার, সোনার শয্যে, কলঙ্ক কালো ভালো বেসে।

শ্যাম কালো এ নয়ন কালো কলঙ্ক মোর, কালো কেশে।

কালো আমার চোখের তারা কি করি হায় বলবে কে সে?

কুল রাখি, না, শ্যাম রাখি হায়

কুল রাখিলে শ্যাম যে হারায়—

শ্যামের প্রেমে, কুল ভেসে যায়, আকুল পাথার, ডুবি শেষে।

পা-থারে—

(ও-অকুল পাথার—তল নাই তার ডুবি শেষে—)

কি করি হায়, বলবে কে সে?

কূলের সোনার, কোটায় আমার, প্রাণ ভ্রমরার বাস ;

কালিদহের, শ্যাম-কমলের, মধুই শুধু আশ ;

কুল গিয়েছে শ্যাম গিয়েছে

সোনার রাধা লু-টা-ই-ছে—

তবু রাধা কলঙ্কিনী, নাম রটিল দেশে।

গানের মধ্যেই সামনে রাখা ভিক্ষা পাত্রে ভিক্ষা পড়ে গেল।

গান শেষ করেই সে—বোল হরি বোল, বোল হরিবোল—বলতে বলতেই পাত্রটি তুলে নিয়ে চলতে লাগল। হাতে তার একতারাটি টুং টুং শব্দে বেজেই চলল।

দীনুর বাড়িতে তখন দীনু এসে স্তব্ধ মূক হয়ে বসে আছে মাথায় হাত দিয়ে। প্রথম ঝড়টা কেটে গেছে। সদু মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পাড়া-প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্য থেকেই কথা বলছে। কথা নয় বাণ। শব্দভেদী বাণের মতো কথাগুলি এসে তাকে বিদ্ধ করছে। নিক্ষেপকারীকে দেখা যাচ্ছে না।

নারী এবং পুরুষের কণ্ঠ দুইই আছে।

—বলিহারি বাবা বটে বাবা। বাহাদুর বাবা!

—জিভ দিয়ে বেরুলো তো ছেলের নাম?

—পাথর লো পাথর। বাবা নয় পাথর।

—ধাম্মিক লোক। পাথর নয়—ধাম্মিক!

—যুজিষ্টির! দীনবন্ধু নয়, উনি আমাদের যুজিষ্টির—

—লগদ তিনশো টাকা পেলে যুজিষ্টির সবাই হয়।

—এইবার ধরিয়ে দিয়ে আরো পাঁচশো পাবে।

এবার ঘরের একটা কোণের পাশ দিয়ে প্রবেশ করল এক বৃদ্ধা। সে বললে—ই সব তোমরা কী বলছ? বলি ধরম তো আছে, না নাই? দেবতা না হয় পাথরের, কিন্তুক ধরম তো সত্যি না কী। দীনু তো অন্যায় অধরম করে নাই। লোকটাকে বিঁধছ ক্যানে এমন করে?

—অ-মা গ্ অ! এ যে সেই বন থেকে এলেন মাসী বুনপো তোকে ভালোবাসি। সেই বিত্তান্ত! বুনপোর পরে হাঁড়ি-ফাটা ভাতের মত ভালোবাসা একেবারে ছতবস্কার হয়ে গেল।

চাপা হাসির গুঞ্জন উঠল।

বুড়ি বললে—বলি তা হলে মুখ খুলব না কি? হাটে হাঁড়ি ভাঙব নাকি? বলি ওলো—অ লেবারণের বউ। বুড়ো হলেও কান আমার খুব খর লো! একে ঘুম হয় না, বুড়ো মানুষের ঘুম কম। আত দুপুরে গালি দিয়ে পা মটমটিয়ে লেবারণ কোথা যায় লো? আবার শেষ আতে—

দীনু এতক্ষণে বললে—চুপ কর মাসী! পাঁচজনার মুখ, দু হাত দিয়ে কী করে বন্ধ করবা বল! ওই দেখ সদু কাঁদছে। তার মায়ের পরাণ, কী বলব তাকে? টাকাও তো আমি পেয়েছি মাসী। নিয়েছি। আবার সি যদি কোনো দিন ফিরে আসে তবে—? তখন কী করব আমি? ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বললে—সি যেন আর ফিরে না আসে মাসী কখুন না আসে—।

সেই সময়েই নিতাই হাজারিবাগ অঞ্চলে একটি ছোট শহরে একটি মোটর মেরামতের কারখানায় একটা লরির পাশে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। তার গায়ে তেলকালি লাগা একটি গেঞ্জী। পরনে একটা তেমনি হাফপ্যান্ট। লরিটা মেরামত হচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে বড় একটা কারখানার চিমনী।

নিতাইয়ের মুখে বয়সের অনুযায়ী দাড়িগোঁফ বেরিয়েছে। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া হয়েছে।

একটা গাছতলায় মালিকদের দুজনে বসে কাগজ পড়ছেন।

৫০০ টাকা পুরস্কার! ফেরারী আসামী নিতাইচরণ দাস বয়স বাইশ-তেইশ। লম্বায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। রঙ কালো—সবল স্বাস্থ্য—।

অন্যজন বাধা দিয়ে বললেন—খবর ছেড়ে বিজ্ঞাপন পড়তে লাগলে। খবর পড়।

নিতাই ওদের দিকে মুখ তুলে তাকালে। তারপর ঘুরে বসল।

ভিতর থেকে কেউ ডাকলে—এই নতুন ছোকরা! কী নাম? এই!

—আজ্ঞে গৌর।

—একটু এগিয়ে দেখ—সাইলেন্সার পাইপটা মেরামত করতে গিয়েছে, আসছে কি না দেখ তো।

নিতাই বললে—যাই! যাবার সময় গাছের ডালে ঝোলানো জামাটা নিয়ে কাঁধে ফেললে।

সে বেরিয়ে এল রাস্তার উপর।

খানিকটা এসে রাস্তা থেকে নেমে সে প্রান্তরে নেমে পড়ল।

কিছুদূর এসে সে পেলে একটা শাল জঙ্গল। তার ভিতর ঢুকে সে একটা গাছতলায় বসে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজলে। যেন এলিয়ে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আবার সোজা হয়ে বসল। কোমর থেকে বের করলে একটা গেঁজলে। সেটা খুলে একে একে বের করলে একখানা দশ টাকার নোট, একখানা পাঁচ টাকার, খান তিনেক এক টাকার, খুচরো কিছু রেজকি। তার সঙ্গে বের হল একটা কারে বাঁধা রুপোর তক্তি। তক্তিটা তুলে দেখলে। সেটাতে নাম লেখা 'নিতাই'। একটা পাথরের উপর রেখে সেটাকে অন্য একটা পাথর দিয়ে ভেঙে ফেললে। তারপর একে একে আবার সব পুরলে। কোমরে বাঁধলে। আবার চোখ বুজে গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল। চোখ দিয়ে জল গড়াল। সেই অবস্থাতেই জামাটার পকেট খুঁজে বের করলে খবরের কাগজে মোড়া কিছু।

একটা আধ-খাওয়া পাউরুটি।

ক্লান্তভাবে খেতে লাগল।

খেতে খেতেই উঠল, চলল।

কিছু দূর এসেই একটা ছোট জোড়—অর্থাৎ পাহাড়িয়া নালা। এক পাশে শীর্ণ জলধারা বয়ে যাচ্ছে। সেখানে জল খেয়ে নিয়ে আবার চলল।

কোথায় যাবে?

সামনে পাথুরে প্রান্তর। পায়ে-চলা পথের রেখা চলে গেছে। কোথায় মুখ কে জানে?

থমকে দাঁড়াল।

হঠাৎ চোখে পড়ল এক পাশে অর্থাৎ ডাইনে বা বাঁয়ে আকাশের গায়ে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া লম্বা হয়ে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

রেলের ধোঁয়ার মতো।

রেলের ধোঁয়াই বটে। দূরান্তে ট্রেনের হুইসিল শোনা গেল।

দিক পরিবর্তন করে সে সেই মুখে চলল।

আকাশে তখন সন্ধ্যা নামছে। পাখিরা নীড়ে ফিরছে। কলকল শব্দ উঠছে।

সে শব্দ শুনে একবার আকাশের দিকে তাকাল। একটা গাছে পাখিরা বসল।

সে দেখলে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার চলল।

অন্ধকারে এতক্ষণে নজর হল—একটা সবুজ আলো। সিগন্যালের আলো।

সে চলতে লাগল। চলবে সে। বাঁচবে।

দীনু আপনার বাড়িতে গোরুর কাছে বসে তাদের গায়ে হাত বুলুচ্ছে।

সদু সেই শুয়ে আছে। পা থেকে মুখ পর্যন্ত ঢেকে; প্রায় মৃতের মত পড়ে আছে সে। নিস্পন্দ, নীরব।

দীনু হঠাৎ যেন বললে—শুনছিস? ওঠ!

সদু ঘাড় নাড়লে—না—না—না।

—না নয়। ওঠ। কী করবি? বাঁচতে হবে তো!

এবার সদু বললে—না—। বাঁচতে সাধ আমার নাই। সে সাধ আমার মিটেছে। পথে-ঘাটে লোকে টিটকিরি দেয়—বলে যুধিষ্ঠিরের পরিবার। শুধু যুধিষ্ঠির নয়, নগদ তিনশো টাকার যুধিষ্ঠির—

তার কথার আবেগের মুখে বাধা পড়ল।

—দীনু—দীনু। দীনু রয়েছিস? বলে কাগজ হাতে ঘরে ঢুকল সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

সদু ঘোমটা টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে বললে—খবরের কাগজে তোর কথা বেরিয়েছে দীনু। ছবিসুদ্ধ। এই দেখ!

দীনুর হাতে সে কাগজখানা দিলে।

সুরেশ বলছিল—আমি পাঠিয়েছিলাম। ওরে অন্য দেশ হলে—

দীনু কাগজের ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখে—আস্তে আস্তে ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

লম্বা ফালি করে—একটা দুটো তিনটে ফালি করে দিলে।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে স্তব্ধ হয়ে দেখছিল।

ছেঁড়া হয়ে গেলে—ধরা-গলায় অপরাধীর মত বললে—দীনু আমি বুঝতে পারি নাই। আমাকে তুই—। তুই কিছু মনে করিস না—

এরই মধ্যে দীনু ধীরে ধীরে উঠল—এবং চলে গেল বেরিয়ে। কথা শুনবার জন্যে বা উত্তর দেবার জন্যে অপেক্ষা করে রইল না।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে চলে গেল মাথা নিচু করে।

শূন্য অঙ্গনটায় ছুটে এসে ঢুকল একটা বা দুটো ছাগল ছানা, কয়েকটা হাঁস মুরগী। এই সময়ে এসে ঢুকল সেই পিসীবুড়ী, তার কাঁখে একটা মাটির কলসী।

—অ বউ! আন্না চড়িয়েছিস নি কি? কই? কোথা গেলি সব? আমার দেরি হয়ে গেল। ওই নোটন থানদায়ের সঙ্গে গেছেলাম। বললাম, তু চোরকে বলিস চুরি করতে গেরস্তকে বলিস সতর হতে; তু বুঝ্‌বি না! এ তু বুঝবি না।

কলসীটা নামিয়ে দাওয়ায় উঠল সে।

—কই গেলি কোতা? অ—হ—হ—কোথাও কিছু নাই—কাঠ-মাঠ—

সদু বেরিয়ে এল।

—তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না পিসী! আমি নিজেই চড়াছি আন্না।

—কষ্ট? আমার? সর। বেশী বকিস না। তু বোস! যোগাড়টা করে দে শুধু!

দীনু ফিরে এসে তার বল্লম পোশাক নিয়ে বেবিয়ে যায়।

পিসী বলে—ও দীনু ওসব নিয়ে কোথা চল্লি?

—কাজে। ছুটি বাতিল করে দেলাম।—ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সে চলে গেল।

সে চলবার সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগল ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন শব্দ।

ঝুন ঝুন শব্দ রাত্রির অন্ধকারে বাজতে থাকে অরণ্যপথে।

ওদিক থেকে আসে মোটরগাড়ি।—প্লেটের—নম্বর—1942।

বারেকের জন্য ঝুন ঝুন শব্দ থামে।

দীনুকে দেখা যায় না। তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, চাপা গলায় ডাকে—নেতাই!

একটা রাত্রিচর প্যাঁচা ডেকে ওঠে। ক্যাঁচ—ক্যাঁচ।

আবার ওঠে ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন শব্দ।

আবার আসে মোটর—এবার প্লেটে লেখা—1943।

আবার শব্দ থামে।

আবার ডাকে দীনু—নেতাই।

এবার ডেকে ওঠে শেয়াল। অথবা সেই পেঁচাই ডেকে ওঠে।

আবার শব্দ ওঠে ঝুন—ঝুন—ঝুন—ঝুন।

আবার গাড়ি আসে—

পর পর পেরিয়ে যায়—1944—1945।

দীনুর ডাক শোনা যায় দুবার—নেতাই! নেতাই!

কুকুর ডাকতে থাকে ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ—!

বোলপুরের আলো দেখা যায়।

তারপর আসে বোলপুর স্টেশন!

বোলপুর প্লাটফর্মে বাসিনীকে দেখা যায়—একটি চার-পাঁচ বছরের শিশুকে নিয়ে ঘুরছে। ছেলেটা ঘুমন্ত। প্যাসেঞ্জারদের কাছে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। ভিক্ষে করলেও তার স্বভাবের ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট। সাজ-পোশাকের জীর্ণতার মধ্যেও।

হঠাৎ এসে বাসিনী থমকে দাঁড়ালো।

ল্যাম্প-পোস্টের নিচে দুজন রানার বাঘবন্দী খেলছে। তার একটু দূরে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে দীনু। দীনুর মুখে চোখে চুলে কয়েক বৎসরের ক্লান্তির চিহ্ন।

বাসিনীকে দেখে একজন রানার বললে— বাবারে!

অপর একজন বললে—ক্যা—রে?

—আমাদের যুজিস্থিরকে দেখছে লাগছে? কী কাণ্ড?

বাসিনী এগিয়ে গিয়ে রূঢ় কণ্ঠস্বরে বললে—রাক্ষস! তু রাক্ষস! তু রাক্ষস!

দীনু চমকে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে উঠে দাঁড়াল।—রাক্ষসী, ডাইনী,—তু সেই বাসিনী!

—হ্যাঁরে ছেলে-খেকো রাক্ষস—আমি সেই—

—খবরদার!

—কেয়া হুয়া? কনেস্টবল এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন।

বাসিনী এবার ছুটে পালিয়ে গেল।

দীনু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল!

লোকে প্রশ্ন করতে গেল। কিন্তু সে সমস্ত ঢেকে বাজল ঢন-ন-ন ঘণ্টা। প্লাটফর্ম সার্চলাইটের আলোয় আলো হয়ে উঠল।

দীনুর বাড়িতে শেষ রাত্রে অন্ধকার ঘরে রুগ্না সদু ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠল—নে-তা-ই।

পাশেই শুয়ে ছিল বুড়ি পিসী।

সে জেগে উঠল—ডাকলে—বউ।

আবার ডেকে উঠল সদু—নেতাই। এবার কাঁপা গলায়।

পিসী আবার ডাকলে—বউ।

—দেখ তো পিসী, দুয়োরটা খোল তো। দেখ তো। মনে হল সি ডাকলে!

সে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলে।

—উঠিস না। তু উঠিস না। আমি দেখছি।

পিসী তাড়াতাড়ি উঠে ডিবে জেলে দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

তখন ভোর হচ্ছে। পাখি ডাকছে মধ্যে মধ্যে।

উঠান জনশূন্য। রাত্রির আকাশও যেন ধোয়ামোছা। ভোরের আমেজে তারাগুলিও অদৃশ্য হয়ে গেছে। উঠানের ফুলগাছটা পুষ্পহীন রিক্ত।

শুধু একটা কুকুর শুয়ে ছিল উঠানে। সেটা সাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়াল। লেজ নাড়তে লাগল।

ভিতর থেকে সদু প্রশ্ন করলে—পিসী?

—কই, কেউ কোথাও নাই বউ!

সদু এবার কোনোক্রমে দরজার মুখে এসে ডাকলে—নেতাই।

পিসী বললে—তা হলে তু স্বপন দেখেছিস বউ।

সদু বললে—স্বপন? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—হবে।

সকালবেলায় দীনু ডাক নিয়ে ফিরে আসার পর সদুর শিয়রে বসে তার সকালবেলার মুড়ি এবং অল্প একটু মদ খেতে খেতে প্রশ্ন করলে—

—কী স্বপন দেখলি সদু?

সদু ঘরের চালের দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে তাকিয়ে সেই স্বপ্নের স্মৃতিরই যেন রোমন্থন করছিল। সে চুপ করেই রইল।

দীনু বললে—স্বপন হয়তো লয় সদু! সে হয়তো এসেছিল।

সদু উত্তর দিলে না।

দীনু বললে—সেই বাসিনী মেয়েটারে কাল রেতে বোলপুর ইষ্টিশানে দেখলাম [illegible] কোলে একটা ছেলে! আমার সন্দ হচ্ছে সদু!

সত্ন এবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে চাইলে!

দীনু বললে—সন্দ হচ্ছে সত্ন; সিও ওই বাসিনীর সাঁতেই আছে। বন-জঙ্গলে—না-হয় কোথাও—

সত্ন বাধা দিয়ে বলে—উঁহু! উঁহু!

দীনু সবিস্ময়ে বললে—কী?

সত্ন বললে—আমি দেখলাম সি একটো মস্ত নদী—শুধুই জল—তারই মধ্যে এই বড় বাড়ির মতন লী একটো। তার উপরে মস্ত খুঁটি—সি তারই ওপরে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে।—মা—। পষ্ট 'মা' আমার কানে এল। ঘুমটো ভেঙে গেল। আমি 'নেতাই' বলে চেঁচিয়ে ওঠলাম। তার পরেতে মনে হল—সি হয়তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

ওই স্বপ্নের ছবিটা তার চোখের উপর ভেসে উঠল।

কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে শিলুয়েটের মতো ছবি। একটা স্টীমারের মাস্ট ধরে নিতাই দাঁড়িয়ে আছে।

মুছে গেল সে-ছবি। সত্ন ঘাড় নেড়ে বললে—বাসিনীর সাঁতে? না-না বলে সে ঘাড় নাড়লে।

—ছেলেমানুষ—পেথম জন বয়েসে ভুল করেছিল। কিন্তু না-না বলে আবার ঘাড় নাড়লে।

দীনুও আপন মনে ঘাড় নাড়লে। না-না-না। অর্থাৎ সে ওই বাসিনীর সঙ্গেই আছে। সে কাস্তে মাথাল নিয়ে বেরিয়ে এল।

বাইরে উঠানে পিসী গোবর মাখছিল।

সে বললে—দীনু! বোলপুর থেকে কাল একটুকুন তামাকপাতা এনে দিস বাবা।

—আনব। সে চলে গেল।

হেসে পিসী বললে—স্বপনের কথা শুনলি বাবা?

দীনু তখন চলে গিয়েছে।

কিন্তু পিসী বলেই গেল—ভোর বেলার স্বপন। উ মিছে হয় না। সি এবারে আসবে। আসবে।

রাত্রে বোলপুর প্লাটফর্মে বাসিনী একটা জায়গায় বসে একজন ছোকরার সঙ্গে চা-খাচ্ছিল, বিড়ি খাচ্ছিল, আর হি-হি করে হাসছিল।

ছেলেটা শুয়ে ঘুমোচ্ছিল।

ছোকরা বললে—হাসছ ক্যানে ?

—হাসছি ক্যানে ? মনে হচ্ছে ! ওই কথাই সবাই বলে হে !

—সবাই বলে ?

হ্যাঁ—সব্বাই। আমি কী বলি জান ?

—কী ?

বাসিনী গলা বাড়িয়ে তার মুখের কাছে মুখ এনে গুনগুন করে গেয়ে দিলে—নিত্য নতুন ফো-টে শালুক বাসী ঝরে গেলে হে ! বলে সে হেসে উঠল। কিন্তু সে হাসি মাঝপথেই থেমে গেল।

নীল যমুনার জলে হে !

হঠাৎ অদূরে কোন অন্ধকার স্থানে ক্রুদ্ধ জন্তুর মতো চিৎকার উঠল।—আঁ—

চমকে উঠে থেমে গেল বাসিনী। চমকে উঠল লোকটাও। পিছনে প্লাটফর্ম থেকে লোকজন ছুটে এল—এই—এই—এই—এই।

—কী হল ? কী হল ?

বাসিনী উঠে দাঁড়াল। অন্যদিকে চিৎকার উঠছিল—খুন করে ফেলাব। আঁ— !

আর শব্দ উঠছিল—প্রহারের।

সে কণ্ঠ দীনুর। সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কণ্ঠের চিৎকার—বুড়ো বদমাস ! এই—এই—এই !

আবার কেউ বললে—ছাড়—ছাড়—ছাড়।

•

বোলপুর পোস্টাপিসে দীনু মাথা হেঁট করে উপুড় হয়ে দুই হাতে মাথা ধরে বসে ছিল।

তার কপালের এক জায়গা ফুলে উঠেছে। একটা জায়গা কেটে গেছে।

অন্য একজন তরুণ রানার, তার চুল বিশৃঙ্খল—শরীরে আঘাতের চিহ্ন। সে বলছিল—ও একটা বদমাস মেয়ে—নচ্ছার মেয়ে—ভিক্ষের নাম করে শয়তানী করে বেড়ায়। ওই ছেলেটা ওর বেজন্মা ছেলে। তিনবার ছেলে ফেলে পালিয়েছে। ওর পাশে ওই বুড়ো ঘুরঘুর করছিল—তাই হেসে আমি বলছিলাম একটা কথা। হুজুর আমার ওপর একেবারে—ক্ষ্যাপা ভালুকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল—।

মাস্টার বললেন—ছি—ছি—ছি ! দীনুর মতো লোককে এই কথা তুমি বলেছ ? ছি—ছি—ছি। ও অতি সজ্জন লোক !

দীনু এবার বললে—হুজুর ওই সব্বনাশী আমার ছেলেকে ভুলিয়েছিল—ওর তরেই সে—।

কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল।

একটু থেমে বললে—আমার পরিবার আর বাঁচবে না সে বলেছিল—ওই মেয়েটারে একবার শুদিয়ো উ যদি জানে—সি কোথা আছে। তাই—।

—ছি-ছি-ছি। তুমি ক্ষমা চাও দীনুর কাছে। ক্ষমা চাও।

দীনু বলে উঠল—না, বাবু না। না—না। বাবু না।

উঠে সে ছুটে পালিয়ে গেল যেন। মাস্টার ডাকলেন—দীনু—দীনু!

নদীর ধারে সামনে খানিকটা জঙ্গল।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে দাঁড়িয়ে ডাকছিল—দীনু—দীনু! দীনু!

জঙ্গলের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল দীনু।

তার মূর্তি রুক্ষ-শোকাচ্ছন্ন—কপালে সেই আঘাতের চিহ্ন। কিন্তু মুখে উদাসীন প্রশান্তি। গায়ে একটা গামছা জড়ানো।

—বাবু! আপনি! এই শ্মশানে ছুটে এয়েছেন?

শুনে থাকতে পারলাম না রে! কাল থেকে বাড়ি ছিলাম না। আজ দশটায় বাড়ি ফিরে শুনলাম—

—হ্যাঁ বাবু,—সদু খালাস পেয়েছে। কাল ভোরে স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল। আজও আবার ভোর বেলাতে নাকি তেমুনি স্বপন দেখে ধড়মড় করে উঠে দুয়োর খুলতে যেয়েছিল নিজে—বুকে বেথা ধরে—। স্তব্ধ হয়ে গেল সে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ হেসে বললে, আমি এসে মরা মুখটাই দেখলাম।

সে তাকাল এবার পাশের দিকে।

সেখানে চিতা জ্বলছিল। কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল।

দীনু সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে—মাস্টারবাবুর ছেলের চিঠি এয়েচে আজ?

—হ্যাঁ। পাটনা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। গবরমেণ্ট তো সব ছেড়ে দিচ্ছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছে সব।

—নেতাইয়ের খবরও তুই পাবি। বুঝলি। আমার মন বলছে রে! বলেই সে অপ্রতিভের মতো হয়ে গেল। বললে—মানে এইবার তো ইংরেজরা চলে যাবে শুনছি। তখন দেশ স্বাধীন হলে সব মাপ করে দেবে কিনা! নিতাইয়ের তখন আর ভয় থাকবে না।

—কে জানে মশায়!

বাঁড়ুজ্জে বললে—এবার তু—। বলেই থেমে গেল।

দীনু প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে?

—কাজ ছেড়ে দে। পেনসন নে।

—কাজ ছেড়ে কী করব? দিন কাটলে, রাত কাটবে না যে। সে গভীর নৈরাশ্যে আকাশের দিকে তাকালে—তাকিয়ে থেকেই বললে, রেতে বাড়িতে একা জেগে থাকব গেরাম পিথিমী ঘুমুবে! না সে আমি লারব! সন্থ সরে গেল বাবু ওই করে। একটু থামল, আবার বললে। এ—কেটে যায়—ডাক নিয়ে যাই আসি। বেশ একটু বেপরোয়া হয়েই বললে—বেশ কাজ বাবু। পিথিমীর সুখ-দুঃখের খবর আনি—আমার কিছু নাই।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল—দীনুর বাড়িতে দীনু উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। পিসী বসে আছে দাওয়ায়।

সে কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছচে।

তিনজন গোরু বাছুরের পাইকার অর্থাৎ দালাল—চারটি গোরুর দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন এক গোছা দশটাকার নোট গুনছে।

দীনু গোরু বাছুরগুলি বিক্রি করে দিচ্ছে।

নোটগুলি দীনুর হাতে দিয়ে লোকটি বললে—গুনে নাও।

দীনু গুনলে না। হাতে ধরে রেখেই বললে—ঠিক আছে ভাই।

লোকটি সঙ্গীদের বললে—চল।

একজন হাতের লাঠি উঁচিয়ে বললে—হেট্—হেট্।

দীনু বললে—দাঁড়াও।

লোকটি ঘুরে দাঁড়াতেই সে বললে—আল্লার নাম নিয়ে কসম খেয়েছ—মনে আছে তো?

—তোবা তোবা। তাই মনে না থাকে? তোমার গোরু কসাইয়ের হাতে দিব না। গেরস্তকে বিক্রি করব। তাও ভদ্দর ঘরে যারা নিজের হাতে গোরুর সেবা করে না তাদের দিব না। গরিব চাষীর ঘরে দিব। গোরু যাদের ধন! খোদা কসম! তোমার দুখ কি আর বুঝি না!

দীনু আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে বললে—আর একটি কথা। তোমরা দাঁড়াও। আমি হস্কা পেটি নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাই—তারপরে নিয়ে যেও!

সে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

দাওয়ায় উপবিষ্ট পিসী এবার বললে—সব বিচে দিলি বাবা! আমি যা হোক তা হোক করে সেবা করতাম।

—না পিসী! সে তোমারও কষ্ট ওদেরও কষ্ট! আর গাই ছিল সতুর! বলদ ছিল নেতাইয়ের—

বলতে বলতে বেরিয়ে এল—উঠানে নামল। বললে—তারাই নাই—আর—বন্ধন রেখে কী হবে?

কথাটা শেষ হল তার বাড়ির বাইরে।

পশ্চিম দিগন্তে তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে।

মাঠের পথে দীনু পশ্চিম মুখে হনহন করে গিয়ে—বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন দীনুর বাড়িখানি প্রায় জনশূন্য! পাইকারেরা গোরু নিয়ে চলে গেছে। বুড়ী পিসি একা জরতীর মতো বসে আছে। স্তব্ধ। চোখে জলের ধারা। একটা কুকুর বসে আছে। অন্ধকার ঢেকে আসতে আসতে ঢেকে গেল পরিত্যক্ত বাড়িটা।

পরের দৃশ্যে বোলপুর স্টেশনের প্লাটফর্মের সেই লাইটপোস্টের নিচে একজন ডাকহরকরা এসে গামছা দিয়ে ঠাঁইটা পরিষ্কার করে—বসতে গিয়ে চারিপাশ তাকিয়ে দেখে দীনুকে না-দেখে ডাকলে—দীনু দাদা! ওই! কোথা গেলে হে?

দীনু তখন ওভারব্রিজের নিচে অন্ধকারে একলা বসে আছে।

ডাকহরকরাটি তার সামনে দিয়েই চলে গেল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ডাকলে—দীনু দাদা!

দীনু উত্তর দিলে না!

লোকটি বললে—ভ্যালা মানুষ! শোকাতাপা মন নিয়ে—চাকরি করাকেও বলিহারি যাই! আর কাজই যদি করবি—সে চলল এগিয়ে—দীনু দাদা!

দীনু উঠে পড়ল।

বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে।

এসে ঢুকল থার্ড ক্লাস ওয়েটিং শেডে।

শেডে তখন খুব হাঁক-ডাক নাই।

যাত্রীরা ঘুমুচ্ছে। কেউ বিড়ি খাচ্ছে। নানান ভেণ্ডারেরা বসে আছে।

দীনু চলেছিল স্টলের দিকে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল।

একজন কুলী শুয়ে আছে আর বাসিনীর ছেলেটা তার পা টিপছে।

দীনু স্টলের পথ ভেঙে এসে দাঁড়াল কাছে।

—এই ছেলে!

ছেলেটা চমকে উঠল। তার মুখের দিকে তাকাল সবিস্ময়ে।

—উ কী হছে? অ্যাঁ?

—পা টিপছি!

—পা টিপছিস?

—হ্যাঁ—পয়সা দেবে একটো!

—পা টিপছিস? একটো পয়সা দেবে? কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে হঠাৎ বলে উঠল—শূয়ারের বাচ্চা! অধমের চারা!

কুলীটা উঠে বসল।

সকলে সচকিত হয়ে উঠল।

কুলীটা বললে—কেয়া হুয়া? কেঁও গালি দেতা হ্যায় উস্কো?—

দীনু ভ্রূক্ষেপ না করে বললে—তোর মা কোথা?

ছেলেটা বললে—মা কোথা চলে যেয়েছে একটো নোকের সঙ্গে। শ্রোতারা হেসে উঠল।

দীনুর কণ্ঠস্বর সে হাসিকে ছাপিয়ে উঠল—তু মরে যা! তু মরে যা! তু মরে যা!

বলতে বলতে সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল—মিশে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

প্লাটফর্মের একপ্রান্তে তখন সঙ্গী ডাকহরকরা ডাকছিল—দীনু দাদা হে!

ডাকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল।

সে ঘুরল। ট্রেনের সার্চলাইটে আলোকিত প্লাটফর্মে মানুষেরা জেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সেই ট্রেন থেকেই নামল—পোস্টমাস্টারের ছেলে অমর।

ঘণ্টা বাজল—হুইসিল বাজল।

ট্রেন চলে গেল।

ডাকব্যাগের ঠেলা গাড়ি এসে দাঁড়াল শহরের পোস্টাপিসের সামনে।

সঙ্গে পিওন এবং দ্বিতীয় ডাকহরকরা।

পিওন হেঁকে ডাকলে—দীনু! মাস্টারবাবু, দীনু ইষ্টিশান থেকে—

ভিতর থেকে মাস্টার বললেন—এসেছে সে। শরীর খারাপ বলে চলে এসেছে। তার জন্যে ভেবো না।

অন্য ডাকহরকরা ইতিমধ্যেই এগিয়ে এসেছিল। ডাকব্যাগগুলি নামাতে নামাতে একজন বললে—সে একেবারে ক্ষ্যাপাধ্যাপার মতন এসে ধপাস করে বসে পড়ল।

আর একজন বললে—এতক্ষণে একটুকুন ভোর হয়েছে। নব-গেরামের মাস্টারবাবুর ছেলে এয়েছে এই ট্যানে। সেই অমরবাবুর সঙ্গে কথা বলছে।

আর একজন বললে—যুধিষ্ঠির এইবার স্বর্গ্যে যাবে। আর বেশীদিন লয়!

ভিতরে ডাকঘরে খটখট শব্দে ছাপ পড়তে লাগল।

বারান্দার আর একদিকে—দীনু তখন অমরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

অমর হেসে বললে—এমন করে কী দেখছ দীনু? আমি কি খুব পাল্টে গেছি?

দীনু বললে—আপনি অ্যানেক সোন্দর হয়েছেন বাবু!

অমর বললে—বড় হয়েছি যে অনেক। তা ছাড়া জেলে তো খুব কষ্ট ছিল না।

দীনু বললে—ধরমের দয়া বাবু। কষ্ট দেয় কে?

অমর বললে—আমি জানতাম বোলপুরে নেমেই তোমার দেখা পাব।

—কী আর করব বাবু? চিনির বলদের মতন—পিথিমীর খবর বয়ে নিয়ে যাই। আমারই শুধু—

—আমি সব শুনেছি দীনু। বাবা আমাকে লিখেছিলেন। তুমি সৎলোক, সাধুলোক—

—না—বাবু। মিছে কথা!

—দীনু?

ঠিক বলছি বাবু। চোরের বাবা কখনও সাধু হয় না—সাধুর বেটা কখনও চোর হয়! হয় না বাবু হয় না! সব মিছে কথা!

ঠিক এই সময়টিতেই পোস্টাপিসের ভিতর থেকে পোস্টমাস্টার হেঁকে বললেন—

—ওরে দীনু! ওরে—তোর নামে যে রেজেস্টারী! অ্যাঁ! দীনু চিৎকার করে উঠল—অ্যাঁ, আমার?

মাস্টার একটি পার্শেল হাতে ধরে বললেন—হ্যাঁ গরই তো। দীনবন্ধু দাস। ফাদার অব নিতাইচরণ দাস—।

—নিতাইচরণ দাস। নিতাই পাঠায়েছে? নিতাই?

—না। বলছে—দীনবন্ধু দাস—নিতাইচরণ দাসের পিতা। পাঠাচ্ছে এক জাহাজ কোম্পানী।

—জাহাজ কোম্পানী?

—হ্যাঁ ভারত জলান কোম্পানী। বম্বে।

—কিন্তু নিতাইচরণ দাসের নাম ক্যানে রয়েছে?

—হয়তো নিতাইই কিছু পাঠিয়েছে; জাহাজ কোম্পানী ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

—তা হলে—! তা হলে নিতাই—। নিতাইকে কোম্পানী ছেলেমানুষ বলে মাপ করেছে?

—কী করে বলব বল না দেখে!

—খুলুন বাবু, খুলুন। খুলে দেখুন?

—কিন্তু এ যে তোকে তোর পোস্টাপিস থেকে নিতে হবে। এখানে আমি কী করে খুলব!

দীনু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, না, নিতাইকে জাহাজ কোম্পানী ধরেছে? তার বিচার হবে? শিগ্‌গিরি ডাকটা বেঁধে ছান বাবু। শিগ্‌গির।

ডাক ঘাড়ে করে দীনু ছুটছে!

তার চোখের উপর মাস্টারের হাত এবং হাত পার্শেলটা ভেসে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল।

ডাকটা আছড়ে ফেললে।

এবং একদিন নিতাই যেভাবে ডাকব্যাগের উপব ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তেমনি ভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে নিজেকে সংযত করলে। তাবপর বসে হাঁপাতে লাগল। মাথার উপর দিয়ে প্যাঁচা ডেকে গেল। গাছ থেকে একটা ফুল খসে পড়ল। পাখি ডেকে উঠল। দীনু চমকে উঠে ডাক ঘাড়ে তুলে ছুটতে লাগল।

নবগ্রাম পোস্টাপিসের সামনে তখন বেশ একটি ভিড়।

অমর দাঁড়িয়ে আছে।

বাঁড়ুজ্জে আছে। সে বলেছে—Hero—শহীদ—long live অমরচন্দ্র। জিন্দাবাদ।

ঠিক সেই সময়টিতেই দীনু ডাক নিযে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল, বললে—বাবু—বাবু—

বলতে বলতে সে ঢুকে গেল ডাকঘরের ভিতবে।

মেঝের উপর ডাক ফেলে সেও যেন ভেঙে পড়ল।

—বাবু, ডাক কাটেন। বাবু!

বিস্মিত হয়ে মাস্টার বললেন—কী রে, কী হল? এমন করছিস কেন?

—আমার এজেস্টালী। আমার নিতাই। আমার খবর আইচে।

—নিতাইয়ের খবর?

—হ্যাঁ। ডাক কাটেন। বাবু ডাক কাটেন।

বাইরে অমর চকিত হয়ে বললে—নিতাইয়ের খবর?

বাঁড়ুজ্জে বললে—রেজেস্ট্রী?

একজন বললে—নিতাই ধরা পড়েছে?

—সাক্ষীর শমন নাকি? বাবাই তো একমাত্র সাক্ষী।

বাঁড়ুজ্জে বললে—মাপ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। দেশ স্বাধীন হচ্ছে। নিশ্চয় মাপ হয়েছে।

ডাকঘরের ভেতর মাস্টার তখন একখানি মেডেল হাতে নিয়ে দেখছেন।

পার্শেলটি খোলা।

দীনু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

মাস্টার পড়ছেন—Awarded to Nitai Charan Dass—for his heroic—

বাঁড়ুজ্জে অনুবাদ করলে—নিতাইচরণ দাসের বীরত্বপূর্ণ—

দীনু বললে—নিতাইয়ের মেডেল! নিতাই মেডেল পেয়েছে? নিতাই তা হলে মাপ হয়ে যেয়েছে—? বাবু?

পোস্টমাস্টার মেডেলটি রেখে—চিঠিখানা বের করে খুললেন।

দীনু নিজেই মেডেলটি তুলে নিল। দেখতে দেখতে বললে—আর কী লিখেছে বলেন? বাবু?

মাস্টার চিঠিই পড়তে লাগলেন।

—বাবু! পড়েন! বলেন! বাবু! বাবু! তবে? তবে? চিৎকার করে উঠল—ই মেডেল তবে আমার? নিতাইয়ের নাম করে দিয়েছি বলে? বাবু?

—না দীনু!

—তবে?

—এ মেডেল নিতাইয়ের। তার বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গের জন্য—কোম্পানী তাকে মেডেল দিয়েছে। সে নাই। তার বাবা তুই—

—সে নাই? চিৎকার করে উঠল।

মাস্টার চিঠি পড়ে গেলেন—আপনার পুত্র নিতাইচরণ আমাদের একজন কর্তব্যপরায়ণ সাহসী লস্কর ছিল। যুদ্ধের সময় সে অনেক বীরত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছে। সে সকলের প্রিয়পাত্র ছিল। সম্প্রতি আমাদের একখানি স্টীমার যুদ্ধের সময়ের পাতা কোনো একটি ভাসা মাইনের সংঘর্ষে জলমগ্ন হইয়াছে। সকল ব্যক্তিকে নিরাপদে নৌকায় তুলিয়া সে একা কাপ্তেন সাহেবের পাশে থাকিয়া বীরের মতো আত্মবিসর্জন দিয়াছে। সেই বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ তাহার স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মেডেল—আপনার নিকট পাঠানো হইল। কোম্পানী যথাসময়ে তাহার প্রাপ্য ইনসিওরেন্স ইত্যাদির টাকা আপনাকে পাঠাইবেন।

এতক্ষণ দীনুর চোখ দিয়ে জল ঝরছিল।

গোটা পোস্টাপিসটা স্তব্ধ।

শুধু টেলিগ্রাফের পোস্টের গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

হঠাৎ টেলিগ্রাফের কলটা টক্ টক্ শব্দে বেজে উঠল।

দীনুও—জয় ভগবান! বলে উঠে দাঁড়াল। তারপর বললে—বাবু—চাকরিতে আমার জবাব নিয়ে ন্যান বাবু! ব্যস!

মাস্টার মুখ ফিরিয়ে বললেন—জবাব দিচ্ছিস?

—হ্যাঁ বাবু। চাকরিতে জবাব, এস্তফা! এতকাল পিথিমীর লোকের কত খবর এনেছি, আজ আমার খবর এসেছে। নেতাই চোর হয়ে হারায়ে যেয়েছিল···সে সাধু হয়ে মরেছে, তার মেডেল এসেছে··শেষ খবর আমার। জয় ভগমান!

বলতে বলতেই সে বেরিয়ে এল।

কম্পাউণ্ডের লোকগুলিকে অতিক্রম করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে এল তার বাঁড়ুজ্জে।

সে ডাকল—দীনু! দীনু!

দীনু তার ডাক গ্রাহ্য করলে না। সে চলতে লাগল···চলতে লাগল বোলপুরের পথে—জয় ভগমান।

বাঁড়ুজ্জে চিৎকার করে ডাকলেন—দীনু ওদিকে কোথায় চললি? দীনু! দীনু!

দূর থেকে দীনু উত্তর দিলে—বোলপুর।

পথে গ্রামের প্রান্তে বাউল গান করছিল···জনতা জমেছিল·

···তোমার শেষ বিচারের আশায় বসে আছি।

দীনু তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

এল সে বোলপুর স্টেশন।

ওভারব্রিজের তলায় ঘুমন্ত ছেলেটাকে উন্মত্তের মতো তুলে নিলে।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল···

সেই অরণ্যপথ ধরে নাতিকে কাঁধে করে সে ফিরছে।

নতুন জামা কাপড়ে সে তাকে সাজিয়েছে।

গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে মেডেল।

তার সামনে এগিয়ে আসছে পথ।

ঘন অরণ্যপথ। অরণ্যপথে কচি পাতা ধরেছে।

একখানা গ্রাম।

তারপর নবগ্রাম।

নবগ্রামের বাজার।

তার পাড়া।

বাড়ির গাছটি ফুলে ভরা।

শূন্যলোকে বাউলের গানটি বাজছে!

খেয়া ঘাটের পারাপারে···
মাশুল দিয়ে বারে বারে···
শেষ খেয়ারই ঘাটের ধারে এলেম দেউলে দশায়
পাওনা কিছু থাকলে এবার দাওহে রাজা মশায়।
তোমার সেই বিচারের আশায়।

সমাপ্ত